রাণী ভবানী।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা,

৬ নং ভবানী দত্ত লেন, "বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন"-যন্ত্রে
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩৩২ সাল।

প্রায়
গ্রন্থে, সং
ছিলাম।
চরিত্র অ
প্রয়াস
।-নিং
বৈশাখ
প্রকাশে
আমার
উপন্যাস প্রকাশ
যে লিখিতে
তাহাও আর

রাণী ভবানী।

সূচনা।

প্রথম সংস্করণে বক্তব্য।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, ১২৯১ সালে, আমার "দ্বাদশ-নারী" গ্রন্থে, সংক্ষেপে, আমি 'রাণী-ভবানী'র চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলাম। তৎপরে, ১৩০৭ সালে, বিস্তৃতভাবে মহারাণী ভবানী-চরিত্র আলোচনা করিয়া আমি "রাণী-ভবানী" উপন্যাস প্রণয়নে প্রয়াস পাই। সেই উপন্যাসের সামান্য মাত্র লিখিত হওয়ার পর, ।-নিগ্রহে আমার অদৃষ্ট-চক্র পরিবর্ত্তিত হয়। ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে আমার "অনুসন্ধান"-পত্রে সেই "রাণী-ভবানী" উপন্যাস প্রকাশের বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু ঘটনাস্রোত আমার বিপরীত দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়ায়, আমি "রাণী-ভবানী" উপন্যাস প্রকাশ করিতে পারি নাই। এমন কি, ঐ গ্রন্থ কখনও যে লিখিতে পারিব বা কখনও যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব—তাহাও আর আমার মনে হয় নাই।

"অনুসন্ধানে" আমার সঙ্কল্পিত সেই "রাণী-ভবানী" গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর, আমি সে গ্রন্থ লিখিতে ও প্রকাশ করিতে না পারায়, বাঙ্গালার কোনও কোনও গ্রন্থকারের প্রাণে "রাণী-ভবানী" উপন্যাস প্রণয়নের অভিনব কল্পনার উন্মেষ হইয়াছিল। আমি সে গ্রন্থ প্রকাশ করিতে না পারি, কিন্তু আমার কল্পনার আভাস পাইয়া অপরে তাহার ফলভোগী হইবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমার এক বন্ধুর চেষ্টা কথঞ্চিৎ ফলবতী হইয়াছিল। বন্ধুবর, আমারই সহিত পরামর্শ করিয়া প্রকারান্তরে আমাকে ঐ উপন্যাস-প্রণয়নে নিরস্ত হইতে বলিয়া, নিজে সেই উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তখন তিনিও বুঝিয়াছিলেন, আমিও বুঝিয়াছিলাম,—আমার "রাণী-ভবানী" উপন্যাস কখনই প্রকাশিত হইবে না; আমার কল্পনা—কল্পনাতেই পর্য্যবসিত থাকিবে। তবে আমি "রাণী-ভবানী" উপন্যাস প্রকাশ করিব কি না,—এ কথা কখনও মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলি নাই; আমার মনের বাসনা মনেই বিলীন হইয়া ছিল।

কিন্তু ঘটনা-চক্রে এত দিন পরে আমার সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার অবসর উপস্থিত হইল। ঘটনা-চক্রে মহারাণী ভবানীর চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিবার উপযোগী এতই ঐতিহাসিক ও বাচনিক উপকরণ আমার হস্তগত হইল যে, আমি মহারাণী ভবানীর চরিত্র-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। তখন, আবার আমার মনে "রাণী-ভবানী" উপন্যাস লিখিবার কল্পনা জাগিয়া উঠিল। তবে, তাই বলিয়া, এই উপন্যাস যে আমার মনের মত করিয়া লিখিতে পারিলাম,—তাহা কখনই বলিতে পারি না। আমার অক্ষমতার পরিচয়,—আমার লিপিচাতুর্য্যের অভাব—সে তো পদে পদেই রহিয়া গেল। মহারাণী ভবানীর চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত হওয়া উচিত ছিল, অন্ততঃ আমি মনে মনে তাঁহার যে চিত্র

অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলাম, অপিচ তৎসংক্রান্ত যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, বড়ই দুঃখের বিষয়, আমার অস্ফুট লেখনী, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিল না। আমি লিখিতে গিয়া বুঝিলাম,—আমা অপেক্ষা কোনও যোগ্যতর ব্যক্তিই এ উপন্যাস লিখিবার উপযুক্ত পাত্র, এবং ভবিষ্যতে তাঁহারাই কেহ এই শক্তিহীন লেখকের যথাসাধ্য-সংগৃহীত উপকরণের ভিত্তির উপর সুন্দর সুষ্ঠু রচনা-সৌধের প্রতিষ্ঠা করিবেন।

প্রায় এক শত বৎসরের বঙ্গদেশের—কেবল বঙ্গদেশেরই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের—ইতিহাস এই উপন্যাসের সহিত ওতপ্রোত বিজড়িত। এই সময়ের মধ্যে কত প্রকারে ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ইংরেজীতে যে প্রবাদ-বাক্য আছে,—"truth is stranger thau fiction" অর্থাৎ—'কল্পনা অপেক্ষা সত্য আশ্চর্য্যজনক'; ঐ এক শত বৎসরের ঘটনাবলী তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। যদি পর পর ঘটনাগুলিই কেহ সাজাইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেই উপন্যাসের-অধিক চমকপ্রদ গ্রন্থ প্রণীত হইতে পারে। তবে তাই বলিয়া, আমার এই গ্রন্থে আমি যে পর পর ঘটনাগুলি সাজাইয়া গিয়াছি, তাহা অবশ্য কেহ মনে করিবেন না। তাহা হইলে, ইহাকে জীবনচরিত বা ইতিহাস বলিলেও বলিতে পারিতাম। কিন্তু আমার এ গ্রন্থ,—ইতিহাস নহে, জীবনচরিত নহে, আমার এ গ্রন্থ—উপন্যাস! উপন্যাস; সুতরাং ভরসা করি—সাত খুন মাপ। এই গ্রন্থের যে অংশ সত্য বলিয়া মনে হইবে, পাঠক, তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন; আবার যে অংশ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি না হইবে; মনে করিবেন—তাহাই উপন্যাস।

এই উপন্যাসের উপাদান-সংগ্রহে আমি যে সকল গ্রন্থকারের

সহায়তা পাইয়াছি তাঁহাদের সকলের নিকটই কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যাঁহারা পত্র দ্বারা বা বাচনিক আমার উপাদান সংগ্রহে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতঃ মহারাণী ভবানীর গুরুবংশের ও মাতুলবংশের গৌরবস্থানীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাণীর স্বাক্ষরযুক্ত যে দানপত্র এই গ্রন্থের শেষভাগে প্রকাশিত হইল, তাহা সংগ্রহের জন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার ধন্যবাদার্হ। এই গ্রন্থ প্রণয়নে, ইহার শৃঙ্খলা-সাধনে, শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যালের সহায়তা কখনই ভুলিবার নহে। এ বিষয়ে তিনি আমার দক্ষিণহস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থ রচনায় কোথাও কোথাও তাঁহার ভাষা-ভাব পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে। উপসংহারে বক্তব্য,—মহারাণী ভবানীর নামের সহিত এই গ্রন্থের সংস্রব আছে বলিয়াই এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতে পারে, নচেৎ, আমার কৃতিত্ব এমন কিছুই নাই—যাহাতে আমি অণুমাত্র স্পর্দ্ধা করিতে পারি। ইতি।

কলিকাতা,
৭ই বৈশাখ, ১৩১৬ সাল।

নিবেদক—
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

দ্বিতীয় সংস্করণে বক্তব্য।

যাহা স্বপ্নেও মনে হয় নাই, তাহাই সংঘটিত হইয়াছে। আমার "রাণী-ভবানী" উপন্যাস প্রকাশের দুই সপ্তাহ মধ্যে উহার প্রথম সংস্করণ দুই সহস্র খণ্ড বিক্রয় হইয়া যায়। তার পরও প্রতিদিন অসংখ্য ক্রেতা ঐ গ্রন্থ পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং কয়েক দিনের মধ্যেই "রাণী-ভবানী" উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আবশ্যক হইল। বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বদেশী পুস্তকের এরূপ অভাবনীয় বিক্রয়, বোধ হয়, পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। অন্ততঃ, আমার তাহা স্মরণ হয় না।

এই দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের কোনও কোনও অংশ সামান্যরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে কতকগুলি নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। মহারাণী ভবানী ৺কাশীধামে অবস্থিতি-কালে ১১৬১ সালের ১৫ই মাঘ সূর্য্যগ্রহণের সময় পাঁচশত বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দানপত্রের প্রতিলিপি এই সংস্করণে নূতন সংযোজিত হইল। ঐ দানপত্রখানি নাটোরের বর্ত্তমান গুরুদেব শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঠাকুর মহাশয়ের নিকট ছিল। ঐখানি এবং অন্যান্য আরও দশখানি দানপত্র আমার গ্রন্থের জন্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় অশেষ যত্নে আমায় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। অন্যান্য কয়েকটি তথ্য সংগ্রহেও তিনি বহু সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন মহাশয়ও এই সংস্করণের নূতন নূতন বিষয় সংগ্রহে আমার যথেষ্ট সহায়তা

করিয়াছেন। পরিশিষ্টে অধিকাংশ বিষয় তাঁহারই সংগৃহীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

উপসংহারের বক্তব্য, এই উপন্যাসের প্রধান প্রধান পাত্র-পাত্রী-গণের যথাযথ নাম প্রকাশ-সম্বন্ধে আমি বিশেষরূপ প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তথাপি দুই একটি নামে ভুল রহিয়া গিয়াছে। হরেশ্বর ঠাকুর মহাশয়কে দুই এক স্থলে মহারাণী ভবানীর মাতামহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু তিনি মহারাণীর মাতামহ নহেন,—তিনি মাতুল। মহারাণীর মাতামহের নাম—হরদেব ঠাকুর। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ত্রিচতুর্থাংশ ছাপা হওয়ার পর, তাঁহা-দের প্রকৃত বংশলতা আমার হস্তগত হয়। পরিশিষ্টে সেই বংশ-লতা প্রকাশিত হইল। এইরূপ মহারাণী ভবানীর শাশুড়ী 'ভুবন-মোহিনী' নামে এই গ্রন্থে পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম,—রাণী গৌরী দেবী। দলিল-পত্রে গৌরী দেবী নামেই স্বাক্ষর দেখিলাম। এতদ্ভিন্ন আর আর যে ভ্রম ত্রুটি রহিল, পাঠকগণ নিজগুণে সে ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবেন। নিবেদন ইতি।

কলিকাতা |
৯ই ফাল্গুন, ১৩১৬ সাল। |

নিবেদক—
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

তৃতীয় সংস্করণের বক্তব্য।

বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, আমার "রাণী-ভবানী" উপন্যাস এত সমাদর লাভ করিল। প্রথম সংস্করণ দুই সহস্র খণ্ড গ্রন্থ দুই সপ্তাহ মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায়, ফাল্গুন মাসের মধ্যভাগে দ্বিতীয় সংস্করণে শতাধিক চারি সহস্র খণ্ড গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। কিন্তু সেই সংস্করণও দেড় মাসের মধ্যেই ফুরাইয়া যায়। বাঙ্গলা সাহিত্যে বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ ভিন্ন অন্য গ্রন্থের, এত অল্প সময়ে এত অধিক কাটতি,—ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কেহ দেখিয়াছেন কিনা, বলিতে পারি না। কাজেই মনে হয়, বড় সৌভাগ্যে, বড় শুভক্ষণে এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

এই তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থের কোনও কোনও শব্দ ও কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পারিপাট্য-সাধন পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব-সূর্য্য, বঙ্গের প্রবীণ ও প্রধান গ্রন্থকার, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি-আই-ই মহোদয়ের উপদেশ,—এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপদেশ ক্রমে পঞ্চম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদটি এবার নূতন লিখিত হইয়াছে; এবং আরও দুই একটী স্থলে পরিবর্দ্ধন ও কয়েকটি শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এতৎপ্রসঙ্গে আর উল্লেখযোগ্য,—পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহায়তা। এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন পাঠ করিয়া গোস্বামী মহাশয় কতকগুলি শব্দের ও বাক্যের পরিবর্ত্তন-সাধন-জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সমীচীন-বোধে অনেক স্থলেই গোস্বামী

মহাশয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি, রায় বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং পণ্ডিতপ্রবর গোস্বামী মহাশয়ের এই নিঃস্বার্থ সহায়তার জন্য, আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি

হাওড়া, ২২শে আষাঢ়, ১৩১৭। — নিবেদক শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

প্রকাশকের নিবেদন।

সন ১৩২০ সালে "রাণী-ভবানী"র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা অনেক দিন নিঃশেষ হয়। এবার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইতি ১লা শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল।

প্রকাশক।

চিত্র-পরিচয়।

"রাণী-ভবানী" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে পাঁচখানি 'হাফটোন' চিত্র প্রকাশিত হইল। চিত্র-পঞ্চকে গ্রন্থোক্ত কয়েকটী প্রসিদ্ধ দেবালয়ের ও স্থানের বর্ত্তমান অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় বহু কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক ঐ সকল 'ফটোগ্রাফ' উদ্ধার করিয়া আমায় প্রেরণ করিয়াছেন। এজন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।

এইবার চিত্র-পঞ্চকের একটু একটু পরিচয় দিতেছি। পাঠক! এক এক চিত্রের বিবরণ পাঠ করুন, আর এক একটী চিত্র দেখুন, তাহা হইলেই সকল বিষয় বোধগম্য হইবে।

প্রথম চিত্র।—রাজা রামজীবনের ও রঘুনন্দনের দীক্ষা-মন্দির; এই মন্দিরে বসিয়াই শ্রীগর্ভ ঠাকুরের নিকট রাজা রামজীবন ও রঘুনন্দন দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের দীক্ষাগ্রহণের সময় পূর্ণাহুতি পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়া মন্দিরের ছাদ স্পর্শ করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহাদের গুরুদেব শ্রীগর্ভ ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"ভাগ্যলক্ষ্মী তোমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। যা—তোরা রাজা হইবি।" ইহার পরই রামজীবন ও রঘুনন্দনের অদৃষ্ট ফিরিয়া যায়। এই মন্দিরমধ্যে অদ্যাপি তন্ত্রোক্ত পঞ্চমুণ্ডী আসন বিদ্যমান আছে। মন্দিরগাত্রে শিলা-লিপিতে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়। অনেক কষ্টে তাহার পাঠোদ্ধার হইয়াছে। সেই শ্লোকটী এই:—

"শ্রীমৎ-শ্রীরাঘবেন্দ্রো-ধরণিধর সুতোবাসগেহং সুসৌধম্।
প্রাদাদ্দেব্যো ভগাঙ্কে শ্রুতবিধিবিধিনা তারিণীতোষণায়॥"

ঐ শিলাফলকে একটী শকাব্দ লিখিত আছে ; কিন্তু তাহা কোনক্রমেই পড়িতে পারা যায় না। যাহা হউক, নাটোর-রাজ্যের সৌভাগ্যসৌধের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামজীবন রায়ের ও রঘুনন্দনের এই দীক্ষা-মন্দিরটী এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে। নাটোর রাজ-সংসারের বর্ত্তমান কৃতিপুরুষগণ একটু চেষ্টা করিলে, এখনও সামান্য ব্যয়েই এই প্রাচীন কীর্ত্তিটীর রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু এতৎপ্রতি তাঁহাদের একটু দৃষ্টি সঞ্চালিত হইবে কি?

দ্বিতীয় চিত্র।—"বঙ্গোজ্জ্বল" নামক তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষ। মহারাণী ভবানী তাঁহার গুরুদেবের জন্য ঠিক নাটোর-রাজবাটীর অনুরূপ বাটী প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। এই চিত্র সেই বাটীর তোরণদ্বারের ভগ্নাংশ মাত্র। উপর্য্যুপরি বহু ভূমিকম্পের অবঘাতে এখন সেই তোরণদ্বারের একটী স্তম্ভমাত্র বিদ্যমান আছে। আর সকলই বিশাল ইষ্টকস্তূপে পর্য্যবসিত। এই ভগ্নস্তূপ সমভূমি হইতে ২০ ফিট উচ্চ। যে স্তম্ভটি এখনও দণ্ডায়মান আছে, তাহার বিদ্যমান অংশটুকুর উচ্চতা ১৮ ফিট। "বঙ্গোজ্জ্বল' তোরণদ্বারের মধ্যের দরজা প্রায় ২৫ হাত উচ্চ ছিল ; দরজার প্রস্থের পরিমাণ প্রায় ১০ হাত। ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে এই 'বঙ্গোজ্জ্বল' তোরণদ্বার ভূমিসাৎ হইয়াছে। 'ফটোটি' স্তূপের উপর উঠিয়া লওয়া হয়। ঐ তোরণদ্বার যে নাটোর-রাজবাটীর 'বঙ্গোজ্জ্বল' তোরণদ্বারের অবিকল অনুকরণ, যিনিই দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা বলিতে পারেন। এই 'বঙ্গোজ্জ্বল' তোরণদ্বারই মহারাণী ভবানীর ঠাকুরবংশীয়গণের ভবনে প্রবেশ করিবার একমাত্র পথ ; বাড়ীর আর চারিদিকেই পরিখা।

তৃতীয় চিত্র।—শ্রীগর্ভ ঠাকুরের বাসভবনের 'বঙ্গোজ্জ্বল' নামক তোরণদ্বারের সম্মুখস্থ মন্দির-পঞ্চক। নাটোর রাজবংশের

আদিভূত রাজা রামজীবন ও রঘুনন্দন—ঐ শ্রীগর্ভ ঠাকুরেরই মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। পাঁচটী মন্দিরের মধ্যে চারিটী মন্দির এখনও অক্ষত আছে। দুইটী মন্দিরের উপর কিছু কিছু গাছ উঠিয়াছে। তৃতীয় মন্দিরটী বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। চতুর্থ মন্দিরটী গাছের পিছনে পড়িয়াছে। মধ্যস্থলে ঐ যে স্তূপ দেখিতেছেন, উহাই পঞ্চম মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। ঐ মন্দির অতি বৃহৎ এবং মারবেল প্রস্তরে মণ্ডিত ছিল। মন্দিরটী আটচালার আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরমধ্যে শিবের মাথার উপর একটী ফোয়ারা ছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের বহু ভূমিকম্পের অবঘাত সহ্য করিয়াও বিগত ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে ঐ মন্দিরটী একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মন্দিরগুলি উচ্চে পঞ্চাশ ফিট হইবে। বড় মন্দিরটী প্রায় একশো ফিট উচ্চ ছিল। ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের পর এখন উহা ভগ্নস্তূপমাত্রে পর্য্যবসিত। এই মন্দিরগুলি মহারাণী ভবানীর নির্ম্মিত—তাঁহার কীর্ত্তিস্মৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চতুর্থ চিত্র।—ইহা বিলগ্রামের সেতু। চৌগ্রাম হইতে ভবানীপুর পর্য্যন্ত গমনাগমনের সুবিধার জন্য মহারাণী ভবানী যে বিস্তৃত পথ প্রস্তুত করিয়া দেন, সেই পথের মধ্যে বিলগ্রামে এই প্রকাণ্ড সেতু প্রস্তুত হয়। এই সেতু ১৯৫ হাত দীর্ঘ, ২০ হাত প্রস্থ। তিনটী খিলানের উপর এই সেতু বিনির্ম্মিত। মধ্যস্থলের খিলানটী এতই উচ্চ যে, বর্ষাকালে যখন চারিদিক্ ভাসিয়া ডুবিয়া যায়, জল হইতে এই খিলান বাইশ তেইশ হাত উপরে থাকে। পাশের দুইটী খিলানও বর্ষাকালে দশ বার হাত উচ্চে অবস্থিত রহে। মধ্যের খিলানের প্রস্থ ২০ হাত; পাশের দুইটী খিলানের প্রস্থ ১৪ হাত। ভবানীপুরের রাস্তার পার্শ্ব দিয়া যে খাল ভবানীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই খাল হইতে আর একটী বিস্তৃত খাল "চলন বিল" পর্য্যন্ত

গিয়াছে। সেই বৃহৎ খালের উপর ঐ সেতু নির্ম্মিত। এই সেতুর উপর চারিকোণে চারিটি শিবমন্দির ছিল। গত ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে।

পঞ্চম চিত্র।—কাশীশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দির উচ্চে ৬০ ফিট। মহারাণী ভবানী এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ এই, কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরের স্বপ্নাদেশে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দির সম্বন্ধে আর একটী অলৌকিক কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায়,—শ্রীগর্ভ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ ঠাকুরের স্মরণার্থ তদীয় নামানুসারে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা কাশীনাথ সংসার-বিরাগী পরম যোগী পুরুষ ছিলেন। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তাঁহার ইষ্টপূজা হোম ও যাগাদি কার্য্যে অতিবাহিত হইত। তাঁহার অসামান্য তপঃপ্রভাবে সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ কাশীনাথ বলিয়া মনে করিত। একদা জ্যেষ্ঠ শ্রীগর্ভ ঠাকুর স্থানান্তরে গমন করেন। যাত্রার সময় তিনি বাটীর সর্ব্ববিধ কার্য্যের ও সকলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কনিষ্ঠের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। এই সময় শ্রীগর্ভ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র মহাদেব ঠাকুর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কাশীনাথের এ সব বিষয়ে কোনই লক্ষ্য ছিল না। তিনি কেবল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "বাঙ্গলা" নামক চণ্ডীমণ্ডপের "পঞ্চমুণ্ডী" আসন-সমীপে রুদ্ধদ্বারে যোগ-সাধনায় মগ্ন থাকিতেন। যাহা হউক, মহাদেবের মৃত্যু হইলে, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া যখন ক্রন্দন করিতে করিতে কাশীনাথের নিকট আগমন করেন, তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হয়। তাঁহার উপর সকলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া জ্যেষ্ঠ বিদেশযাত্রা করিয়াছেন; অথচ তাঁহার উদাসীনতায় শিশুর মৃত্যু হইয়াছে,—এই মনে করিয়া তিনি বড়ই বিচলিত হন। ইহার পর সেই মৃত শিশুকে

ক্রোড়ে লইয়া তিনি মণ্ডপে প্রবেশ করেন; এবং মণ্ডপের দ্বার রুদ্ধ করিয়া "পঞ্চমুণ্ডী" সমীপে মহাসাধনায় নিমগ্ন হন। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যা-সমাগমে শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠে! তখন কাশীনাথ জননীর ক্রোড়ে শিশুকে প্রদান করেন। এই ঘটনার স্মরণার্থ পাকুড়িয়ায় "বাঙ্গলা" নামক একটী চণ্ডীমণ্ডপও বিদ্যমান আছে। সুতরাং মহারাণী ভবানীর নির্ম্মিত মন্দিরের সঙ্গে কাশীনাথের কোনও সংস্রব আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

রাণী ভবানী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"লক্ষ্মী—না অন্নপূর্ণা!"

ভবানী-মন্দিরের আঙিনায় বসিয়া, দুইটি বালিকা ধূলা-খেলা খেলিতেছে।

সম্মুখে গ্রাম্য-পথ। পথের অপর পার্শ্বে যোগেশ্বর মহাদেব। মধ্যে ঐ পথটুকু ব্যবধান না থাকিলে, শিবালয় ও ভবানী-মন্দির একই চত্বরে অবস্থিত বলিয়া মনে হইত।

ভবানীর মন্দির—ইষ্টক-নির্ম্মিত, সুদৃঢ়, অত্যুচ্চ, কারুকার্য্য-সমন্বিত। মন্দিরটী কত কালের, কেহই স্মরণ করিয়া বলিতে [illegible] না। অথচ, উহার উপাদানভূত ইটগুলি এখনও যেন [illegible] দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে। সে-গুলির রঙ এখনও লাল টকটকে [illegible] কেছে,—তদঙ্গীভূত কারুখচিত দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি এখনও [illegible] মান যেন যাইতেছে। সে কি সুন্দর সে কারুকার্য্য! ইটে [illegible] খোদাই-করা—রাম-রাবণের যুদ্ধ, ইটের উপর খোদাই-করা [illegible]

পুরুষোত্তমের রথযাত্রা; ইটের উপর খোদাই-করা—বাল্মীকির তপোবন; ইটের উপর খোদাই করা শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা। মন্দিরের চারিভিতে যেদিকে চাহিবে, সেই দিকেই ইটের উপর এইরূপ বিবিধ চিত্র-বিচিত্র কারুকার্য্য! মন্দিরের শীর্ষদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ত্রিশূল,—আকাশ ভেদ করিয়া, শিরস্ত্রাণের শিখার ন্যায় গৌরবে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে।

যোগেশ্বরের কোনও মন্দির নাই;—বিশাল অশ্বত্থ-বট-বৃক্ষের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব গুহার সৃষ্টি হইয়াছে; সেই গুহার মধ্যভাগে প্রকৃতির রমণীয় কোটরালয়ে মহাদেব বিরাজমান রহিয়াছেন। হয় ত, কোনও অতীতের দূরধিগম্যকালে ক্ষুদ্র এক মন্দিরে এই মহাদেবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; কিন্তু কাল প্রবাহে মন্দিরের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং সেই মন্দির-গাত্রোদ্ভিন্ন অশ্বত্থ-বট-বৃক্ষের শিকড়-জটায় মন্দিরের স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবলের সান্নিধ্যে দুর্ব্বলের এইরূপ পরিণতিই অবশ্যম্ভাবী। সেই বিশাল অশ্বত্থ-বট-বৃক্ষের শিকড়-জটা নামিয়া কেবল যে মন্দিরটীকেই গ্রাস করিয়া লইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু উহা দ্বারা যোগেশ্বর মহাদেবের চত্বরটীকে এক অভিনব শ্রীসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ছায়া-মণ্ডপে প্রায়ই এখন পথিক-ফকীর আসিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে।

শিবালয় ও ভবানীমন্দিরের পশ্চিমপ্রান্তে যে বিশাল দীর্ঘিকা তাহার নাম নির্ম্মাল্য-পুষ্করিণী। বোধ হয়, ঐ দীর্ঘিকায় যোগেশ্বর ও ভবানীদেবীর নির্ম্মাল্য জল পতিত হইত; তাই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে।

বালিকারা যখন ধূলা-খেলা আরম্ভ করিয়াছিল;—তাহার পূর্ব্বেই হউক, আর একটু পরেই হউক,—কাহারও [illegible] করিবার অবসর হয় নাই;—একখানি শিবিকা আসিয়া শিবালয়ের বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম

করিতেছিল। শিবিকা বলিলাম বলিয়া, জড়পদার্থ শিবিকাই যে সত্য সত্য বিশ্রাম করিতেছিল,—এ কথা কেহ অবশ্য মনে করিবেন না। বেহারারা, তাহাদের শিবিকারোহী কর্ত্তা মহাশয়কে এবং শিবিকাখানিকে বৃক্ষচ্ছায়ায় রাখিয়া, সমীপস্থিত নির্ম্মলা-পুষ্করিণীতে জলপান করিতে গিয়াছিল; আর তাহাদের কর্ত্তা-মহাশয় শিবিকার মধ্যে বসিয়া সটকার নলে ধূম পান করিতেছিলেন। একজন ভৃত্য, তাঁহাকে মুহুর্ম্মুহুঃ তামাক সাজিয়া দিবার জন্য, শিবিকার সন্নিকটে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তাহার উপস্থিতি-অনুপস্থিতি উভয়ই সমান; যেহেতু, একবার মাত্র তামাক সাজিয়া দিয়া, বৃক্ষের গাত্রে মস্তক হেলাইয়া, অল্পক্ষণ মধ্যেই, সে ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়াছিল; অপিচ, কর্ত্তাও তাহাকে আর দ্বিতীয় বার তামাক সাজিয়া দিবার জন্য আহ্বান করেন নাই।

একভাবে শিবিকার মধ্যে বসিয়া তামাক খাইতে ভাল লাগিল না দেখিয়া, কর্ত্তা বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিতে, প্রথমেই ক্রীড়ারতা বালিকা দুইটির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। যেন এক-ছাঁচে-ঢালা অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্না দুইটী বালিকা—ধূলা লইয়া খেলা করিতেছে! তাহারা কি খেলা খেলে—তিনি সেই দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন,—বালিকা দুইটী ধূলার প্রাচীর ঘেরিয়া ক্ষুদ্র দুইটী গণ্ডী নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছে, আর সেই গণ্ডীর মধ্যে ধূলা দিয়াই ক্ষুদ্র দুইটী ঠাকুর কল্পনা করিয়া লইয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন,—তাহারা আপন-আপন আহার্য্য জলপানাদি আপন-আপন ঠাকুরের সম্মুখে সাজাইয়া দিয়াছে। ফলে, তিনি বুঝিতে পারিলেন,—বালিকাদ্বয়ের এক-একটী গণ্ডী এক একটী দেবতার, [illegible], একটী মন্দিরে এক—একটী শিবপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এবং

বালিকারা আপনাদের অঞ্চলস্থিত জলপানাদি লইয়া শিবপূজার ভোগের আয়োজন করিয়াছে। তাহারা সেই ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

বালিকারা যখন এইভাবে পূজার আয়োজন করে, কয়েকটী প্রতিবেশী বালক তাহাদের পূজা দেখিতে আসিয়াছিল। বালক-দিগকে স্থিরভাবে বসিতে বলিয়া, বালিকারা পূজায় প্রবৃত্ত হইল; আর বালকেরা, বালিকাদের অঞ্চলস্থিত জলপানাদির প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিল।

পূজায় বসিয়া, বালিকারা অস্ফুট আধ-আধ-স্বরে কতই মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল,—কতই অঙ্গভঙ্গী ও প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিল। কর্ত্তা একান্তে দাঁড়াইয়া, সকলই লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন,—কখনও যুক্তকরে, কখনও নত-শিরে, কখনও মুদ্রার আকারে হাত ঘুরাইয়া, তাহারা কত-রূপেই পূজা করিতে লাগিল। তিনি শুনিলেন,—তাহারা "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং" ইত্যাদি ধ্যান-মন্ত্র আবৃত্তি করিল। তিনি বুঝিলেন,—তাহারা আপন-আপন অঞ্চলস্থিত জলপানাদি লইয়া শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দিল। তিনি শুনিলেন,—অবশেষে তাহারা "নমঃ শিবায় শান্তায়" ইত্যাদি প্রণামমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণত হইল, এবং নানা-মতে আপনাদের প্রার্থনা জানাইল। কর্ত্তা যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"এত অল্প বয়সে এমন পূজায় মতি-গতি দেখিতেছি—"কে এ বালিকা দুইটী! ততই তিনি আপন মনেই বলিতে লাগিলেন,—"ধন্য ইহাদের পিতামাতার আদর্শ জীবন! সার্থক তাঁহাদের শিক্ষা-দান।"

পূজা শেষ হইলে, একটী বালিকা আপন অঞ্চলস্থিত জলপানাদি গুছাইয়া লইল; অপর বালিকা আপন জলপানাদি প্রায় সকলই

আগন্তুক প্রতিবেশী বালকগণকে বণ্টন করিয়া দিতে লাগিল। প্রথমোক্ত বালিকা তদ্দর্শনে একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিল,—"জলপান-গুলা বিলাইয়া দিলে, মা বকিবে যে!" কিন্তু শেষোক্ত বালিকা তাহাতে উত্তর দিল,—"বাবা বলেন,—'আগে দেবতা-ব্রাহ্মণ, পরে অতিথি, অবশেষে নিজের খাওয়া।' তিনি কোনও দিনই পূজার পর অতিথির সেবা না করাইয়া জল গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন, —'অতিথি-ব্রাহ্মণের সেবাই সার কর্ম্ম।' আমরা পূজা করিলাম, অতিথি-সেবা করাইব না?"

কর্ত্তা দূর হইতে শুনিতেছিলেন। বালিকার কথাগুলি তাঁহার কর্ণে যেন সুধা-বর্ষণ করিল। এবার তিনি অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি বিস্ময়ে কহিলেন,—"কে এ বালিকা? এ কি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী,—না মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"কে তিনি"?

কর্ত্তা ডাকিলেন,—"উদ্ধবরাম!"

ভৃত্য ঝিমাইতেছিল। সসম্ভ্রমে চোখ মুছিতে মুছিতে কলিকা লইতে গেল।

কর্ত্তা কহিলেন,—"আর তামাক সাজিতে হইবে না। তুই যা দেখি, ঐ বালিকার পরিচয় জানিয়া আয় দেখি!"

ভৃত্য।—"আজ্ঞে, কিরূপে জানিব?"

কর্ত্তা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে একটী বৃক্ষ দেখাইয়া দিলেন। দেখাইয়া,

বলিলেন,—"পাল্কীতে আসিবার সময় ঐ গাছের নিকট এক বৃদ্ধকে তামাক খাইতে দেখিয়াছিলাম। দেখ দেখি—সে আছে কি না? থাকে তো, তাকে এই দিকে ডেকে নিয়ে আয়।"

উদ্ধবরাম বৃক্ষের দিকে রওনা হইল, কর্ত্তাও ধীর-পদ-বিক্ষেপে ভবানীমন্দিরের আঙ্গিনায় উপনীত হইলেন। অজ্ঞাত আগন্তুক ব্যক্তিকে হঠাৎ মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, বালক-বালিকারা বিচলিত হইল! প্রথমে তাহারা মনে করিল,—"ভদ্র লোকটী বোধ হয় মা-ভবানীকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন।" কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের সে ভ্রম বিদূরিত হইল। কর্ত্তা যখন তাহাদের খেলাঘরের নিকট অগ্রসর হইলেন, তিনি যখন কথাচ্ছলে বালিকা দুইটীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! তোমরা বলিতে পার—চৌধুরী মহাশয় বাড়ীতে আছেন কি?"—সকলেই তখন চমকিয়া উঠিল। বালকের দল দূরে সরিয়া গেল। বালিকারা ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কর্ত্তা কহিলেন,—"ভয় কি মা! আমি তোমাদের ধরিয়া লইয়া যাইব কি?"

'ধরিয়া লইবার' কথায় বালকেরা ছুটিয়া পলাইল! "ও বাবা! ছেলেধরা!"—বলিয়া একটী বালক চীৎকার করিয়া উঠিল। "দিদি! ধরলে গো"—বলিয়া একটী বালক কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িতে গিয়া উছোট খাইয়া পড়িল। কর্ত্তা যতই "ভয় নাই—ভয় নাই" বলিয়া আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন, তাহারা ততই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। কেহ আর কর্ত্তার কোনও কথায় কাণ দিল না,—কেহ আর দ্বিতীয় বার কর্ত্তার দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

বালিকা দুইটীর একজন অন্যজনকে কহিল,—"আয় দিদি! আমরা বাড়ী যাই।"

"ভয় কি মা! ভয় কি মা!" বলিয়া কর্ত্তা বালিকা দুইটীকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইলেন। তখন, "আয় দিদি—পালিয়ে আয়—আয় দিদি!"—এই বলিতে বলিতে, একটী বালিকা দৌড়িয়া পলাইল। তাহার অঞ্চলের জলপান ছড়াইয়া পড়িল। জলখাবারগুলি অতিথি-সেবায়ও লাগিল না,—নিজেরও খাওয়া হইল না,—এতই ব্যস্ততার সহিত সেই বালিকা দূরে পলাইয়া গেল।

কর্ত্তা তখন অন্য বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"মা! তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি পালিয়ো না।"

কি জানি কেন, বালিকা অভয় পাইল ও নতমুখে ধীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই অবসরে কর্ত্তা আর একবার বালিকার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। মরি মরি কি সুন্দর মূর্ত্তি! কর্ত্তার মনে হইতে লাগিল,—এ যেন সাক্ষাৎ গৌরী। বালিকার হস্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেন,—মৃণাল বলিয়া ভ্রম হইল। হস্তের তলদেশ লক্ষ্য করিলেন,—স্বতঃ অলক্তক-রঞ্জিত কমলবৎ প্রতীত হইল। কেশ-গুচ্ছের প্রতি দৃষ্টি করিলেন;—দেখিলেন,—'বালিকার আলুলায়িত কেশদাম তাহার পদযুগল চুম্বন করিতেছে।' মুখে, ললাটে, ভ্রূতে, চক্ষে,—কি যেন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিরাজমান! বালিকার বয়ঃক্রম আট বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই; অথচ, সৌন্দর্য্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কর্ত্তার মনে হইল,—তেমন সৌন্দর্য্য তিনি জীবনে কোথাও দেখেন নাই।

ইতি মধ্যে উদ্ধবরাম সেই বৃদ্ধকে ডাকিয়া আনিল।

কর্ত্তা পাল্কীতে আসিবার সময় বৃদ্ধকে যেভাবে তামাক খাইতে দেখিয়াছিলেন, বৃদ্ধ এখনও সেইভাবে তামাক খাইতে খাইতে কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধের নাম—কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস কায়স্থ। বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। শরীর রুগ্ন।

কৃত্তিবাসকে দেখিয়া বালিকার কি আনন্দ! কৃত্তিবাস—বালিকার "বাসি-কাকা।" ছেলেবেলায় কৃত্তিবাস নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া, বালিকা বরাবরই তাহাকে 'বাসি-কাকা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিতেছে। সে 'বাসি-কাকার' বড় আদরের, 'বাসি-কাকা'ও তাহার বড় আদরের; সুতরাং সে অবস্থায় 'বাসি-কাকা'কে নিকটে আসিতে দেখিয়া, বালিকার বড়ই আনন্দ হইল, বড়ই সাহস বাড়িল;—বালিকা আরও একটু সপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইল।

কৃত্তিবাসও বালিকাকে দেখিয়া, চমকিত হইয়া প্রথমেই বলিয়া উঠিল,—"উমা, মা! তুমি এখানে?"

কর্ত্তা বুঝিলেন, বালিকার নাম—উমা! তাঁহার মনে হইল,— "হাঁ! সত্য সত্যই ইনি উমা!" কর্ত্তা আগ-বাড়া হইয়া কৃত্তিবাসকে উত্তর দিলেন,—"তোমার উমা-মা এখানে শিবপূজা করিতে আসিয়াছিলেন?"

এইবার কর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায়, কৃত্তিবাস একটু সঙ্কুচিত হইল। হাতের হুঁকাটি নামাইয়া রাখিল। সঙ্গে সঙ্গে একটু ভাবনায় পড়িল। কর্ত্তাকে প্রণাম করিবে, কি নমস্কার করিবে, ইহাই তাহার ভাবনার কারণ। কর্ত্তার আকৃতি লাবণ্য-সম্পন্ন; অথচ, তিনি ব্রাহ্মণ কি না—তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তাঁহার অঙ্গ সুন্দর একটী আঙরাখায় আবৃত; পায়ে জরির নাগরা জুতা; স্কন্ধে রেশমের উত্তরীয়। কে তিনি? ব্রাহ্মণ—না শূদ্র? 'যাহা হউক' ইতস্তত করিয়াও কৃত্তিবাস মাথা নোয়াইতে যাইতেছিল; কিন্তু কর্ত্তা আপনা-আপনিই তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন,—"আমার

প্রণাম করিতে হইবে না; আমি শূদ্র। কৃত্তিবাস যথাযোগ্য অভিবাদন করিল। কর্ত্তাও প্রত্যভিবাদনে ত্রুটি করিলেন না।

অতঃপর কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—এটি কি চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা?

কৃত্তিবাস উত্তর দিল,—আজ্ঞে হাঁ।

কৃত্তিবাস 'হাঁ' বলিয়া উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বালিকা ধীরে ধীরে কহিল,—আমি বাড়ী যাই।

কর্ত্তা কহিলেন,—কেন মা! ভয় হইতেছে কি?

বালিকা নীরবে মস্তক অবনত করিয়া রহিল। কর্ত্তা কৃত্তিবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—চৌধুরী মহাশয় এখন বাড়ী আছেন কি?

কৃত্তিবাস।—আজ্ঞে, না, দাদা-ঠাকুর বাড়ী নেই। আজ প্রায় সাত দিন তিনি বাড়ী-ছাড়া।

কর্ত্তা।—তিনি কোথায় গিয়াছেন?

কৃত্তিবাস।—"আজ্ঞে, উমা-মার বিবাহের জন্য পাত্রের সন্ধান করিতে গিয়াছেন।"

কৃত্তিবাসের এই উত্তরে, কি জানি কেন, কর্ত্তা ও উমা উভয়েরই মন একটু চঞ্চল হইল। বিবাহের কথায় উমার চাঞ্চল্য অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু কর্ত্তা কেন বিচলিত হইলেন? যাহা হউক, কৃত্তিবাস আরও কি কথা বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু বাধা পাইয়া তাহার আর সে কথা বলা হইল না। তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ গাঁয়ে গিয়াছেন?" উমা কহিল—"আমি বাড়ী যাই।" কাজেই কৃত্তিবাসের কথা বন্ধ হইল। কর্ত্তা উমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—বাড়ী যাবে?

উমা অস্ফুটস্বরে উত্তর দিল,—"হুঁ।"

কর্ত্তা কহিলেন,—আচ্ছা তবে এস মা!

বালিকার পদ-সঞ্চালন হইল। সে পদ-সঞ্চালনেও কর্ত্তা সুলক্ষণ দেখিতে পাইলেন। বালিকা অগ্রসর হইবার সময়, তিনি বলিয়া দিলেন,—মা! তোমার বাবাকে বলিও, আমরা শীঘ্রই তোমাদের বাড়ীতে অতিথি হইব।

বালিকা মন্থর গমনে চলিয়া গেল। তাহার সঙ্গিনী—যে পূর্ব্বেই ছুটিয়া পলাইয়াছিল—এতক্ষণ বিষণ্ণমনে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অতঃপর দুইজনে মিলন হইল;—দুইজনেই গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

এইবার কর্ত্তা হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, চৌধুরী মহাশয়ের আর সন্তান সন্ততি কি?

হরিদাস।—আজ্ঞে ঐ একমাত্র কন্যা। ঐ উমা-মাই তাঁহার সর্ব্বস্ব।

কর্ত্তা তখন উদ্ধবরামকে ডাকিয়া পাল্কী প্রস্তুত করিতে বলিলেন।

হরিদাস কহিল,—"দাদা ঠাকুর বাড়ী না থাকুন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী আছেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি তাঁকে ডেকে আনছি এখনই।"

কর্ত্তা কহিলেন,—না আজ আর ডাকিতে হইবে না। আজ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বিলম্ব করিতে পারিব না।

হরিদাস পুনরপি কহিল,—"আজ্ঞে, এক বেলায় আপনারা এখান হইতে চলিয়া যাইবেন? তাহা হইতে পারে না। বিশেষতঃ আমি জানিতে পারিয়াও বাড়ীতে সংবাদ দিই নাই,—একথা শুনিলে দাদা ঠাকুর আমার উপর বড়ই রাগ করিবেন।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"সে জন্য তোমার কোনও চিন্তা নাই। আমি তাঁহাকে সকল বিষয় খোলসা করিয়া জানাইব।"

কৃত্তিবাস কহিল,—"তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তবে কি বলিব ?"

কর্ত্তা।—"তোমায় বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না। যদি কখনও কথা উঠে বলিও,—তাঁহারা আবার আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন।"

কৃত্তিবাসের আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না,—কর্ত্তা এবার এমনই গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন।

ইতিমধ্যে বেহারারা পাল্কী লইয়া অগ্রসর হইল। কর্ত্তা পাল্কীতে উঠিয়াই পাল্কী চালাইবার হুকুম দিলেন।

পাল্কী চলিয়া গেল। কৃত্তিবাস চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

কি সুন্দর পাল্কীখানি! যেমন দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, তেমনই রঙের বাহার! গায়ে চিত্রবিচিত্র লতাপাতা আঁকা, ছত্রীর পুরোভাগ ও পশ্চাদ্দিক্ ময়ূরাকৃতি ; ডাণ্ডিতে মকরের মুখ!

কি আড়ম্বরেই পাল্কী চলিতে লাগিল। পাল্কীর সঙ্গে দুইজন বরকন্দাজ, ষোলজন বেহারা, একজন চাকর! কি আড়ম্বরেই পাল্কী চলিতে লাগিল।

বরকন্দাজ দুই জনের একজন পাল্কীর অগ্রে অগ্রে এবং একজন পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতেছে। তাহারা দুইজনই দেশোয়ালী ; দুই জনেরই আকৃতি-প্রকৃতি ও বেশভূষা ভীষণতাময় ; দুই জনেরই বুকে তখমা ঝুলিতেছে, দুইজনেরই হাতে নিষ্কোষিত শাণিত তরবারি দুলিতেছে। আটজন বেহারা শিবিকা বহন করিতেছে, আর আট জন বেহারা শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। ভৃত্য উদ্ধবরাম, কখনও পিছাইয়া পড়িতেছে, কখনও বা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া, শিবিকার সঙ্গ লইতেছে।

পাল্কী যতই দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল, কৃত্তিবাসের মন ততই চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইল।

কৃত্তিবাস ভাবিতে লাগিল,—“এত আসবাব—এত জাঁকজমক-কে তিনি ?”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হতাশে।

পরদিন অপরাহ্নে আত্মারাম চৌধুরী বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন ; চৌধুরী মহাশয় ছাতিন-গ্রামের জমিদার।

যে ভবানীমন্দিরে বালক-বালিকারা ধুলা-খেলা করিতেছিল, তাহারই পশ্চিমে—মন্দিরের সংলগ্ন বলিলেও বলা যাইতে পারে, চৌধুরী মহাশয়ের আবাস-ভবন। এক হিসাবে ভবানীমন্দিরও তাঁহার বাটীর অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারই কোনও পূর্ব্বপুরুষ ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

চৌধুরী মহাশয় অপরাহ্নে অন্দরে প্রবেশ করিলে, কস্তুরী দেবী আগ্রহ সহকারে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চৌধুরী মহাশয় কহিলেন,—“আমি যাহা বলিয়া গিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে।”

কস্তুরী দেবী অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—কেন, কি হইল ? উমার বিবাহের পাত্র কি তবে মিলিল না ?”

চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—“আমি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি—গৌরীদানের ফললাভ আমাদের ভাগ্যে বড়ই দুর্ঘট। তাহা যদি না হইবে, এতদিন নিশ্চিন্ত থাকিয়া এই শেষ

মুহূর্ত্তেই বা আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইবে কেন ? উমার অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইতে আর এক মাস মাত্র সময় আছে। এই এক মাসের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ ধার্য্য হওয়ার আমি তো কোনই আশা দেখি না।

কস্তূরী দেবী বুঝিলেন,—স্বামী নিরাশ হইয়া আসিয়াছেন। বুঝিলেন,—উৎসাহ দিয়া পাত্রের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া কোনই সুফললাভ হয় নাই। কিন্তু তথাপি কস্তূরী দেবী হতাশ হইলেন না। তিনি উৎসাহবাক্যে স্বামীকে কহিলেন—আপনি হতাশ হইতেছেন কেন ? ভবিতব্য থাকিলে, এক দিনে বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। উমা কে—আপনার কি স্মরণ নাই ? উমার জন্মের পূর্ব্বে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন ? সে যে সাক্ষাৎ মা ভবানী আসিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"আমি কন্যারূপে তোমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতেছি" সে কথা কি আপনার স্মরণ হয় না ?

চৌধুরী মহাশয় আবেগভরে উত্তর দিলেন,—স্মরণ হয় বৈ কি ! স্মরণ হয় বলিয়াই তো যার নাম—ভবানী ; যাকে "উমা" বলিয়া আদর করি।

কস্তূরী দেবী।—"যদি ভবানী বলিয়াই জানেন, যদি ভবানী মনে করিয়াই উমা বলিয়া সম্বোধন করেন, তবে সংশয় কেন ? আপনি নিশ্চই জানিবেন, উমার বিবাহের পাত্র মা-ভবানী আপনিই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।"

চৌধুরী মহাশয়।—"যদি স্থির করিয়াই রাখিয়াছেন, [illegible] এ উদ্বেগ সহিতে হইতেছে কেন ?"

কস্তূরী দেবী।—"আপনাকে বুঝাই, সে সামর্থ্য আমার নাই। তবে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই—আপনিই এ কথা বলিয়া থাকেন। সময় অল্প বটে ; চেষ্টা করিলে এখনও না হইতে পারে কি ?"

চৌধুরী মহাশয়।—"আর চেষ্টা কেমন করিয়া করিব! সময়ও নাই যে, নানাস্থানে ঘটক প্রেরণ করি!"

স্বামি-স্ত্রীতে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কস্তূরী দেবী তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে গেলেন; চৌধুরী মহাশয় সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন।

কস্তূরী দেবীরই অপর নাম—জয়দুর্গা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উমা—বলে কি?

সপ্তাহ অতীত হইল; কিন্তু চৌধুরী মহাশয় ভাবনায় কূল-কিনারা পাইলেন না। নিদ্রায় স্বপ্নে উমার বিবাহ-ভাবনায় বিভোর হন; জাগরণেও সেই ভাবনায় তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। যতই দিন যাইতেছে, ভাবনার তরঙ্গ ততই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কি করিলে গৌরীদানের ফল লাভ করিতে পারেন, কি করিলে সেই মাসের মধ্যে উমার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়;—সে ভিন্ন অন্য চিন্তা চৌধুরী মহাশয়ের হৃদয়ে এখন আর স্থানই পাইতেছে না। আহারান্তে বিশ্রামের সময় আপন শয়ন-প্রকোষ্ঠে বসিয়া আজ তিনি সেই চিন্তায়ই নিমগ্ন আছেন, এমন সময় সহসা উমা আসিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তিনি দেখিলেন—উমার মুখ বিষণ্ণ, চক্ষু ছল-ছল; বুঝিলেন—সে যে কি বলিবে-বলিবে মনে করিতেছে, কিন্তু বলিতে

পারিতেছে না। উমাকে দেখিয়া স্নেহ-সম্ভাষে চৌধুরী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন মা, এমন বিষণ্ণ-ভাবে ?"

উমা উত্তর দিতে পারিল না। কি জানি কেন, তখন তাহার কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

তখন উমাকে ক্রোড়ে লইয়া, আদর করিয়া পার্শ্বে বসাইয়া পুনঃপুনঃ তিনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"কেন মা, তোমার এ বিষণ্ণ ভাব কেন ?"

অনেকক্ষণ পরে বাষ্পাকুলিত-কণ্ঠে ধীরে ধীরে উমা উত্তর দিল,—"বাবা! বাসি-কাকা—কেন বাড়ী যাবে ?"

উমার বাসি-কাকা (কৃত্তিবাস)—চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর অনেক দিনের কর্ম্মচারী। সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর চৌধুরী মহাশয়ের সংসারে চাকুরী করিতেছে। চৌধুরী মহাশয়ের পিতা, দশ বৎসর বয়সের সময় কৃত্তিবাসকে চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তরের পরও অন্যূন বিশ বৎসর কাল কৃত্তিবাস ঐ সংসারেই কাটাইয়া আসিয়াছে। কেবল মনিব-চাকুর সম্বন্ধ বলিয়া নহে ;—চৌধুরী মহাশয়ের পিতাকে কৃত্তিবাস আপনার পিতার ন্যায় জ্ঞান করিত, চৌধুরী মহাশয়কেও 'দাদা ঠাকুর' বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকে। চাকুরীতে কৃত্তিবাসের কখনও কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি হয় নাই; এ পর্য্যন্ত দক্ষের সহিতই সে কাজ চালাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ কয়েক মাস হইতে জরাগ্রস্ত হওয়ায়, নায়েব তিনকড়ি বসুর দৃষ্টিতে, সে এখন অকর্ম্মণ্য। নায়েব তিনকড়ি বসু তাই তাহাকে চাকুরীতে জবাব দিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের প্রতিপাল্য অনেকগুলি। চাকুরী করিয়া যাহা কিছু বেতন পায়, তদ্দ্বারা অতিকষ্টে তাহার পরিবারবর্গের জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়। জমিদার-সরকারে কাজ করিয়াও কৃত্তিবাস কখনও উৎকোচ

গ্রহণ করিতে পারে নাই ; সুবিধা সত্বেও সে কখন চুরি করিতে অভ্যস্ত ছিল না ; সুতরাং সারাজীবন চাকরী করিয়াও সে কিছু জমাইতে পারে নাই। দিন আনা, দিন খাওয়া,—এইরূপেই সে এ পর্য্যন্ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে।

সেই কৃত্তিবাসের জবাব হইয়াছে। সে আজ তাই দেশে যাইবে।

কৃত্তিবাস দেশে যাইবে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া, উমার এ বিমর্ষভাব কেন?

চৌধুরী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন মা! সে কথা জিজ্ঞাসা করছো কেন?"

উমা অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উত্তর দিল,—"আজ যখন আমি বাসি-কাকার কাছে গিয়ে বল্‌লেম,—কাল সকালে তুমি আমার মামার বাড়ী যেতে পারবে? বাসি-কাকা তখন কাঁদ্‌তে লাগলো,—আমি ব'ললাম—"বাসি-কাকা। তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? বাসি-কাকা উত্তর দিল,—"আমি তো মা, কাল আর এখানে থাক্‌তে পারছি না।" আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'কেন থাক্‌তে পার্‌ছো না?

এই বলিতে বলিতে উমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। কৃত্তিবাস কি উত্তর দিয়াছিল বলিতে গিয়া, উমা কাঁদিয়া ফেলিল। চৌধুরী মহাশয় উমাকে সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন,—"কেন মা, তুমি কাঁদ কেন? কি হয়েছে—আমায় বল?

উমা ক্রন্দনের স্বরেই কহিল,—"তার সংসারে ছয়টি অপগণ্ড পোষ্য। সে অকর্ম্মণ্য; কি ক'রে তার চল্‌বে?

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"সে কি বল্‌লে?"

উমা।—"ব'লবে আর কি? বললে—'কোলে পিঠে করে তোমাকে মানুষ ক'রেছি; তুমি ছেলে মানুষ; তোমাকে আর কি বলব মা। এত দিন পরে, তোমাদের বাড়ী থেকে আমার অন্ন

উঠলো! এ বয়সে, এ শরীরে, আমি কার কাছে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো,—তাই কাঁদছি!"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন,—"তার পর ?"

উমা।—"আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—'অন্ন উঠলো, এ কথা বলছো কেন ?" বাসি-কাকা তাতে উত্তর দিল,—"এই বুড়ো-বয়সে আমার জবাব হয়েছে।" এই বলে সে কাঁদতে লাগলো।

চৌধুরী মহাশয়।—"তুমি তাকে কি বললে ?"

উমা।—"আমি ব'ললাম,—"তা, কাঁদছো কেন ?" বাসি-কাকা উত্তর দিল,—কাঁদছি, ভাবনার কূল-কিনারা পাচ্ছিনে বলে। সংসারে ছয়টী পোষ্য। আমি গেলে আর একটী বাড়বে। কি ক'রে চল্‌বে মা! শেষে কি এক সঙ্গে সকলে উপবাসে মারা পড়'বো ? এ অকর্ম্মণ্য জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আর যে কোথাও অন্নের সংস্থান করতে পারবে না।" বাবা, বাসি-কাকা যখন কাঁদতে লাগলো, তখন আমার বড়ই কষ্ট হ'ল, তাই তোমাকে ব'লতে এসেছি।"

"সে আর কাজ-কর্ম্ম করতে পারতো না; ব'সে ব'সে মাইনে দিতে হয়; নায়েব তাই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। এতে তুমি কাঁদছ কেন মা ?"

এই বলিয়া চৌধুরী মহাশয়, কন্যাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইলেন।

উমা কিন্তু তাহাতে ভুলিল না। সে বলিল,—বাবা! আপনার মুখেই তো শুনেছি,—জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব'লে কাহাকেও উপেক্ষা করতে নেই। মানুষ তো দূরের কথা; আপনি ব'লেছিলেন, সেরূপ অবস্থায় পশু-পক্ষীকেও পরিত্যাগ করা অকর্ত্তব্য। আমাদের 'বুধি' গরুটাকে যখন হ'রে রাখাল অযত্ন ক'রতো; আপনি তখন তাকে যা বলেছিলেন, আমার সব মনে আছে। আপনি বলেছিলেন,—বুধি গাইটে মারা-

জীবন সুখ দিয়ে এসেছে; আর বুড়ো হ'য়েছে ব'লে এখন কি তাকে অযত্ন ক'রতে হয়? তবে আপনি বাসি-কাকাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? বাসি-কাকা তো সারাজীবন শরীরের রক্ত জল ক'রে আমাদের সংসারের হিতসাধন ক'রে এসেছে। এ বয়সে কেন তবে তাকে ছাড়িয়ে দেবেন? তার যে সংসারে রোজগার করবার আর কেউ নেই! তার চ'লবে কি ক'রে?

চৌধুরী মহাশয় স্তম্ভিত! উমা—এ বলে কি? উমা কি কন্যা? মা—ছলনা করিতে সত্যসত্যই অন্নপূর্ণা তাঁহার গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছেন? অথবা, কে তাহাকে এ সকল কথা শিখাইয়া দিল?

তিনি ভাবিয়া কুল-কিনারা পাইলেন না। সহসা স্বপ্নের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়িল। চৌধুরী মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। আত্মবিস্মৃতি দূর করিয়া, তিনি সস্নেহে উমাকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন,—"মা! আর বলিতে হইবে না। আমি বুঝিয়াছি। আজ হইতে আমি কৃত্তিবাসের বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিব। তাহাকে কোনও কাজ-কর্ম্ম করিতে হইবে না, সে আজীবন সেই বৃত্তি ভোগ করিবে। ইহার লোকান্তরের পরও, তাহার পরিবারবর্গেরও ভরণপোষণের জন্য সেই বৃত্তির ব্যবস্থা থাকিবে।"

চৌধুরী মহাশয় এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময় ভৃত্য কালী-চরণ দ্বারদেশে উপনীত হইল। সহসা কালীচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়ায়, চৌধুরী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ও! কালীচরণ!"

চৌধুরী মহাশয়ের প্রশ্নে কালীচরণ উত্তর দিল,—"আজ্ঞে একজন ব্রাহ্মণ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

চৌধুরী মহাশয় আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে, ব্রাহ্মণ!"

কালীচরণ।—“নাটোর রাজধানী হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার নাম—চণ্ডীদাস শিরোমণি।”

“নাটোর রাজধানী! চণ্ডীদাস শিরোমণি!—কে তিনি?” চৌধুরী মহাশয় স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন;—আগন্তুক ব্রাহ্মণের হস্তপদ প্রক্ষালনের আয়োজন করিতে বলিয়া, বাহির্ব্বাটী অভিমুখে রওনা হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সমস্যা।

ছাতিন-গ্রামে শিবালয়ের বৃক্ষচ্ছায়ায় সেদিন যে শিবিকাখানিকে বিশ্রাম করিতে দেখা গিয়াছিল, তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণে, যথারীতি আড়ম্বর সহকারে, সেই শিবিকাখানি নাটোর-রাজধানীতে প্রবেশ করিল।

প্রকৃতি আপনিই এই রাজধানীকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নগরের পূর্ব্বদক্ষিণ-প্রান্তে প্রবল-প্রবাহ-সমাকুল নারদ-নদ, এবং পশ্চিমোত্তর-প্রদেশে অগাধজলপরিপূর্ণ বিশাল চলন-বিল। উভয়েই যেন পরিখার ন্যায় নগরটীকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল। অপিচ বিলের মধ্যে উচ্চ ভূমিখণ্ডে এই নগর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, স্বভাবতই অনেক সময় ইহা দ্বীপের ন্যায় প্রতীত হইত। এদিকে রাজকীয় পরিখায়ও রাজধানী সুরক্ষিত ছিল। সে পরিখা আবার—তিন প্রস্থ। প্রথম পরিখা পার হইবার জন্য চারিদিকে চারিটি সুপ্রশস্ত সেতুপথ। সেতুপথে সশস্ত্র প্রহরিগণ সর্ব্বদা প্রহরা-কার্য্যে ব্রতী

রহিয়াছে। আবশ্যক হইলে, অনায়াসেই সেই সেতুপথ অপসৃত করা যায়; এবং সে পথ অপসৃত হইলে অতি বড় দুর্দ্ধর্ষ শত্রুরও পরিখা পার হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

শিবিকাখানি যখন সেই সেতুপথে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেতু-রক্ষক প্রহরিগণ সসম্মানে অভিবাদন করিল। শিবিকা নগর-পথে অগ্রসর হইল, পরিখাপার্শ্বস্থিত জন-সাধারণ সকলেই শিবিকার প্রতি সম্মান দেখাইল।

শিবিকা কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে সম্মুখে আর এক পরিখা দৃষ্টি-গোচর হইল। সে পরিখায় একটী মাত্র সেতুপথ। তাহা রাজধানী-প্রবেশের তোরণদ্বার। এই দ্বারেও পূর্ব্বোক্তরূপ সশস্ত্র প্রহরী সর্ব্বদা প্রহরায় নিযুক্ত আছে। এই তোরণদ্বারে প্রবেশ করিলে, প্রথমেই নহবৎখানা, দোলমঞ্চ, রাসমণ্ডপ, ঠাকুরবাড়ী, নাট-মন্দির প্রভৃতি নয়নপথে পতিত হয়। এই সকলেরই অপর পার্শ্বে তোষাখানা, পিলখানা, কাছারী বাড়ী প্রভৃতি অবস্থিত।

শিবিকাখানি যখন দ্বিতীয় পরিখা উত্তীর্ণ হইল, তখন প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই শিবিকার প্রতি সম্মান দেখাইতে লাগিল।

অতঃপর তৃতীয় পরিখা। এই পরিখার সেতুপথ পার হইলেই রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের বহির্ব্বাটীতে মহারাজের দরবার বসে। তাঁহার প্রধান প্রধান অমাত্য এবং আত্মীয় ভিন্ন কাহারও এই অংশে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

শিবিকাখানি পূর্ব্বরূপ সম্মান-সম্ভ্রম সহকারে তৃতীয় পরিখাও উত্তীর্ণ হইল। তৃতীয় তোরণ-দ্বারে যাহারা প্রহরা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, শিবিকা নিকটস্থ হইলে, সকলে শশব্যস্ত দণ্ডায়মান হইয়া শিবিকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। শিবিকারোহী আগন্তুক শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া, প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার

অগ্রে অগ্রে পশ্চাতে পশ্চাতে কারপরদারগণ যথারীতি অভিবাদন করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

এতাদৃশ সমারোহ সহকারে এবংবিধ সম্মান-সম্ভ্রমের সহিত যিনি প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—কে তিনি? তিনিই কি মহারাজ বাহাদুর? তিনিই কি নাটোরাধিপতি রাজা রামজীবন রায়?

তিনপ্রস্থ পরিখার মধ্যে এই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। লস্করপুর পরগণায় ছাইভাঙ্গা নামে এক 'বিল' ছিল। সেই বিলের মধ্যে চারিদিকে গড়খাই কাটিয়া, নাটোর-রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম পরিখা পার হইয়া, যে অংশ দিয়া শিবিকাখানি দ্বিতীয় পরিখায় আসিয়াছিল, সেই অংশে রাজধানীর প্রজাসাধারণ—রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ বসবাস করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিখার মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে সকল অট্টালিকা বিদ্যমান, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। তৃতীয় পরিখা-পরিবেষ্টিত অংশে যে রাজ-প্রাসাদ বিদ্যমান, প্রাচ্য কারুকার্য্যের তাহা এক অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন।

রাজপ্রাসাদ চক্‌মিলান অট্টালিকা,—ইষ্টক ও প্রস্তর-সংযোগে সুগঠিত। তৃতীয় পরিখার সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া, পশ্চিমাভিমুখে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলেই প্রাসাদের তোরণদ্বার। দ্বারে কি সুন্দর কারুকার্য্য! শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত দ্বারোর্দ্ধভিত্তির উপর নীল-পীত-লোহিত বিবিধ প্রস্তরখণ্ডের সমাবেশে লতা-পত্র-পুষ্প-সমন্বিত কি বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্য! সেই লতাপত্রের উপর আবার কি সুন্দর একটী মর্ম্মর-ময়ূর দাঁড়াইয়া আছে! দূর হইতে দেখিলে মনে হয়,—মেঘদর্শনে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া শিখী যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে! এই দেখিতে দেখিতেই দর্শকের চিত্ত বিভোর হইয়া যায়। সে

আর উপরের দিকে বা পার্শ্বদেশে চাহিয়া দেখিবার অবসর পায় না। নচেৎ, দ্বিতলের স্তম্ভসমূহে এবং দরজা-জানালা প্রভৃতিতে কোথাও বৈচিত্র্যের ন্যূনতা নাই।

তোরণ দ্বারের শোভা দেখিতে দেখিতে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে পথের দুই পার্শ্বে দ্বারবানদিগের বসিবার স্থান,—দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র বারান্দাবিশেষ। সেখানে দশ বারো জন দেশওয়ালী দ্বারবান্ সর্ব্বদা বসিয়া আছে। তাহাদের প্রত্যেকেই দৃঢ় ও বলিষ্ঠ; প্রত্যেকেই দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমায়তন; প্রত্যেকেরই গলদেশে কামরাঙ্গা ফলের মত সারিবন্দী সোণার মাদুলী; প্রত্যেকেরই হাতের কনুইয়ে মোটামোটা রুদ্রাক্ষের মালা; প্রত্যেকেরই গুম্ফ-দেশ সিংহগুম্ফের ন্যায় সর্ব্বদাই ঋজুভাবে বিন্যস্ত। সময়বিশেষে দ্বারদেশে প্রবেশ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহাদের কেহ বা শ্মশ্রুগুম্ফের তরিবৎ লইয়াই বিব্রত রহিয়াছে; কেহ বা মুগুর ভাজিতেছে; কেহ বা সিদ্ধি ঘুটিতেছে; ক্বচিৎ কেহ বা তুলসী-দাসের দোঁহা আবৃত্তি করিতেছে। এই দ্বারবানগণ যেখানে বসিয়া থাকে, তাহারই পার্শ্বস্থ প্রাচীরে বড় বড় ঢাল ঝুলিতেছে। কোনও ঢালের ফোঁটমুখচতুষ্টয়ে পিত্তলের মুকুট ঝকমক করিতেছে; কোনও ঢালের ফোঁটমুখ লৌহপাতে * আবৃত রহিয়াছে। প্রত্যেক ঢালের পার্শ্বে কোষবদ্ধ তরবারি ঝুলিতেছে; ঢালের ঊর্দ্ধদেশে ও অধো-দেশে স্তরে স্তরে পাশাপাশি ভাবে তরবারিসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে; তরবারির সংখ্যা করা যায় না। পার্শে পার্শে বর্শা ও লাঠি যে কতই রহিয়াছে,—কে গণনা করিবে? গণনা করিতে না পারিলেও কতকগুলি লাঠির প্রতি আপনিই দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। সেগুলি তেলেতে পাকিয়া লাল হইয়াছে; সেগুলির গাঁটে গাঁটে পিত্তলের চাক্‌চিক্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সেই লাঠিগুলিকে অতীব যত্ন-

সহকারে প্রতিপালন করা হয়, তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব-দর্শনেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এই দেউরী অতিক্রম করিলে, চক-মিলান চত্বরে দক্ষিণদ্বারী পূজার দালান। সুবৃহৎ সুপরিসর পাঁচটি খিলানের উপর এই দালান প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভের উপর খিলান। এক একটী স্তম্ভ বেষ্টন করিয়া আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় নয়টী স্তম্ভ বিরাজমান। বৃহত্তর স্তম্ভের ব্যাস—ন্যূনাধিক তিন হস্ত-পরিমিত এবং ক্ষীণ স্তম্ভগুলির ব্যাস প্রায় অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত। এইরূপ এক সারি স্তম্ভের পর দরদালান। তাহার পর আবার ঐরূপ স্তম্ভশ্রেণী। তদন্তে সুবৃহৎ পূজার দালান। ক্ষীণায়ত স্তম্ভগুলি বেষ্টন করিয়া বিবিধ বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তর-নির্ম্মিত লতা পাতা শোভা পাইতেছে। একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়,—এক একটি থামের গায়ে নয়টী রূপার গাছে অসংখ্য হীরার ফুল ফুটিয়া আছে। দর-দালানের খিলানের উপরে দশমহাবিদ্যার—কালী-তারা-ষোড়শী-ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি মূর্ত্তি, এবং তাহার আশে-পাশে শুম্ভ নিশুম্ভ মহিষাসুর বধ প্রভৃতির চিত্র প্রতিফলিত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, সেগুলিও বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরসংযোগে সুনিপুণ শিল্পী কর্ত্তৃক অতি যত্নে রচিত হইয়াছিল। পূজার দালানের প্রত্যেক খিলানের মধ্যে এক একটী করিয়া ঝাড় শোভা পাইতেছে। এইরূপ ঝাড় এবং দেওয়ালগিরি চকের চারিদিকের দালানেই বিরাজমান ছিল। পূজার সময় মহামায়া যখন পূজার দালান আলো করিয়া আবির্ভূত হইতেন, চকের চত্বরে চত্বরে তখন কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভার বিকাশ হইত।

পূজার দালানের সম্মুখে, দ্বিতল গৃহের সুসজ্জিত বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে রাজা রামজীবনের খাস-বৈঠকখানা। নাটোরাধিপতির ঐশ্বর্য্যের পরিচয়,—সেই বৈঠকখানায় দেদীপ্যমান।

যিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি এই বৈঠকখানাতেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এত জাঁকজমকে, এত সম্মান-সম্ভ্রম সহকারে, যিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, কে তিনি? তিনিই কি তবে রাজা রামজীবন? তাহাই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? সেদিন ছাতিন-গ্রামে ভবানীমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইনি আপনাকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন; সুতরাং রাজা রামজীবনই বা ইহাঁকে কেমন করিয়া বলিব? তবে কে তিনি?

কে তিনি,—কে উত্তর দিবে? যিনি সকলেরই সম্মানার্হ, সকলেরই পরিচিত, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কে বল, অপ্রতিভ হইবে? তিনি যিনিই হউন, যখন নাটোর-রাজপ্রাসাদে এতাধিক সম্মানপ্রাপ্ত, তখন তাঁহার পরিচয় আপনি প্রকাশ পাইবে। বৃথা ভাবনার প্রয়োজন কি?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একান্তে।

নাটোর হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। ব্যস্তসমস্তে বাহিরে আসিয়া চৌধুরী মহাশয় দেখিলেন, বৈঠকখানার বারান্দায় চৌকির উপর তিনি বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ গলদঘর্ম্ম; তাঁহার তল্পীবাহক ভৃত্য, তাঁহাকে বাতাস করিতেছে।

ব্রাহ্মণ—বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকৃতি; শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত। তাঁহার মস্তকে ঘন-কৃষ্ণ-মুণ্ডিত দীর্ঘশিখা লম্বমান; ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক;

বাহুদ্বয়ে চন্দনের রেখা ; কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা ; দেখিলে বোধ হয়—বয়ঃক্রম পঞ্চাশ উত্তীর্ণপ্রায়। মস্তকের কেশরাশি কতক পাকিয়াছে, কতক পাকিতেছে, কতক কৃষ্ণবর্ণ ই রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া, চৌধুরী মহাশয় কহিলেন,—"দেখিতেছি, রৌদ্রে আপনার বড়ই কষ্ট হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—"এ কষ্ট আমাদের সহ্য করা অভ্যাস আছে। তবে বৈশাখমাসের রৌদ্র ; আমি একাদিক্রমে বার ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়াছি ; তাই সামান্য একটু শ্রান্তি-বোধ হইয়াছে মাত্র। এজন্য আপনার চাঞ্চল্যের কোনই কারণ নাই।"

ইতিমধ্যে কালীচরণ তামাক লইয়া আসিল। হস্তপদ প্রক্ষালনের জল প্রস্তুত, পূজাহ্নিকের আয়োজন হইয়াছে—সে সকল কথাও সে জ্ঞাপন করিল। অন্দরে ব্রাহ্মণের আহারাদির উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

বেলা আড়াই প্রহর অতীত-প্রায়। এত বেলায়, ব্রাহ্মণ কি তবে স্নানাহ্নিক করিয়া আসেন নাই? সকলের আহারাদি শেষ হইতে চলিল, এত বেলায় ব্রাহ্মণ কি তবে অনাহারী আছেন?

এখনকার দিন হইলে, সে বিষয়ে সংশয়-প্রশ্নই উঠিত না। এত বেলায় নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ আহার করিয়া আসিয়াছেন,—এই মনে করিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আহার করিয়াছেন কি না—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পদ্ধতি ছিল না। বিনা-জিজ্ঞাসাতেই আহারের আয়োজন হইত। আতিথ্য-সৎকার পরম ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য ছিল। অতিথির সেবা করিতে পারিলেই লোকে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিত ; বিশেষতঃ চৌধুরী মহাশয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ; তাঁহার বাটীতে শ্রান্ত ক্লান্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত ; তিনি কি অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি করিতে পারেন?

চৌধুরী মহাশয় ব্রাহ্মণের বিশেষ আর কোনও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোথায় যাইবেন, এইখানেই বা তাঁহার কি প্রয়োজন আছে,—সে প্রশ্নও চৌধুরী মহাশয়ের মনে আদৌ উদয় হইল না। কিসে, কি প্রকারে, ব্রাহ্মণের সেবার সুচারু বন্দোবস্ত হয়, তিনি স্বতঃপরতঃ তৎপ্রতি যত্নবান্ রহিলেন। ব্রাহ্মণ যতই বলিতে লাগিলেন,—"আপনার ব্যস্ততার কোনই কারণ নাই। আমি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া জলযোগ করিয়া আসিয়াছি। আপনি কেন এতাধিক ব্যস্ত হইতেছেন?"—চৌধুরী মহাশয়ের উদ্বেগ ততই বাড়িতে লাগিল। আপনি পূর্ব্বাহ্নে আহার করিয়াছেন; অথচ অতিথি অভুক্ত আছেন। তজ্জন্য সঙ্কুচিত হইলেন।

ব্রাহ্মণের বলিবার কথা অনেক ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ তখন কোন কথা বলিবার অবসর পাইলেন না,—এমনই ব্যস্ততার, সহিত এমনই আগ্রহের সহিত, চৌধুরী মহাশয় ব্রাহ্মণের সেবা-পরায়ণ রহিলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যে আহারাদি প্রস্তুত হইল। যেন কতদিনের পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় আদর করিয়া, অন্দরের মধ্যে লইয়া গিয়া, চৌধুরী মহাশয় ব্রাহ্মণকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া আনিলেন। ব্রাহ্মণের তম্বীবাহক ভৃত্যেরও যত্নের ত্রুটি হইল না।

আহারান্তে বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণের বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন নাই; আজই আমায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। আপনার কাছে আজ একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য আসিয়াছি; কথা শেষ হইলেই আমি রওনা হইব।"

চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন,—"দ্বিপ্রহর রৌদ্রে দারুণ কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিতে হইয়াছে। আজই ফিরিতে হইবে—

এমন কি প্রয়োজন? আমার সৌভাগ্যক্রমে যখন আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, আজ আমি আপনাকে যাইতে দিব না।

ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"আজই ফিরিয়া যাইবার কথা। অকারণ অপেক্ষা করিলে আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইতে পারে। অতএব, আজ আর আপনি আমাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিবেন না. মা জগদম্বার ইচ্ছা হইলে, আবার কতবার আসিব, কতদিন থাকিয়া যাইব,—সে জন্য অনুরোধ করিতে হইবে কেন? এখন আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি, একটু নিভৃতে বলিতে ইচ্ছা করি।"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন,—"এখানে তো বাহিরের লোক কেহই নাই। যাহা বলিবার, আপনি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ।—"আমি যে কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনি এবং আমি ভিন্ন অন্য কেহ সে কথা শুনিতে না পায়, আমার প্রতি সেইরূপ উপদেশ আছে। ভৃত্যবর্গের সম্মুখেও সে কথা বলিতে নিষেধ।"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন,—"ভাল, গোপনেই কথাবার্ত্তা হইবে।"

ব্রাহ্মণ।—"সেই কথা বলিবার পূর্ব্বে আমার একটী সর্ত্ত আছে। আমি যে প্রস্তাব করিব, সে প্রস্তাবে যদি আপনার আপত্তি থাকে, আপনি আমার প্রস্তাবের বিষয় কদাচ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না। আমার প্রস্তাবে যদি সম্মত হন, তাহা হইলেও সম্ভবতঃ সাত দিন তাহা আপনাকে গোপন রাখিতে হইবে।"

"এমন কি গোপনীয় বিষয়! এমন কি গুহ্য কথা!"

চৌধুরী মহাশয়ের নায়েব তিনকড়ি বসু, প্রথম হইতেই আগন্তুক ব্রাহ্মণের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন; ব্রাহ্মণের সহিত চৌধুরী মহাশয়ের কি কথাবার্ত্তা হয়, তাহা শুনিবার জন্য

চেষ্টা পাইতেছিলেন। কি জানি কেন, শিবালয়ের বৃক্ষচ্ছায়ায় শিবিকার কথা শুনিবার পর হইতেই তাঁহার মনে একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। নাটোর রাজধানী হইতে হঠাৎ এই ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া সেই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। তিনি বুঝিয়াছেন—আগন্তুক নাটোর-সম্পর্কিত। তিনি শুনিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ নাটোর হইতে আসিয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের সহিত যখন চৌধুরী মহাশয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ব্রাহ্মণের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য, তিনি একটু উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের সর্ত্ত শুনিয়া কাজেই তিনি আর বৈঠকখানায় থাকিতে পারিলেন না। অধিকন্তু, কর্ত্তার ইঙ্গিতক্রমে অন্যান্য ভৃত্যগণও বৈঠকখানা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে অনেক কথা আলাপ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কি বলিলেন এবং চৌধুরী মহাশয় তাহাতে কি উত্তর দিলেন, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। তবে কথাবার্ত্তার সময় চৌধুরী মহাশয়ের মুখমণ্ডল এক একবার আনন্দে উৎফুল্ল হইল, এবং একবার তাঁহার মুখে গাম্ভীর্য্যভাব প্রকাশ পাইল।

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে, চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"ভাল, তাহাই হইবে। আপনার কথাই মানিয়া লইলাম।"

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণকে সে রাত্রি রাখিবার জন্য চৌধুরী-মহাশয়ের অনুরোধ ব্যর্থ হইল।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। তিনকড়ি বসুর মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। ব্রাহ্মণ কি বলিয়া গেলেন,—কাহারও নিকট তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। তবে কৌশলে ব্রাহ্মণের তল্পীবাহক ভৃত্যের নিকট তিনি এইমাত্র জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ নাটোরের সর্ব্বেসর্ব্বা দয়ারাম রায়ের নিকট হইতে আসিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার হৃদয় দারুণ দুশ্চিন্তায় উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দয়ারাম রায়।

"নাটোরের সর্ব্বেসর্ব্বা! দয়ারাম রায়!" কে তিনি?

যে সময়ের কথা বলিতেছি, নাটোর রাজ্য তখন সৌভাগ্যের উচ্চ-চূড়ায় অধিষ্ঠিত, আর মহারাজ রামজীবন রায় সেই নাটোর-রাজ্যের অধীশ্বর।

নাটোর রাজ্য বলিতে, তখন প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশকেই বুঝাইত। তৎকালে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ—রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, মালদহ, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর প্রভৃতি—নাটোর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল. এদিকে সাঁওতাল-পরগণা, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতিরও অনেক স্থান নাটোর-রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। তখন, নাটোর রাজ্যের পরিমাণ অন্যূন ১২ বারো হাজার বর্গমাইল নির্দ্দিষ্ট ছিল; এবং নাটোর রাজ্য হইতে প্রতিবৎসর ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজার রৌপ্যমুদ্রা নবাব-সরকারে রাজস্ব প্রদান করা হইত। নাটোরাধিপতি স্বাধীন নৃপতির ন্যায় সৈন্য-দল রক্ষা করিতে পারিতেন, এবং দিল্লীর বাদশাহের বা বাঙ্গালার নবাবের আপদে-বিপদে নাটোরাধিপতির সৈন্যসাহায্য গৃহীত হইত। কেবল নাটোর-রাজ্য বলিয়া নহে,—এদেশের অন্যান্য জমিদার-গণেরও তখন সৈন্য, গড় ও বিচারালয় ছিল। পুরাতন গ্রন্থ পত্রে দৃষ্ট হয়,—বাদশাহের সাহায্যার্থ এক সময়ে নাটোরাধিপতিকে ২৩ হাজার ৩৩০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৮ লক্ষ ১ হাজার ১৫৮ পদাতিক সৈন্য, ১ হাজার ১৭০টী হস্তী, ৪ হাজার ২৬০টী কামান ও ৪ হাজার ৪০০ নৌকা সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইত; এবং বাদশাহের আবশ্যক

হইলেই সেই সকল সৈন্য তিনি বাদশাহের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। বলা বাহুল্য, রাজা রামজীবনের শাসন-সময়ে নাটোর-রাজ্যের গৌরব-সম্ভ্রমের অবধি ছিল না।

নাটোর-রাজ্যের সেই গৌরব-সম্ভ্রমের মূলে যে দুই শক্তি বিদ্যমান, দয়ারাম রায় তাহার অন্যতম। রাজা রামজীবনের মধ্যম ভ্রাতা রঘুনন্দন রায় নাটোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তবে রাজা রামজীবন রায়ের আশ্রয়ে বুদ্ধিশক্তি মন্ত্রী দয়ারাম রায় তাহার রক্ষাকর্তা; আর, রঘুনন্দনের লোকান্তরের পর দয়ারাম রায়ই নাটোরের সর্ব্বেসর্ব্বা।

মহারাজ রামজীবন রায় এখন নামে মাত্র নাটোর রাজ্যের অধীশ্বর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মন্ত্রী দয়ারাম রায়ই এখন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত,—দয়ারাম রায়ই এখন সর্ব্বস্ব। দয়ারাম জাতিতে তিলি। বুদ্ধিমত্তায়, সাহসিকতায়, কৌশলকলায় তাঁহার প্রসিদ্ধি অসাধারণ। তিনি 'স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ।' কি হীন অবস্থা হইতে তিনি কি উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। রাজা রামজীবন রায় বজরায় চড়িয়া একদিন নাটোরের সন্নিহিত চলনবিলে জলবিহারে বহির্গত হইয়াছিলেন। সেই সময় নিরাশ্রয় বালক দয়ারাম তাঁহার নিকট আশ্রয়প্রার্থী হয়। বালকের অঙ্গভঙ্গী এবং সুলক্ষণ দেখিয়া, রাজা রামজীবন দয়ারামকে আপনার বজরায় উঠাইয়া লন। সেই হইতেই দয়ারামের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না। সেই হইতেই রাজসংসারে তাঁহার প্রতিপত্তির সূত্রপাত।

রাজধানীতে আনিয়া রাজা রামজীবন, দয়ারামকে প্রথমে সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করেন, কিন্তু দয়ারাম দিন দিন এতই বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন যে, রাজা রামজীবন ক্রমশঃ দয়ারামকে আপন পারিষদমধ্যে গণ্য করিয়া লন। পরিশেষে আপন

কর্ম্মের গুণে দয়ারাম এখন নাটোরের সর্ব্বেসর্ব্বা প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত। দয়ারাম তাদৃশ লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার বিষয়বুদ্ধি এতই প্রখরা ছিল, মস্তিষ্ক এতই উর্ব্বর ছিল যে, তিনি যাহা দেখিতেন, তাহাই আয়ত্ত করিতে পারিতেন,—যাহা শুনিতেন, তাহাই মনে রাখিতে পারিতেন। লোক-মুখ দেখিয়াই তিনি মানুষের মনের ভাব বুঝিয়া লইতেন। কেবল যে বুদ্ধিমত্ত ও বিচক্ষণতা-গুণেই দয়ারাম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও নহে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অসিচালনা করিতে পারিতেন। নবাবের পক্ষে মহারাজের পক্ষে, সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ জয় করিয়া আসিতেন। যশোহর মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের ইতিহাস অনেকেই অবগত আছেন। মুসলমান-গৌরবের প্রদোষে প্রভাবের দিনে—সীতারাম স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিধাতা বাম না হইলে, হয়তো তিনি রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু সে কেন সীতারামের পতন হয় কিসে—কেহ জানেন কি? নবাবের বিপুল সৈন্যদল সীতারামকে পরাজয় করিতে পারে নাই; নবাবের কামানের তোপকেও সীতারাম ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তবে সীতারামের পতন হইল কিসে? ভারতের যাহা চির-কলঙ্ক—কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছিল যে কারণে—মহম্মদঘোরী ভারত অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন যে সুবিধায়—সীতারাম সেই গৃহবিবাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। তাই সীতারামের অধঃপতন সংসাধিত হয়। নবাবের ফৌজ সীতারামকে পরাজয় করিতে পারে নাই, সীতারামকে যে পরাজয় করিয়াছিল—সে এই বাঙ্গালী—সে এই দয়ারাম রায়। নাটোরাধিপতির অনুমত্যনুসারে, নবাবের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত, সীতারামের সহিত যুদ্ধে দয়ারাম সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

সীতারামের সহিত দয়ারামের ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও বন্দী হইয়া নাটোরে আনীত হন; তাহার পর নাটোরের রাজকারাগারেই সীতারামের মৃত্যু হয়। বাঙ্গালার ইতিহাসে এই ঘটনার অনুরূপ ঘটনার অভাব নাই। যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য—আপন স্বদেশী স্বধর্মী বাঙ্গালীর চক্রান্তে পড়িয়াই প্রাণদানে বাধ্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সহস্র সদনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতাপাদিত্য-সংহাররূপ তাঁহার কলঙ্ককালিমা—এখনও প্রকট হইয়া রহিয়াছে।

সীতারামের সংহার-সাধনে নাটোরের রাজবংশের বা দয়ারামের স্মৃতিও তদনুরূপ কলুষকলঙ্কিত নহে কি? তবে, পার্থক্য—প্রতাপাদিত্য-বধে বিশ্বাসঘাতকতা, আর সীতারামসংহারে পৌরুষ-প্রভাব। যাহাই হউক, দুষ্কৃতি উভয়ত্র সমফলপ্রদ। সীতারামের সংহার-সাধনে যুদ্ধ-জয়ী হইয়া, দয়ারাম রায়, নবাবের নিকট "রায় রায়ান" উপাধিলাভ করিয়াছিলেন, এবং রাজা রামজীবন রায় যশোহরের বিস্তৃত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

দয়ারাম রায়ের অন্য পরিচয় আর কি দিব? যে দয়ারাম একদিন রাজা রামজীবনের নিকট ভিক্ষা-প্রার্থী হইয়া, সামান্য সরকারী কাজ লাভ করিয়াছিলেন; সেই দয়ারাম, শেষে নাটোরের "সর্ব্বেসর্ব্বা" হইয়া, আপনিও বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান নাটোর-রাজধানীর পার্শ্বে নাটোরের ন্যায় গৌরব-সম্পন্ন ঐ যে দীঘাপাতিয়া-রাজবংশের অভ্যুদয় দৃষ্ট হয়, দয়ারাম রায়—তাহার আদিভূত। দীঘাপাতিয়া-রাজবংশ বলিতে—দয়ারাম রায়ের বংশধর-দিগকেই বুঝাইয়া থাকে।

কিন্তু যাউক সে কথা। এখন নাটোর, হইতে চণ্ডীদাস শিরোমণি মহাশয় ছাতিনা-গ্রামে আসার পর, প্রকাশ পাইয়াছে,—সেই যে

সেদিন ভবানীমন্দিরের সম্মুখে শিবালয়ের বৃক্ষচ্ছায়ায় শিবিকাখানি বিশ্রাম করিতেছিল, সেই শিবিকারোহী কর্ত্তা বাবুই—এই দয়ারাম রায়।

দয়ারাম রায় ছাতিন-গ্রামে কেন শিরোমণি মহাশয়কে পাঠাইলেন? আত্মারাম চৌধুরীর বহুদর্শী নায়েব তিনকড়ি বসু তাই ভাবিতেছেন,—ছাতিন-গ্রামের প্রতি দয়ারাম রায়ের আবার দৃষ্টি পড়িল কেন?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অঘটন-সংঘটন।

অঘটন-সংঘটন! ব্রাহ্মণ রওনা হওয়ার সাত দিন পরে নাটোর রাজধানী হইতে অন্যূন পঞ্চাশজন ভদ্রলোক ছাতিন-গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। কেহ শিবিকায়, কেহ ঘোটকে, কেহ বা কুঞ্জরোপরি, প্রকাশ্যভাবে শোভা-যাত্রা করিয়া, তাঁহারা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এত লোক, এরূপ সমারোহে, সহসা কেন চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়? চৌধুরী মহাশয় যদিও আসল কথা কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনার আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং নাটোর হইতে লোকজন যখন তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হইল না। চৌধুরী

মহাশয়ের ইঙ্গিতমাত্রে গ্রামস্থ সকলেই আসিয়া আগন্তুকগণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

যাঁহারা আসিলেন, তাঁহাদের স্নানাহারে তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ বিশেষ বাসার বন্দোবস্ত; বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ বিশেষ খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা; বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ বিশেষ পরিচর্য্যার আয়োজন। চৌধুরী মহাশয় কোনও পক্ষেই ত্রুটি রাখিলেন না। নাটোরের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জমিদার হইলেও, আগন্তুকগণের অভ্যর্থনায় কোনও অংশেই চৌধুরী মহাশয়ের ন্যূনতা প্রকাশ পাইল না।

প্রথমে গ্রামের লোক অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। সহসা গ্রামের মধ্যে হাতী, ঘোড়া, পাল্কী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে এত লোক-লস্কর প্রবেশ করিতে দেখিয়া,—লোকের মনে কত কথাই জাগিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ক্রমে সকল কথাই প্রকাশ পাইল; সকলেরই আনন্দের অবধি রহিল না। তবে একেবারে কেহ যে কোনরূপ ক্ষুণ্ণ হইল না, তাহা নহে; তিনকড়ি বসু এতদিন মনে মনে যে ভাবনা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি বুঝিলেন,—রূপান্তরে তাঁহার আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হইতে চলিল।

অপরাহ্ণে চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ নাট-মন্দিরে বিরাট মজলিস বসিয়া গেল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বর্ণভেদে পৃথক পৃথক বসিবার আসন পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। একে একে সকলে যথাযোগ্য স্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। চণ্ডীমণ্ডপে চিক খাটান হইল। গ্রামস্থ মহিলাগণ সেই চিকের আড়ালে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

যাত্রা নয়, নাচ নয়; বক্তৃতা নয়; তবে এ সভাধিবেশন কিসের

জন্য? সেই যে ব্রাহ্মণ সেদিন বলিয়া গিয়াছিলেন,—"যদি সম্মত হন, সাত দিন পরে প্রকাশ করিবেন,"—আজ সেই সপ্তম দিবস। চৌধুরী মহাশয় সম্মত; সুতরাং আজ আর কোনও বিষয়ই অপ্রকাশ নাই।

উমার বিবাহ। নাটোরের মহারাজ-কুমারের সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত। সেই সম্বন্ধ লইয়াই নাটোর হইতে আগন্তুকগণ আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস শিরোমণি সেদিন সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন; আজ তাহারই পাকাপাকি হইতে চলিয়াছে। যদি কোনও বিষয়ে চৌধুরী মহাশয় অসম্মত হন, অথবা যদি কোনও প্রকারে বিবাহ-সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটে; তাহা হইলে নাটোরের পক্ষে তাহা শ্লাঘার কথা নহে,—সেই জন্যই শিরোমণি মহাশয় কথাটী অপ্রকাশ রাখিতে বলিয়াছিলেন।

মজলিসে গ্রামস্থ ভদ্রলোক সকলেই উপস্থিত ছিলেন। গোপনে গোপনে সংবাদ দিয়া, উমার মাতামহ হরিদেব ঠাকুর মহাশয়কেও পাকুড়িয়া হইতে আনান হইয়াছিল; আর আনা হইয়াছিল—রঘুনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়কে; পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষ উভয় পক্ষের সহিত তিনি সমান সম্বন্ধযুক্ত। একদিকে তিনি নাটোরের কুলগুরু; অন্য দিকে তিনি ভবানীর মাতৃকুলের প্রসিদ্ধ পুরুষ। নাটোরের পক্ষ হইতে মহারাজ রামজীবনের কনিষ্ঠ সহোদর বিষ্ণুরাম আসিয়াছিলেন। আর আসিয়াছিলেন—মহারাজের দক্ষিণহস্তস্থানীয় দয়ারাম রায়। তিনিই এই বিবাহের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

দয়ারাম রায়ের সহিত এই বিবাহব্যাপারের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। সেই যে সেদিন যিনি ভবানীমন্দিরে উমার সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই যে সেদিন যিনি রাজোচিত আড়ম্বরে ছাতিন গ্রাম হইতে রওয়ানা হইয়া শিবিকারোহণে নাটোর রাজধানীতে প্রবেশ

করিয়াছিলেন ; অপিচ, যাঁহার নিকট হইতে চণ্ডীদাস শিরোমণি সেদিন উমার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া চৌধুরী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ; আরও বলিতে হইবে কি,—তিনিই এই দয়ারাম রায়।

মজলিস পূর্ণ হইলে, ঘটক ও কুলজ্ঞগণের তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইল। কোন বংশের সহিত কোন্ বংশের কিরূপ সম্বন্ধ—অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার আলোচনা চলিল। নাটোর-রাজবাটীর সভাপণ্ডিত প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা মধ্যস্থের আসন অধিকার করিলেন।

তারকব্রহ্ম চূড়ামণি নাটোর রাজবংশের কুলজীনামা আওড়াইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"রাজা বল্লালসেন পঞ্চগোত্রভুক্ত বরেন্দ্র ব্রাহ্মণকে এক শত গ্রাম দান করেন। তদনুসারে গাঞির সৃষ্টি হয়। অস্য প্রমাণম্,—

'বিপ্রানেকশতগৃহান্ বরেন্দ্রান্ গাঞিসংযুতান্।
কৃত্বা বল্লালসেনেন চক্রে গুণবিচারণম্॥'

কোন্ গোত্রাবিষ্টিত বরেন্দ্রগণ কতকগুলি করিয়া গ্রাম পাইয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ আছে। অস্য প্রমাণম্,—

'কাশ্যপেঽষ্টাদশ জ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যে চ চতুর্দ্দশ।
চতুর্বিংশতির্বাৎস্যেঽপি ভরদ্বাজে তথাবিধঃ॥
সাবর্ণে বিংশতির্জ্ঞেয়া গ্রামা হি গাঞিনামকাঃ।'

অর্থাৎ, কাশ্যপ গোত্রে আঠার, শাণ্ডিল্য গোত্র চৌদ্দ, বাৎস্য গোত্রে চব্বিশ, ভরদ্বাজ গোত্রে চব্বিশ, সাবর্ণ গোত্রে বিংশতি।

সিদ্ধেশ্বর গোত্রবিশারদ কহিলেন,—"গোত্র কি করিয়া হইল? তাহা আগে ঠিক করিয়া বলা চাই। তার পর তো গাঞি-বিভাগ? যে পাঁচ ব্রাহ্মণ—সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রে কান্যকুব্জাগত বাৎস্যেন্দ্র, ভরদ্বাজ গোত্রে গৌতম, কাশ্যপ গোত্রে সুষেণ ও

কৃপানিধি, সাবর্ণ গোত্রে পরাশর, বাৎস্য গোত্রে ধরাধর। আগে ইঁহাদের নাম করিতে হইবে। তাহার পর তো গাঁই-প্রাপ্তির কথা।"

সুধানিধি ঘটক তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন,—"কি পাগলামি করিতেছেন। নাটোর-রাজবংশের কুলজী কীর্ত্তন করিতে হইবে; তা না সৃষ্টিতত্ত্ব আরম্ভ করিয়া দিলেন? তা করিতে হইলে,বলিতে হয়,—ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর পুত্র—!"

তারকব্রহ্ম চূড়ামণি আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন,—"আমার কথা শেষ না হইতে তোমরা কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছ; ইহা অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। কি বলি, আগে তাহা শুনিয়া, পরে কথা কহিও।"

চণ্ডী শর্ম্মা মজলিসে বসিয়াও অহিফেনের মৌতাতে ঝিমাইতে-ছিলেন। দশের মাঝে ঝিমাইতে ঝিমাইতেই তিনি উত্তর দিলেন,—"তা শুনতে গেলে যে রাত কাবার হ'য়ে যায়!"

সহসা বাহিরের লোকের মুখে এরূপ বিদ্রূপোক্তি শুনিয়া, চূড়ামণি মহাশয় যেন তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—ঠাট্টা! "এ মজলিসে আমি—"বলিতে বলিতে, ক্রোধভরে তিনি উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া থামাইতে গেলেন,—চণ্ডী শর্ম্মাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু চণ্ডী শর্ম্মা চুপ করিতে গিয়াও কহিলেন,—"আমি বাবা এই জন্যই কারো কোন কথার মধ্যে থাকি না। কুলজী-বর্ণনায় সমস্ত রাত কাটিয়া গেলেও আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমি যেমন বসিয়াছি, তেমনি থাকিব।"

যাহা হউক, চৌধুরী মহাশয়, চণ্ডী শর্ম্মাকে আর অধিক কথা কহিতে দিলেন না, পরন্তু চূড়ামণি মহাশয়কেও যথারীতি কুলজী বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

আবার চূড়ামণি কাঁদিয়া বসিলেন,—মৈত্র-গাত্রি-প্রাপ্ত মতুর পুত্র স্থিরাচার্য্য।"

মধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা এবার বাধা দিয়া বলিলেন,—"স্থিরাচার্য্য হইতে আর কেন? একটু সংক্ষেপ ক'রে নেন না?"

চূড়ামণি কিঞ্চিৎ বিরক্ত-ভাবে কহিলেন,—"সুষেণ হইতে ষোড়শ অধস্তন কেশব ওঝা।"

ওঝা নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া, চণ্ডী শর্ম্মা বলিলেন,—"ওঝা ডাকার আর কোনও প্রয়োজন নেই বাবা! চণ্ডী শর্ম্মার আফিম বজায় থাক, ওঝার দরকার কখনই হবে না। আফিমের কাছে আবার ওঝা?"

চণ্ডী শর্ম্মা কথা আরম্ভ করিবামাত্র, চৌধুরী মহাশয়, ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে চুপ করিতে বলিতেছিলেন; কিন্তু বক্তব্য শেষ না হইলে চণ্ডী শর্ম্মাকে চুপ করাইবে—কাহার সাধ্য? তাই হরিদাস ভট্টাচার্য্য ক্রোধ-প্রকাশে কহিলেন,—"চণ্ডীকে বাহির করিয়া দিলে হয় না? ও কি মজলিসে বস্‌বার উপযুক্ত?"

হরিদাস ভট্টাচার্য্য এই বলিয়া চণ্ডী শর্ম্মাকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানের উদ্যোগ করিতে গেলেন। চণ্ডী শর্ম্মা চক্ষু মুদিত করিয়াই ছিলেন; সে দিকে তিনি দৃকপাতও করিলেন না। কিন্তু ব্যাপার অনেক দূর গড়ায় দেখিয়া, দয়ারাম রায় সকলকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"সকলের কথায় কাণ দিলে চলিবে কেন? সংসারে যাঁহার যাহা কাজ, তিনি তাহা করিয়া যাইবেন। সকলের সকল কথায় কথা কহিলে চলিবে কেন? বলুন, চূড়ামণি মহাশয়, আপনি কুলজী বলিতে আরম্ভ করুন; কোন দিকে কর্ণপাত করিবেন না।" অতঃপর দয়ারাম রায় সভাস্থ অপরাপর ব্যক্তিবর্গকেও স্থির হইতে কহিলেন।

দয়ারাম রায় অনুরোধ করিয়াছেন, সুতরাং রাগ-অভিমান

চলিয়া গেল। চূড়ামণি মহাশয় আবার কুলজী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—"সুষেণ হইতে অধস্তন ষোড়শ পুরুষ—কেশব ওঝা। তস্য পুত্র জীবর ওঝা, তস্য পুত্র মধুসূদন।"

গোত্রবিশারদ সিদ্ধেশ্বর ঘটক চক্ষু রাঙাইয়া কহিলেন,—"কি, জীবর ওঝার পুত্র—মধুসূদন? দশটা পুরুষের নাম মনে নাই, আপনি কুলাচার্য্য হইতে আসিয়াছেন?"

তর্ক-চূড়ামণি ক্রোধ-প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"ভুল হইয়াছে। আচ্ছা আপনি বলুন, শুনি?"

গোত্রবিশারদ কহিতে লাগিলেন—"কেশবের পুত্র জীবর; জীবরের পুত্র—বামন; বামনের পুত্র—শূলপাণি, তস্য পুত্র—মধুসূদন; তস্য পুত্র—বিষ্ণুনাথ; তস্য—পুত্র কালিদাস; তস্য পুত্র—পদ্মাপতি; তস্য পুত্র শুভাকর; তস্য পুত্র ভবানন্দ; তস্য পুত্র—জ্ঞানানন্দ, তস্য পুত্র—মদনানন্দ; তস্য পুত্র মথুরানাথ, তস্য পুত্র—কামদেব। এই কামদেবের তিন পুত্র;—রামজীবন, রঘুনন্দন, বিষ্ণুরাম। রঘুনন্দন নিঃসন্তান ছিলেন। রামজীবনের পুত্র কালীকুমার অকালে লোকান্তরে গমন করেন। কনিষ্ঠ বিষ্ণুরামের তখনও কোনও পুত্র সন্তান হয় নাই। এই অবস্থায় রাজা রামজীবন, রামকান্ত রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কুমার রামকান্তই এখন রাজা রামজীবনের পুত্র। তাঁহার সহিত আত্মারাম চৌধুরীর কন্যার বিবাহ উপস্থিত।"

শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা কহিলেন,—"রামকান্ত—রাজা রামজীবনের পোষ্য-পুত্র। সে কথাও খুলিয়া বলুন।"

পোষ্যপুত্র শব্দটি কাণে যাইবামাত্র চণ্ডী শর্ম্মা আবার বলিয়া উঠিলেন,—"পোষ্যপুত্রে কুলং নাস্তি।"

গোত্রবিশারদ উত্তর দিলেন,—"শাস্ত্রমতে পোষ্যপুত্রে কুল যায় না। ছয়ঘরিয়া সমাজে পোষ্যপুত্রের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বিশে-

যতঃ কুমার রামকান্ত উচ্চবংশ-সম্ভূত। কাশ্যপ-গোত্রীয় ভাদুড়ীবংশে সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা রাজা কংসনারায়ণের ভাগিনেয়; বরেন্দ্র-সমাজে শ্রেষ্ঠ কুলীন। সেই বংশের জগদানন্দ রায়ের বৃদ্ধপ্রপৌত্র পাচু রায়ের পুত্র রসিক রায়, রসিক রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র—কুমার রামকান্ত। এ বংশ কি অল্প গৌরবান্বিত?"

শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা কহিলেন,—"কুলের বিষয়?"

এবার উপরপড়া হইয়া তর্কচূড়ামণি কহিলেন,—"কেশবের পুত্র জীবর ওঝা, চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর করণে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া, প্রথমে ছয়ঘরিয়া দলভুক্ত হন। শেষে তিনি নিষ্কুল হইয়াছিলেন। নাটোর রাজবংশ এখন শুদ্ধ শ্রোত্রিয়।"

গোত্রবিশারদ জিজ্ঞাসিলেন,—"চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর করণ কিসে দোষের হইল?"

তর্কচূড়ামণি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু দয়ারাম রায়ের ইঙ্গিতক্রমে শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা কহিলেন,—"সে সকল অবান্তর কথা এখন আর প্রয়োজন নাই।"

ইতিমধ্যে অবসর পাইয়া, রামচন্দ্র রায়, চৌধুরী মহাশয়দিগের কুলজী আওড়াইতে গেলেন। কিন্তু বাদানুবাদে বিরক্তি বশতঃ সে কথায় কেহই আর কর্ণপাত করিলেন না।

অতঃপর দিন ও লগ্ন-নির্ণয় সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বাদানুবাদ চলিল। স্থির হইল,—২৮শে বৈশাখ সোমবার রাত্রি ২ দণ্ড ৮ পল গতে ৫ দণ্ড ৩২ পল মধ্যে বৃশ্চিক লগ্নে শুভহিবুক যোগে বিবাহ হইবে। পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষ—উভয় পক্ষই তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

এইবার বিবাহের পত্র। পত্র স্বাক্ষরের পূর্ব্বে দয়ারাম একটী

আপত্তি তুলিলেন। তিনি বলিলেন—"পত্র হইবার পূর্ব্বে জানা প্রয়োজন—বিবাহ কোথা হইতে নির্ব্বাহিত হইবে ?"

কন্যাপক্ষের অনেকেই সে কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। হরিদেব ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রায় মহাশয়, আপনার এ কথার তাৎপর্য্য কি ?

দয়ারাম রায় উত্তর দিলেন,—"নাটোর রাজবংশ বিবাহ করিতে অন্যের জমিদারীতে কখনই আসিতে পারেন না। রাজবংশের প্রথা এই,—কন্যা লইয়া গিয়া, বরের বাড়ীতে বিবাহ দিতে হইবে।"

হরিদেব ঠাকুর কহিলেন,—"সে কি বলেন ? আমার দৌহিত্রী—আত্মারামের কন্যা; তাহার বিবাহে আমরা কি প্রকারে এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি ? বংশ-মর্য্যাদায় আমরা নাটোর অপেক্ষা কোনও অংশেই কম নহি। আপনি বিজ্ঞ হইয়া এ প্রস্তাব কি প্রকারে উত্থাপন করিলেন ?"

আত্মারাম চৌধুরী, শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া, শ্বশুর মহাশয়কে শান্ত করিয়া কহিলেন,—"এ বিষয়ে আমি এক যুক্তি স্থির করিয়াছি। পূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে আমি আভাস পাইয়াছিলাম। তাড়াতাড়িতে আপনাকে বলিতে পারি নাই। তবে যাহা স্থির করিয়াছি, আপনি শুনিলে, নিশ্চয়ই অনুমোদন করিবেন, বিশ্বাস করি।"

এই বলিয়া, একটু একান্তে লইয়া গিয়া, চৌধুরী মহাশয়, শ্বশুর মহাশয়ের নিকট আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। হরিদেব সে প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন না। অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় দয়ারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, আপনার কি বক্তব্য বলুন দেখি।"

দয়ারাম কহিলেন,—"মহারাজকুমারের বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের প্রতিজ্ঞা আছে,—আমরা পরের জমিদারীতে গিয়া বিবাহ দিব না।

এ কথা আমি পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করিয়াছি। অতএব এ সম্বন্ধে যাহা ব্যবস্থা হয়, আপনারাই বিচার করিয়া লউন।"

চৌধুরী মহাশয় তাহাতে উত্তর দিলেন,—"আমার একমাত্র কন্যা। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি—সকলই কন্যার। অতএব আমি প্রস্তাব করি,—আমি কন্যাকে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ যে ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিব, তাহাতে আসিয়া আপনারা অনায়াসেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করাইতে পারেন।"

নায়েব তিনকড়ি বসু একপার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। তিনি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আপনা-আপনি কহিতে লাগিলেন,—"আমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিতে চলিল! যে দিনই আমি পাত্রীর কথা শুনেছি, সেই দিনই আমার দয়ারাম রায়ের কথা মনে হয়েছে, সেই দিনই তার জমিদারীলিপ্সার কথা মনে হয়েছে; সেই দিনই বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার মনীবের গ্রামখানিও বুঝি বা নাটোর আসিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে।" আপনা-আপনি এই কথা বলিতে বলিতে তিনকড়ি বসু উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অস্ফুট স্বর শুনিতে পাইলেও কেহ সেদিকে কর্ণপাত করিলেন না।

যাহা হউক, দয়ারাম কহিলেন,—"বিবাহের পর দান করিলে চলিবে না। বিবাহের অগ্রে জমিদারী রাজা রামজীবনের অধিকার-ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। অপরের জমিদারীর মধ্য দিয়া, তিনি কখনই পুত্রের বিবাহ দেওয়াইতে আসিবেন না।"

চৌধুরী মহাশয় উত্তর দিলেন,—"ভাল,—সেই ব্যবস্থাই হইবে। এই গ্রামের অর্দ্ধেক অংশ আমি মহারাজের নামে লিখিয়া দিতেছি। ভবানী-মন্দির এবং শিবালয়ের মধ্যবর্ত্তী যে রাজপথ, তাহাই সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইল। পথের দক্ষিণাংশ আমার থাকিল; আর

উত্তরাংশ-শিবালয় প্রভৃতি—রাজা রামজীবনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।"

দয়ারাম রায় তাহাতেই সম্মত হইলেন। রাজভ্রাতা বিষ্ণুরাম উমাকে আশীর্বাদ করিয়া আসিলেন। লগ্ন-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। মহারাজের প্রতিনিধিস্বরূপ দয়ারাম লগ্নপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। কহিলেন,—"কাল হইতে শিবালয়ের পার্শ্বে বিবাহের উপযোগী রাজভবন প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইবে।" পরিশেষে, বরপক্ষ কন্যাপক্ষ উভয় পক্ষ হইতে কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়গণকে যথা-যোগ্য বিদায় ও সম্মান প্রদান করা হইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও আশানুরূপ বিদায় প্রাপ্ত হইলেন। ভৃত্যবর্গও যথারীতি পারি-তোষিক প্রাপ্ত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সমারোহ।

কয় দিন উদ্যোগ-আয়োজনে কাটিয়া গেল। এক-দিকে নাটো-রের তরফ হইতে বিবাহের উপযোগী সাময়িক পটমণ্ডপ গৃহাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল। অন্য দিকে চৌধুরী মহাশয় বরপক্ষের অভ্যর্থনার উপযোগী ভক্ষ্যভোজ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের এলাকা মধ্যে যেখানে যত পুষ্করিণী ছিল, তাহা হইতে মৎস্য ধরাইবার ব্যবস্থা হইল; চৌধুরী মহাশয়ের এলাকা মধ্যে যেখানে যত গোপের বসতি ছিল, সর্ব্বত্র দধি-দুগ্ধ-ক্ষীরের বায়না দেওয়া হইল; নিকটে যেখানে যত মোদকের বাস ছিল

সকলেরই উপর মিষ্টান্ন-সামগ্রী সরবরাহের ভার অর্পিত হইল। নাটোর-রাজধানীতে বিবাহোৎসব উপলক্ষে জিনিষ-পত্র টান পড়িতে পারে, তজ্জন্য চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিলেন।

একদিকে ভারে ভারে দব্যজাত আসিতেছে; অন্য দিকে গোযানে, শিবিকায়, নৌকাযোগে, নানাস্থান হইতে, আত্মীয়-স্বজনকে আনয়ন করা হইতেছে। যেখানে যেখানে যে কেহ সম্পর্কীয় কুটুম্ব-কুটুম্বিনী ছিল, কন্যার বিবাহে চৌধুরী মহাশয় কাহাকেও স্বগৃহে আনয়ন করিতে ত্রুটি করিলেন না। পাকুড়িয়া হইতে শ্বশুর বাড়ীর কুটুম্বগণ সকলেই আসিলেন। তাঁহার সহিত যাঁহাদের একটুও সম্পর্ক ছিল, চৌধুরী মহাশয় তাঁহাদিগকেও সমাদরপূর্ব্বক আনয়ন করিলেন। বাড়ী-ঘর কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে পূর্ণ হইল। বিবাহ-সম্বন্ধ ধার্য্য হওয়ার পর হইতে মাসাধিককাল চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে যেন নিত্যযজ্ঞ চলিতে লাগিল।

সেই উৎসব সমারোহের কিছু কিছু আভাস, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের পুঁথি-পত্রে পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন,—কন্যার বিবাহ উপলক্ষে চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে যেন প্রদর্শনী বসিয়া গিয়াছিল। মাছ—তাই কত রকমের! ছোট আছে; বড় আছে, মাঝারি আছে; কাৎলা আছে, রুই আছে, মৃগেল আছে। চাঁই মাছ, বোয়াল মাছ, আড় মাছ—বড় বড় মাছেরই কি সংখ্যা করা যায়? তারপর, চিংড়ি আছে, চুণা আছে, খলসে আছে,—আরও কত কি আছে! ইলিশ মাছের তো কথাই নাই। মাছ—কুটিতে বসিয়াছেই বা আবার কত লোকে; হ'রের মা কুটিতেছে, শ্যামার মা কুটিতেছে, কুড়নির মা কুটিতেছে; ছেলের [illegible] মেয়েয় কুটিতেছে, বুড়োয় কুটিতেছে, বুড়িতে কুটিতেছে।

কেহ আঁস বাছিতেছে, কেহ চাকা কাটিতেছে, কেহ ছাই মাখাইতেছে; কেহ ধুইতে যাইতেছে, কেহ ধুইয়া দিতেছে, কেহ ধুইয়া আনিতেছে। ছেলে-পিলের দল—অনেকেই মাছ কোটা দেখিতে বসিয়া গিয়াছে। তাহাদের কেহ আঁইস মাখিতেছে, কেহ মাছের লেজ ধরিয়া টানিতেছে, কেহ মাছের পটকা লইয়া আওয়াজ করিতেছে; কেহ বা আঁইস হাত করিয়াছে বলিয়া, তাহার দিদির নিকট মার খাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। কোনও দুষ্ট ছেলে দুষ্টামী করিয়া মার খাইবার ভয়ে পলাইতেছে।

এই মাছ কোটার সঙ্গে সঙ্গে আবার রঙবেরঙের গল্প আরম্ভ হইয়াছে। হ'রের মা বলিল,—'সেবার আমি পশ্চিমে গিয়ে, সাড়ে কুড়িহাত লম্বা চাঁই মাছ কুটে এসেছিলেম; এ সব মাছ কি আর তার কাছে লাগে?' কিন্তু শ্যামার দিদি তাহাতে উত্তর দিল,—"চাঁই মাছের চেয়ে রুই মাছ আরও বড় হয়।" শ্যামার দিদির এই কথায় হ'রের মা তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল; বলিল,—"আ-মর চোক্‌খাকির! চোখের মাথা কি একেবারে খেয়ে ব'সে-ছিস্! চাঁই মাছের চেয়ে কি কখনও মাছ বড় হয়?" শ্যামার দিদিই বা সহিবে কেন? সেও অমনি বলিয়া উঠিল,—"আ"-মর, আঁটি-কুঁড়ি; বিনি-দোষে আমায় যে গালাগালি দেয়, তার সর্ব্বনাশ হোক্, সে চোখের মাথা খাক, তার যে যেখানে আছে, সব এক গাড়ায় যাক্!"

কথায় কথায় কথা ক্রমশঃ বাড়িয়া গেল। শেষে যখন কথায় আর কুলাইল না, পরস্পর পরস্পরের প্রতি বঁটি লইয়া ধাবমান হইল,—নাক-কাটাকাটির পালা আরম্ভ হইল।

কৃত্তিবাসের উপর মৎস্য-বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত ছিল। দূর হইতে এই গালাগালি-গণ্ডগোল শুনিয়া, কৃত্তিবাস, তাড়াতাড়ি

হারের মা ও আমার দিদির কাতুড়খানা চাপিয়া ধরিল; গালাগালি দিয়া বলিতে লাগিল,—"ছোট লোক বেটিরা! বেরো বাড়ী থেকে! যা,—তোদের আর মাছ কুটতে হবে না।" এই বলিয়া কৃত্তিবাস তাহাদিগকে যখন তাড়াইয়া দিবার উদ্যোগ করিল, তাহারা ধীরে ধীরে আপন-আপন বটি সংযত করিয়া, গজগজ করিতে করিতে মাছ কুটিতে বসিয়া গেল। যাহা হউক, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন,— সেই হইতেই কৃত্তিবাসকে বরাবর মাছ-কোটার কাছে বসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। মাছ-কোটার ব্যাপারই এই। এইরূপ, তরকারী-কোটা আছে; রন্ধনশালা আছে; আমিষের দিক্ আছে; নিরামিষের দিক্ আছে।

ভাণ্ডারশালাই বাকি প্রস্তু; এক দিকে চাল-ডাল ময়দা, স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে; এক দিকে তৈল, ঘৃত, মসলা, তেজপত্র, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ প্রভৃতি স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, এক দিকে, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, মাখন, ছানা, চিনি, সন্দেশ—তবকে তবকে সাজান রহিয়াছে; এক দিকে লাউ, বেগুন, কুমড়া, থোড়, মোচা, আলু, শাক, কাঁচকলা, কলাপাত,—কতই যে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

রন্ধন-শালারই বা কি ব্যবস্থা! রন্ধন-কার্য্য তখনকার দিনে গৃহস্থ-বধূগণের প্রশংসার বিষয় ছিল। সুতরাং কর্ম্মবাড়ীতে রন্ধন-কার্য্যের পারদর্শিতা দেখাইয়া সুনাম অর্জ্জনের জন্য পুরমহিলা মাত্রেই তখন ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতেন। এখন যেমন গৃহস্থের নিত্যকার্য্যেই পাচক না হইলে চলে না,—পাঁচ জনের তো দূরের কথা, একমাত্র স্বামীর জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইলেও প্রাতঃকাল হইতে গৃহিণীর মাথা ধরিয়া থাকে; তখনকার কালে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইত,—রান্নার নাম শুনিলে রন্ধনকার্য্যে যাইতে

পারিলে, গৃহিণীরা আপনাদিগকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেন; এমন কি, সত্য সত্য কখনও মাথা ধরিলে রন্ধনের আনন্দে তাহাদের সে মাথাধরা পর্য্যন্ত সারিয়া যাইত।

হায় সে কাল! তখন ফিট ছিল না, হিষ্টিরিয়া ছিল না, মাথা-ধরা ছিল না, গাত্র-বেদনা ছিল না! কুলমহিলারা অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্ন বিতরণ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইতেন।

গ্রামের ব্রাহ্মণমহিলারা প্রায় সকলেই আসিয়া চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে সেই রন্ধনশালায় যোগদান করিয়াছেন। পারদর্শিতা অনুসারে এক একজন এক এক বিভাগের ভার পাইয়াছেন। এক দিকের রন্ধনশালায় কেবলই অন্ন প্রস্তুত হইতেছে। প্রায় পাঁচিশটা উনমে বড় বড় তপুয়া চড়িয়াছে। আর, তাহারই পার্শ্বের একটী ঘরে পর্ব্বত-প্রমাণ করিয়া ভাত ঢালা হইতেছে; প্রায় পনের জন পুর-মহিলা কোমর বাঁধিয়া ভাত রাঁধিতে ব্রতী হইয়াছেন। অপর এক দিকের রন্ধনশালায় কেবলই মৎস্য রন্ধন হইতেছে। চারি পাঁচজন মাছ ভাজিতে লাগিয়াছেন, দশ বারো জন মাছের তরকারী রাঁধিতেছেন। এইরূপ, কোথাও দাল হইতেছে, কোথাও, ভাজা হইতেছে, কোথাও তরকারী হইতেছে, কোথাও পায়স হইতেছে,— বিস্তর করিয়া আর কত বলিব?

চৌধুরী মহাশয়ের সবে-মাত্র একটি কন্যা। সেই কন্যার বিবাহ। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্ব হইতে কন্যার দ-বসন্তে পুনরাগমন পর্য্যন্ত প্রায় এক মাস কাল তিনি গ্রামের কাহারও বাড়ীতে হাঁড়ী চড়াইতে দেন নাই। একদিকে কুটুম্ব-কুটুম্বিনীগণ, অন্য দিকে গ্রামস্থ ইতর-ভদ্র মেয়ে-পুরুষ সকলেই সে কয় দিন চৌধুরী মহাশয়ের বাটীকে আপন বাড়ী মনে করিয়াছিল। সেকালে পল্লীগ্রামে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কাহারও বাড়ী ক্রিয়া-কর্ম্ম উপস্থিত হইলে, অনেক দিন

পর্য্যন্তই এইরূপ "দীয়তাং ভুজ্যতাং" চলিত ; বিশেষতঃ চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় জমিদারবাড়ীর তো কথাই নাই।

দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থা তো এইরূপ! অন্যদিকে কুটুম্ব-কুটুম্বিনী-গণ কি ভাবে কে কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহারও একটু সন্ধান লওয়া যাউক। তাঁদের মধ্যে যুবতীরা প্রধানতঃ আপনাদের বেশভূষার পারিপাট্য সম্পাদনে ব্রতী আছেন ; কেহ বা চুল বাঁধিতেছেন, কেহ বা টিপ কাটিতেছেন, কেহ বা গহনা পরিষ্কার করিতেছেন, কেহ বা অভ্যর্থনার ত্রুটি হইয়াছে মনে করিয়া আপনা-আপনিই অভিমানে মগ্ন আছেন। কাহারও ছেলে কাঁদিতেছে ; তিনি তাহাকে থামাইতে ব্যস্ত আছেন, কেহ কচি মেয়েটীকে কোলে করিয়া সারাদিনই তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা পাইতেছেন।

নানা স্থানে নানা রঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। কোথাও বা পরচর্চ্চা হইতেছে, কোথাও বা সুয়ো-রাণী দুয়োরাণীর গল্প হইতেছে, কোথাও বা ছেলেয়-ছেলেয় ঝগড়া হওয়ায় সেই সূত্রে কোন্দল বাধিয়াছে। কস্তুরী দেবী কাহারও পরিচর্য্যার ত্রুটি করিতেছেন না। কাহার কিসে সন্তোষবিধান হয়, কাহার কিসে কষ্ট না হয়,—দিনরাত্রি তিনি তাহার তদ্বির করিয়া বেড়াইতেছেন। আকাশে যেমন মেঘ-পরিবর্তন হয়, বহুরূপীর যেমন রূপ পরিবর্তন হয়, অভিমানিনীর মান-অভিমানে যেমন জোয়ার ভাটা আসে, শিশুর মুখে যেমন এই-হাসি এই-কান্না দেখিতে পাই;—দিনরাত্রি চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে এই পরিবর্তনের প্রবাহ চলিয়াছে।

* * * *

এদিকে, শিবালয়ের পার্শ্বে রাস্তার ধারে যে বিস্তৃত ময়দান ছিল, সে ময়দান এখন আর ময়দান নাই। নাটোরের মহারাজের পক্ষ হইতে কয়দিনের মধ্যে সেখানে এখন একটী ক্ষুদ্র নগর বসানো

হইয়াছে। সারি সারি পটমণ্ডপ, সারি সারি চালাঘর, সারি সারি নূতন পথ,—সেখানে এখন কি বাজারই জুটিয়াছে।

যে মণ্ডপে বরের আসন, সে মণ্ডপের কি বাহার! বরের জন্য সিংহাসন। সিংহাসনের পার্শ্বে উচ্চাসনে ব্রাহ্মণগণের বসিবার স্থান। তদন্তে কায়স্থ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি [illegible] আসন। তদন্তে জনসাধারণের বসিবার স্থান। প্রায় পাঁচ [illegible] ইতর-ভদ্র বসিতে পারে,—তদুপযোগী করিয়া, সেই বিবাহ-মণ্ড[illegible] নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিবাহ-মণ্ডপের চাল—খড়ের ছাউনি [illegible] কিন্তু সহসা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ভিতরে বিবিধ কা[illegible]য্য-খচিত চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপের চারিপার্শ্বে ঝালর। ঝালরে সা[illegible]রীর কাজ। পট-মণ্ডপ কতকগুলি মৃৎস্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠি[illegible] সেগুলিকে স্ফটিকস্তম্ভ বলিয়া ভ্রম হয়। [illegible] গায়ে দেওয়ালগিরি। দেওয়ালগিরির পার্শ্বে [illegible] দেবদেবীর প্রতি-মূর্ত্তি। উপরে—চন্দ্রাতপের নিম্নভাগে—বড় [illegible] ঝাড় ঝুলিতেছে। তাহার কোনটীতে দ্বাদশটী, কোনটীতে পাঁচশটী, কোনটীতে পঞ্চাশটী এবং মাঝেরটীতে শতাধিক বাতিকাধার আছে। সেই মণ্ডপের চারিদিকে সিংহদ্বার; প্রত্যেক সিংহদ্বারের দুই পার্শ্বে দুই জন করিয়া সুসজ্জিত সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান। এই পটমণ্ডপের চতুর্দিকে সুপরিসর প্রাঙ্গণের পার্শ্বে প্রাচীর গ্রথিত হইয়াছে, এবং সেই প্রাচীরের চারিকোণে চারিটী নহবৎ বসান হইয়াছে। নহবতে এক এক সময়ে সময়োচিত রাগরাগিণীর আলাপ হইতেছে। বিবাহের কথাবার্ত্তা ধার্য্য হওয়ার পরদিন হইতেই এই সাময়িক সহর-নির্ম্মাণ-ব্যপদেশে নানা স্থান হইতে কারিকরগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বদিন সেই সহরে প্রায় দশসহস্র লোক আসিয়া জমিয়া গিয়াছিল। সেই দিনই, শোভাযাত্রা করিয়া রাজা রামজীবন রায়

আপনার পুত্র সমভিব্যাহারে ছাতিন-গ্রামে আসিয়া উপনীত হন। সেই দিন হইতেই গীতবাদ্য, যাত্রা, নাচ,—নানাস্থানে নানারূপ আমোদ-প্রমোদ চলিতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

আজ উমার বিবাহ। ছাতিন গ্রামে যেন আনন্দের প্রস্রবণ প্রবাহিত। প্রতিপদ্ হইতে কলায় কলায় বৃদ্ধি পাইয়া, পৌর্ণমাসী-নিশীথে ষোলকলায় শোভিত হইয়া, চন্দ্রমা যেমন পূর্ণ প্রতিভাত হন; ছাতিন গ্রামের আনন্দ তেমনি দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, আজ গ্রামখানিকে পূর্ণানন্দময় করিয়া তুলিয়াছে। গোধূলিলগ্নে বিবাহ। দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ লগ্ন নির্দ্ধারণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। শুভ লগ্নে শুভ মুহূর্ত্তেই কন্যা সম্প্রদান হইবে। জ্যোতির্বিদগণ সে মুহূর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন

শুভ মুহূর্ত্তে বিবাহ সম্পন্ন হইল। শুভ মুহূর্ত্তে আত্মারাম চৌধুরী রত্নাভরণভূষিতা কন্যা উমাকে সম্প্রদান করিলেন। শুভ মুহূর্ত্তে বর-বধূর শুভদর্শন সম্পন্ন হইল। শুভ মুহূর্ত্তে চারিচক্ষের মিলন হইয়া গেল। স্ত্রী-আচার, মন্ত্র উচ্চারণ,—কোনও অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হইল না। শুভ শঙ্খনিনাদে, শুভ বাদ্যধ্বনিতে, শুভবিবাহ বিঘোষিত হইল।

বাসরে আনন্দের কলকল্লোল উত্থিত হইল। উমা—রাজ-ঘরণী হইলেন; পিতামাতার সে আনন্দ কি আর রাখিবার স্থান

আছে? গ্রামবাসিগণেরও আনন্দের অবধি নাই। আত্মারাম চৌধুরী আনন্দে অধীর হইয়া, উদ্দেশে মহামায়ার চরণে প্রণাম করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"কন্যা জন্মিবার পূর্ব্বে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইল। সত্য সত্যই আমার উমা রাজরাণী হইতে চলিল। এখন তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, উমা আমার চির-আয়ুষ্মতী হইয়া, 'উমা' নামের সার্থকতা করুক।"

সে দিন সে রাত্রি সেই আনন্দ-কোলাহলেই অতিবাহিত হইল। পরদিন কুশণ্ডিকা। কুশণ্ডিকার পর বরভোজন, তদন্তে কুলীন বিদায়। তৃতীয় দিবসে বরবধূ লইয়া রাজা রামজীবন রাজধানীতে যাত্রা করিবেন।

প্রহরাতীত হইলে, উভয় পক্ষের গুরু পুরোহিত উপস্থিত থাকিয়া, বেদবিহিত কুশণ্ডিকা-যজ্ঞ সমাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হোম-কুণ্ডের পার্শ্বে বরবধূ উভয়ে উপবিষ্ট, পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে-ছেন, এক এক বার আত্মারাম কন্যার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন,—"মা" আমার, এতদিন আমার ঘর আলো করিয়াছিলেন, আজ হইতে আমার ঘর অন্ধকার করিয়া, নাটোরের রাজভবন উজ্জ্বল করিতে চলিলেন।" তাঁহার বড় আদরের উমা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, এ কথা যতই মনে হইতে লাগিল, চৌধুরী মহাশয়ের প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আনন্দের দিনে, সে ব্যাকুলতা কি করিয়া প্রকাশ করিবেন? কাজেই মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিয়া, শুভকর্ম্ম সমাধার জন্য একান্ত যত্নবান্ রহিলেন।

বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, হোমাগ্নি লকলক শিখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়াছে; বরবধূ সেই অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে উঠিয়াছেন। এমন সময়—এ কি অভাবনীয় দুর্ঘটনা! অগ্নি প্রদক্ষিণকালে, উমার

মস্তক হইতে স্খলিত হইয়া তাঁহার শিরোমুকুট "টোপর" সহসা সেই হোমাগ্নির মধ্যে পতিত হইল। "কি হইল! কি হইল! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!"—বলিতে বলিতে, মুহূর্ত্তের মধ্যে, হোমাগ্নি লকলক জিহ্বায় সে মুকুট গ্রাস করিয়া ফেলিল। আত্মারাম অধীর হইলেন। রাজা রামজীবন অধীর হইলেন; পুরোহিতগণ অধীর হইলেন; আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে কি যেন এক বিষাদের রোল উত্থিত হইল। সরোবরের শুভ্র স্বচ্ছ জলে কে যেন পঙ্ক প্রক্ষেপ করিল; পূর্ণিমার পূর্ণ শশধরে যেন কলঙ্ক রেখা বিকাশ পাইল।

আত্মারাম ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। "কি সর্ব্বনাশ হইল"—বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বাড়ীর মধ্যে কস্তুরী দেবী গুমরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা রামজীবন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন। কুশণ্ডিকা স্থগিত রহিল। সান্ত্বনায় কাহারও মন প্রবোধ মানিতে চাহিল না।

উমার মাতামহ হরিদেব ঠাকুর মহাশয় কার্য্যব্যপদেশে এই সময় হঠাৎ একবার অন্দরে গিয়াছিলেন। অন্দর হইতে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া, একপ্রকার হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই, পুরোহিত মহাশয়দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মুকুট ভস্মসাৎ হইয়াছে, তাহাতে কি ক্ষতি আছে? আপনারা যথারীতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন করুন। আশঙ্কার কোনই কারণ নাই।" এই বলিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে পাঁচটী বিল্বপত্র লইয়া উপবীত-সূত্র দ্বারা তিনি সেই বিল্বপত্র কয়টীকে গ্রথিত করিলেন। তার পর বলিলেন,—"মুকুট পুড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে কি হইয়াছে? এই বিল্বপত্রের মুকুট পরাইয়া দিতেছি; আর আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, শুভকার্য্যে শুভফল অবশ্যই ফলিবে।"

"হরিদেব ঠাকুর আপনি অগ্রসর হইয়া, উমার মস্তকে সেই বিল্বপত্রের মুকুট পরাইয়া দিলেন। পলকের মধ্যে এই ব্যাপার সম্পন্ন হইল। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ঠাকুর মহাশয়ের বাক্য শ্রবণ করিলেন। পুরোহিতবর্গ পুনরায় কুশণ্ডিকার বাদ্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। আবার বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হইল;—আবার হোমাগ্নি লকলক শিখা বিস্তার করিল।

যথাসময়ে কুশণ্ডিকা সমাপন হইলে, বরবধূ গৃহে প্রবেশ করিলেন। এদিকে যথারীতি "দীয়তাং ভোজ্যতাং" ব্যাপার চলিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

পরদিন বরকন্যা বিদায় গ্রহণ করিবে। চৌধুরী মহাশয় এবং কস্তুরী দেবীর প্রাণ আজ বড়ই অবসন্ন। আট বৎসর কাল যাহাকে অহর্নিশ চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিলেন;—যে এক দণ্ড চক্ষের আড়াল হইলে, তাঁহাদের প্রাণ আকুল হইত;—তাঁহাদের সেই বড় আদরের উমা আজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে! এ কথা যতই মনে হইতেছে, ততই যেন প্রাণ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। শুভ পরিণয়, শুভ সংঘটন, সুপাত্রে কন্যাসমর্পণ,—সকলই আনন্দের বিষয়, কিন্তু তবু কেন মনে হইতেছে,—কে যেন হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া, হৃদয়ের ধন কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে।

ক্রমে সেই বিদায়ের মুহূর্ত্ত আসিল। রাজা রামজীবন, চৌধুরী মহাশয়কে কহিলেন,—"যাত্রার লগ্ন হইয়াছে। লগ্ন উত্তীর্ণ না

হয়। আর বিলম্ব করিবেন না। বর-বধূ এখনই রওয়ানা করিতে হইবে।"

আত্মারামের কর্ণে সে বাক্য বজ্রবৎ-ধ্বনিত হইল। তিনি বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন,—"সময় হইয়াছে। আচ্ছা, ব্যবস্থা করিতেছি।"

আত্মারাম ক্ষুণ্ণমনে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—পট্টবস্ত্রপরিহিত বর-বধূ বরণ করিয়া বিদায় দিবার উদ্যোগ হইতেছে। দেখিলেন,—কস্তুরী দেবী ছলছল নেত্রে উমার মুখপানে চাহিয়া আছেন। দেখিলেন,—উমারও নয়ন-জলে বক্ষস্থল পরিপ্লাবিত হইতেছে। দেখিয়া, তিনি আপনিও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু উপায় নাই। আর দুই দণ্ড রাখিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়া কাঁদিয়া লইবেন,—সে অবসরও নাই। পাছে শুভ লগ্ন উত্তীর্ণ হয়, তাই সকল শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি বর-কন্যাকে শিবিকায় উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইলেন। পুর-মহিলাগণ, বর-কন্যাকে বেষ্টন করিয়া, শিবিকার অভিমুখে ভবানী-মন্দির-সন্নিকটে গমন করিলেন।

বর-কন্যা ভবানী-মন্দিরে প্রণাম করিলেন। যোগেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে প্রণত হইলেন। পিতা মাতার চরণে প্রণাম করিলেন। আত্মীয়-স্বজনের চরণে প্রণত হইলেন। সকলেই একবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সকলের আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া, উমা যখন শিবিকায় আরোহণ করিবেন, বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল; সেই সময়ে কে যেন উমার হাতে একখানি রৌপ্য পাত্র প্রদান করিয়া গেল। সেই রৌপ্য পাত্রের উপর কতকগুলি তণ্ডুল এবং একটী সুবর্ণমুদ্রা। যিনি উমার হস্তে সেই রৌপ্য পাত্র প্রদান করিলেন, তিনি উমাকে বলিয়া দিলেন,—তুমি তোমার পিতার হস্তে এই পাত্র প্রদান কর;

আর, তাঁহাকে বল,—"বাবা! এতদিন আমায় খাওয়াইয়া-পরাইয়া মানুষ করিয়াছেন ; এই আমি তাহা শোধ করিয়া চলিলাম।"

পাত্র হস্তে লইয়া উমা কাঁদিতে লাগিল। পিতাকে কেমন করিয়া সে এই মর্ম্মভেদী কথা বলিবে! বলি-বলি করিয়াও উমা বলিতে পারিল না। কিন্তু যিনি পাত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, তিনি আত্মারাম চৌধুরীকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া, হাত পাতিতে বলিলেন ; আর, পুনঃপুন উমাকে উক্ত বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

উমা অনেকক্ষণ কোনও কথাই কহিতে পারিল না। পাত্র হস্তে করিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল। তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র গ্রহণের জন্য হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া আত্মারাম চৌধুরীও কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবেই অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে রাজা রামজীবন রায় আসিয়া আবার বলিলেন,—"আর বিলম্ব করিবেন না। লগ্ন অতীত হয়।"

যিনি তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র আনিয়া উমার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন; তিনিও সঙ্গে সঙ্গে উমাকে কহিলেন,—"মা। আর বিলম্ব করিও না। এ কথা বলিতে হয়। ইহা বলাই নিয়ম।"

নিরুপায়! না বলিলে, নিয়ম লঙ্ঘন হয়! সুতরাং উমা বলিল। কিন্তু সে কি বলিল, তাহার ক্রন্দনবিজড়িত অস্ফুট-স্বরে তাহা ব্যক্ত হইল কি? উমা কি বলিল, কেহই তাহা শুনিতে পাইলেন না। উমাও কাঁদিতে লাগিল ; পিতাও কাঁদিতে লাগিলেন ; জননী কস্তুরী দেবীও কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে বাজনা-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বরকন্যা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বধূরাণী।

বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে আসিয়া উমা বধূরাণী বলিয়া পরিচিত হইলেন।

শ্বশুরগৃহে আসিবার পূর্ব্বে উমার পিতামাতা উমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—"এখন যে গৃহে যাইতেছ, সেই গৃহই তোমার আপনার গৃহ। এতকাল আমরা তোমার পিতামাতা ছিলাম; এখন হইতে তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীই তোমার পিতামাতা হইলেন।"

উমা, পিতামাতার এই উপদেশ ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিল। নাটোর-রাজধানীতে পদার্পণের পর, বালিকা এক দিনের জন্যও কাহাকেও বুঝিতে দেয় নাই যে, সে আপন স্নেহময় জনক-জননীকে পরিত্যাগ করিয়া পরের ঘরে আসিয়াছে। উমার গুণে, উমার ব্যবহারে, রাজা রামজীবন রায় এবং রাণী ভুবন-মোহিনী উভয়েই মুগ্ধ। উভয়েই মনে করেন—উমা যেন তাঁহাদের আপন কন্যা।

উমাকে পাইয়া রাজা ও রাণী উভয়েরই এখন আনন্দের অবধি নাই। উমার বিবাহের পূর্ব্বে রাজা রামজীবন স্বয়ং উমাকে দেখিতে যান নাই; দয়ারাম রায়ের পছন্দ অনুসারেই রামকান্তের বিবাহ হইয়াছিল। রাণী ভুবনমোহিনী তাহাতে কিছু সংশয়ান্বিতা হইয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি কথায় কথায় প্রায়ই বলিতেন,—"পরের চোখে পাত্রী স্থির করা,—কি জানি কি বউই ঘরে আসিবে।" কিন্তু উমা সংসারে প্রবেশ করার পর হইতে তাঁহার সে ধারণা দূর হইয়াছে। আজ তাই তিনি আপনা আপনিই স্বামীকে বলিতেছেন,—"বড় সৌভাগ্যবশেই আমরা উমার ন্যায় পুত্রবধূ পাইয়াছি।"

শুনিয়া, রামজীবনের বড়ই আনন্দ হইল। তাঁহার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি দয়ারাম রায়, উমার ন্যায় সুলক্ষণা পুত্রবধূকে অনুসন্ধান করিয়া আনিয়াছেন—সে কথা স্মরণ হওয়ায়, তিনি প্রীতি-প্রফুল্ল হইলেন।

রাজা হাসিতে হাসিতে রাণীর কথায় উত্তর দিলেন,—"কেমন, আমি বলিয়াছিলাম কি না? সাধে কি আমি দয়ারামকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া রাখিয়াছি।"

রাণী ভুবনমোহিনী কহিলেন,—"দয়ারাম রায়ের প্রতি আমার যে ভ্রম ধারণা ছিল,—উমার ন্যায় পুত্রবধূ পাইয়া, আমার সে ধারণা দূর হইয়াছে। মা যেন আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী।"

রামজীবন।—"উমা যে তোমার মনোমত হইয়াছে, এই আমার আনন্দ। রামকান্তকে পোষ্যপুত্র লওয়া অবধি দীর্ঘ আট বৎসর কাল তুমি কেবলই অসন্তোষের ভাব প্রকাশ ক'রে এসেছ। কিন্তু আজ কাল যেন পাশা উল্‌টে গিয়েছে দেখ্‌ছি।

ভুবনমোহিনী।—"পাশা সত্যিই উল্‌টে গিয়েছে। আপনাকে বল্‌বো কি, আপনি সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা, আমি এত দিন সত্যসত্যই রামকান্তকে দেখতে পার্‌তেম না, যখনই তাকে পুত্র ব'লে মনে ক'রবার চেষ্টা কর্‌তেম, তখনই তাকে পরের ছেলে—পোষ্য-পুত্র ব'লে মনে হ'ত। অনেক চেষ্টা ক'রেও আপনার শত উপদেশেও এতকাল আমি মনকে বাঁধতে পারি নাই। আপনার উপদেশ-অনুসারে বরাবরই তাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন ক'রে এসেছি বটে; কিন্তু একদিনও—"

রাজা রামজীবন বাধা দিয়া কহিলেন,—"এখনই বা হঠাৎ সে ভাব বদ্‌লে গেল কেন?"

ভুবনমোহিনী।—"বদ্‌লে গেল—উমার মুখ দেখে। যেদিন

মনে হ'ল,—উমা আমার পুত্রবধূ, সেই দিন থেকে রামকান্তকেও পুত্র ব'লে মনে হ'তে লাগলো। উমার গুণেই রামকান্ত আমার পুত্র।

রামজীবন।—"তুমি সত্যই ব'লেছ। মা'র আমার যেমন রূপ, তেমনই গুণ। মা আমার পরকেও আপনার করিয়া লইতে পারে।"

ভুবনমোহিনী।—"আমি অন্যে কাহারও প্রশংসা করি না। উমার এক এক দিনের এক একটি ঘটনার কথা মনে হয়, আর আমি আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে পড়ি। সেবার আমার জ্বরের সময়, নয় বৎসরের বালিকা উমা আমার কি শুশ্রূষাই না ক'রেছিল। প্রত্যহ রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উমা আমার পা টিপে দিত। আমি কত নিষেধ ক'র্‌তেম; পুনঃপুন বলতেম,—'মা তোমার কষ্ট হ'চ্ছে, তুমি শোও গে যাও।' কিন্তু উমা, তাতে উত্তর দিত, 'না মা! আমার কোনও কষ্ট হ'চ্ছে না।' তার পর, সে সময় আর আর যে যে রকমে আমার সেবা ক'রেছে, আপনাকে বলতে সঙ্কোচ হয়। আপন পেটের ছেলে-মেয়েতেও মা-বাপকে যেমন যত্ন না করে, উমা আমাদের সেই রকম যত্ন ক'রে থাকে। আপনি আরও লক্ষ্য করে দেখবেন,—উমা ঘরে আসার পর থেকে রামকান্তেরও যেন আমাদের প্রতি বেশী ভক্তির ভাব দেখতে পাই।"

রামজীবন।—"সত্যই ব'লেছো। রামকান্তের ভাবও অনেকটা পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে—বুঝতে পারি।"

উমার সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা চলিতেছে, এমন সময় উমা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। উমা অবগুণ্ঠনাবৃতা। হস্তে ক্ষুদ্র একটী রূপার বাটী। বাটীতে অল্প খানিক জল। উমা শ্বশুর মহাশয়ের পাদোদক লইতে আসিয়াছে।

অত বেলায় উমা পাদোদক লইতে আসিয়াছে—শ্বশুর শাশুড়ী উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। রাজা রামজীবনের বিশ্বাস ছিল, উমা

অনেকক্ষণ পাদোদক লইয়া গিয়াছে। শ্বাশুড়ী ভুবনমোহিনীরও সে কথা মনেই ছিল না। এখন উমাকে এই ভাবে আসিতে দেখিয়া, তাঁহারা উভয়েই লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইলেন।

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! তোমার এখনও খাওয়া-দাওয়া হয় নাই? আমি কখন তোমাকে খেতে ব'লেছি, তুমি এত দেরি কর্‌লে কেন? বাড়ীর সকলের খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গিয়েছে, তুমি এখনও উপবাসী!"

উমা নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা রামজীবন ভুবনমোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"আমি তোমাকে কালই বলিয়াছিলাম, আজ আমার আসিতে বেলা হইবে। আমি গ্রামান্তরে গিয়াছিলাম; তাই আমার বলা ছিল,—তোমরা সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া লইও। কিন্তু এখন দেখিতেছি,—তোমরা দুই জনই সমান। তুমি না হয়, উপবাস করিয়া থাকিতে; কিন্তু বউমাকে এ কষ্ট দেওয়া কেন?"

ভুবনমোহিনী।—"উমাকে আমি বলিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু আপনার ও রামকান্তের আহার না হইলে, উমা কখনই আহার করে না। এ আজ নূতন নয়। উমা যেদিন হইতে আসিয়াছে, সেই দিন হইতেই উমার এই ভাব দেখিয়া আসিতেছি। এত বেলা হইল, উমার অবসর দেখিতে পাইয়াছি কি? উমা প্রভাতে উঠিয়াই গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হয়, আর রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উহার কর্ম্মের শেষ নাই। আপনার পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করে কে, জানেন কি?—সে এই উমা। ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করে কে, জানেন কি?—সে এই উমা। রন্ধন-শালায় গিয়াও এক একদিন দেখিতে পাই,—উমা রন্ধনের সাহায্য করিতে বসিয়া গিয়াছে। আমি কত বারণ করি, উমা শোনে না। এই যে আজ এত বেলা পর্য্যন্ত উমার আহার হয়

নাই, তাহার কারণ শুনিবেন কি? আপনার পূজা শেষ হওয়ার পর, উমা ঠাকুর ঘরে পূজা করিতে গিয়াছিল, আপনার আহার শেষ হওয়ার পর পূজা শেষ করিয়া, উমা এখন পাদোদক লইতে আসিযাছে।"

রাজা রামজীবন, রাণী ভুবনমোহিনীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কহিলেন,—"এখন হইতে আমিও আর স্নানাহারের বিলম্ব করিব না, তোমাদিগকেও বিলম্ব করিতে দিব না। এখন যাও, তুমি উমার আহারের ব্যবস্থা করগে।"

এই বলিয়া, রাজা রামজীবন উমার হস্তস্থিত জলপাত্রে পদস্পর্শ করিলেন। উমা শ্বশুর-মহাশয় ও শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত। উমা এখনও জলগ্রহণ করে নাই। উমার প্রায় প্রতিদিনই এইভাব। সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া উমা প্রতিদিনই পূজাহ্নিক করে। পূজাহ্নিকের পর প্রতিদিনই শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের পাদোদক পান করে। এদিকে শ্বশুর-শাশুড়ী গুরুজনের সেবা-শুশ্রূষায়ও তাহার কখনও ত্রুটি নাই। বধূ-রাণী-বেশে রাজসংসারে আসিয়া, উমার এই অভিনব ভাব-বৈচিত্র্য!

রাজা রামজীবন বিশ্রাম-কক্ষে বসিয়া উমার বিষয় যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় আনন্দে গদ্গদ হইতে লাগিল। ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"বড় ভাগ্যফলে উমাকে পুত্র-বধূরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।"

রাণী ভবানী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালচক্র।

বিবাহের পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। ১১৪৪ সালে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রামজীবন রায় লোকান্তরে গমন করিলেন। রাণী ভুবনমোহিনী কাশী-বাসিনী হইলেন। কুমার রামকান্ত এখন 'মহারাজ' নামে অভিহিত; আর বধূরাণী উমা, 'রাণী ভবানী' নামে পরিচিত। কুমার রামকান্তের বয়ঃক্রম এখন অষ্টাদশ বর্ষ; ভবানী ত্রয়োদশবর্ষীয়া। কিশোর-কিশোরী সংসার-সমুদ্রে ভাসমান হইলেন। পাঁচ বৎসরে এত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গেল।

অভিভাবক বলিতে এক দয়ারাম ভিন্ন এখন আর সংসারে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। রামজীবনের মধ্যম ভ্রাতা রঘুনন্দন—যিনি নাটোর-রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্থানীয় ছিলেন, তিনি তো বহু পূর্ব্বে মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কনিষ্ঠ বিষ্ণুরাম, কুমার রামকান্তের বিবাহের পর বৎসরেই লোকান্তরে গমন করেন। সুতরাং এক দয়ারাম

ভিন্ন সংসারে কুমার রামকান্তের অভিভাবক আর কে আছে? রাজা রামকান্তের প্রতিনিধিরূপে তিনিই এখন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

রামকান্তকে দত্তকগ্রহণের পূর্ব্বে, রাজা রামজীবনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুরামের এক পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। তাঁহার নাম—দেবীপ্রসাদ। দত্তকগ্রহণের সময় দেবীপ্রসাদ এবং রামকান্ত উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক। দেবীপ্রসাদ বিদ্যমান থাকিতেও, রাজা রামজীবন রায় কেন রামকান্তকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, তাহার কারণ কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। জ্যেষ্ঠানুগতপ্রাণ বিষ্ণুরামও সে বিষয়ে অগ্রজকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না। এদিকে মৃত্যুর পূর্ব্বে আপন পুত্রের জন্য বিষয়-সম্পর্কে তিনি কোনই ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল,—দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেও রাজা রামজীবন কখনও দেবীপ্রসাদকে বঞ্চিত করিবেন না; আর সেই বিশ্বাসেই তিনি সুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিবে? বিষ্ণুরামের আনুগত্যে মুগ্ধ হইয়া, রাজা রামজীবন দেবীপ্রসাদকে আপন রাজ্যের ছয় আনা অংশ প্রদান করিবেন—সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবীপ্রসাদ অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া তিনি পাঁকাপাকি কোনই বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, মৃত্যুর সময়ও তিনি আপন মনোগত অভিপ্রায় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিয়া যান নাই। রামজীবন কোনও কথা বলিয়া না যাইলেও, তাঁহার অভিপ্রায় দয়ারামের অপরিজ্ঞাত ছিল না। রামজীবন গিয়াছেন; তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে? দয়ারাম স্থির করিয়াছেন,—দেবীপ্রসাদের ন্যায্য অংশ দেবীপ্রসাদকে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে।

কিন্তু মানুষের সকল আশা সকল সময়ে পূর্ণ হয় কি? ঘটনা-

স্রোত অন্ত পথে প্রধাবিত হইল। একদিকে রামকান্ত ভাবিলেন,—"আমার পিতার রাজ্য; আমি দেবীপ্রসাদকে কি জন্ত অংশ দিতে যাইব? যদি দেবীপ্রসাদের কিছু প্রাপ্য থাকিত, রাজা রামজীবন অবশ্যই তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন।" অন্ত দিকে দেবীপ্রসাদ ভাবিলেন,—"আমার পৈতৃক রাজ্য; কোথাকার কোন্ পোষ্যপুত্র আসিয়া তাহা অধিকার করিবে; আমি প্রাণ থাকিতে কখনই তাহা সহ্য করিব না। আমি বিদ্যমান থাকিতে পোষ্যপুত্র কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না।"

রামকান্ত বলিতেছেন,—"সম্পত্তি আমার। আমি এক বিন্দু সম্পত্তি দেবীপ্রসাদকে দিব না।" দেবীপ্রসাদও বলিতেছেন,—"সম্পত্তি আমার। আমি এক বিন্দু সম্পত্তি রামকান্তকে প্রদান করিব না।" উভয় পক্ষেরই উৎসাহদাতারও অভাব নাই।

বিচক্ষণ দয়ারাম উভয়েরই মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। দেখিলেন,—বিষম সমস্যা উপস্থিত। ভাবিলেন,—উভয় সঙ্কট। বুঝিলেন,—এ বিবাদ-বহ্নি সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তথাপি চেষ্টা করিতে হয়,—তাই বিবাদ-ভঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দয়ারাম বালকবয়স হইতে যাঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত, সেই সংসার এইরূপে গৃহবিবাদে ছারেখারে যাইবে;—আর তিনি চক্ষের উপর তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন? রঘুনন্দন কত কষ্টে এই সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; রাজা রামজীবনও অশেষ আয়াসে এই অতুল সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; কনিষ্ঠ বিষ্ণুরামও, জ্যেষ্ঠদ্বয়ের মুখ চাহিয়া, তাঁহাদের কত বিপদে প্রাণদানেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। একে একে সেই সকল কথাই দয়ারামের মনে হইতে লাগিল। নাটোর-রাজ্যের গৌরব-সম্ভ্রম রক্ষার জন্ত তিনি নিজেও যে এ পর্য্যন্ত কত অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, এবং তাহার সেই কৃতকার্য্যের

পুরস্কারস্বরূপ রাজা রামজীবন তাঁহাকে যে কত ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সে সকল কথাও তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি উভয় পক্ষের হিতাভিলাষী হইয়া, উভয়ের নিকটেই বিবাদ-মীমাংসার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তিনি রামকান্তকে কহিলেন,—"দেখ, রামকান্ত! দেবীপ্রসাদকে বঞ্চিত করা, কোন ক্রমেই উচিত নহে। এই নাটোর-রাজ্য রক্ষার জন্য তোমার খুল্লতাত বিষ্ণুরাম কোনও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার পুত্রকে বঞ্চিত করিলে, বড়ই অন্যায় কাজ করা হইবে না কি?"

রামকান্ত সেদিন কোনও উত্তর দিলেন না। দয়ারাম মনে করিলেন,—"রামকান্ত উত্তর না দিলেও, আমার অবাধ্য হইতে পারিবে না।" দয়ারাম, দেবীপ্রসাদকেও সেইরূপ ভাবেই বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন। দেবীপ্রসাদকে কহিলেন,—"দেখ দেবীপ্রসাদ! ঘরে ঘরে অকারণ বিবাদ করিলে, রাজ্য ছারেখারে যাইবে। তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাত রাজা রামজীবন রায় বহু কষ্টে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পোষ্যপুত্র রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ইহাতে তোমার বাধা দেওয়া কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নয়। তথাপি, আমি স্থির করিয়াছি,—তোমাকে রাজ্যের ছয় আনা অংশ প্রদান করিব। তোমার সম্বন্ধে, আমি যতদূর জানি, রাজা রামজীবনেরও সেই ইচ্ছা ছিল।"

দেবীপ্রসাদ বড়ই বিরক্ত হইলেন। ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে উত্তর দিলেন,—"আপনি এ কি বলিতেছেন? আমি বংশধর বিদ্যমান থাকিতে, কোথাকার কোন্ পোষ্যপুত্র আসিয়া এই সম্পত্তি অধিকার করিবে? আপনার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির মুখে এ অনুরোধ কখনই শোভা পায় না। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আপনি কখনও আমার নিকট এই অসঙ্গত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে আসিবেন।"

দেবীপ্রসাদ এ বলে কি! দয়ারামের সমক্ষে এইরূপ গর্ব্বিত উত্তর! দেবীপ্রসাদকে এ পরুষ উত্তর কে শিখাইয়া দিল? দয়ারাম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, দেবীপ্রসাদের বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া গেলেন। এ দিকে লোকপরম্পরায় শুনিতে পাইলেন, রামকান্তও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত নহেন। যাহা হউক, তিনি বিচলিত হইলেন না। ভাবিলেন,—"আরও দিন কতক কাটিয়া যাক্। এখন যে ভাবে চলিতেছে, কাজ কর্ম্ম সেই ভাবেই চলিতে থাক্। সময়ে বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে, যুবকদ্বয় অবশ্যই আমার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে।"

এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া গেল; কিন্তু বিবাদ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। দয়ারামও দিন দিন হতাশ হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ হইতে বিশেষ কোনও পরামর্শের জন্য আমন্ত্রণ-পত্র আসিল। সে পত্র গোপনীয়; একজন বিশ্বস্ত দূত, সেই পত্র লইয়া, দয়ারামের নিকট উপস্থিত হইল। পত্র লিখিয়াছেন,—রায় রায়াণ আমলচাঁদ। পত্রের মর্ম্ম,—"শেঠ ভবনে এক পরামর্শ-সভা বসিবে। সেই সভায় রাজা রামকান্তের অথবা তাঁহার প্রতিনিধি দয়ারাম রায়ের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।" দয়ারাম, রামকান্তকে সেই পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইলেন। কিন্তু রামকান্ত অপরিপক্ক-বুদ্ধি; সুতরাং দয়ারাম স্বয়ংই মুর্শিদাবাদ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রামকান্তেরও তাহাই অভিপ্রায় হইল।

দয়ারাম মুর্শিদাবাদ চলিয়া গেলেন। রামকান্ত ও দেবীপ্রসাদ দুই জনেই সুযোগ পাইলেন। দুই জনেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। দুই জনেরই মনের মত সহচরবর্গ জুটিয়া গেল। দুই জনেরই মজলিসে আমোদের ফোয়ারা ছুটিল; দুই জনের নামেই কুৎসা রটিল। দুই জনেই দুই জনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চক্রান্ত।

পিতা বিষ্ণুরামের মৃত্যুর পর দেবীপ্রসাদের সাঙ্গোপাঙ্গ জুটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। রাজা রামজীবন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাহারা তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু রামজীবনেরও লোকান্তর হইল; তাহারাও দেবীপ্রসাদকে ঘিরিয়া বসিল।

সঙ্গীরা পূর্ব্বাপরই দেবীপ্রসাদকে শিখাইতেছিল,—"রাজ্য তো আপনারই! রামকান্ত কোথাকার কে—যে, সে আসিয়া আপনার পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া বসিবে? আপনি কখনই শুনিবেন না; কখনই রামকান্তকে অংশ দিতে সম্মত হইবেন না।"

দেবীপ্রসাদ সেদিন যে দয়ারামের মুখের উপর উত্তর দিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাহাও সেই সাঙ্গোপাঙ্গগণের প্রভাবের ফল। দয়ারাম সেদিন দেবীপ্রসাদের নিকট বিষয়-বিভাগের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইবেন, বেণীভূষণ মৈত্র তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বেণীভূষণ দূর-সম্পর্কে বিষ্ণুরামের শ্যালক; সুতরাং দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে মাতুল বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বেণীভূষণের অবস্থা বড়ই হীন ছিল। বিষ্ণুরামকে ধরিয়া তিনি রাজবাড়ীতে আশ্রয় পান, পরিশেষে বিষ্ণুরামের অনুরোধে দয়ারাম রায় তাঁহাকে সদরের তহশীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই হইতেই বেণীভূষণ বাড়ী-ঘর করেন; সেই হইতেই ক্রমশঃ বেণীভূষণ রাজবাড়ীর এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তির মধ্যে পরিগণিত হন।

বেণীভূষণের পুত্রের নাম—কৃতান্তকুমার। কৃতান্তকুমার ও দেবী-

প্রসাদ—সমবয়স্ক। দুই জনে বড়ই প্রণয়; কি কাজ আছে বলুন।
প্রসাদের সখ্য স্থাপনের জন্য, বেণীভূষণ বহুদিন হ কি ?"
ছিলেন; তাঁহাদের সৌহার্দমূলে আজীবন উৎসাহ- …বী হও! তোমার
আসিতেছিলেন। কালবশে এখন তাঁহার সে উদ্যম কেন? যতই যা
যার আশা হইয়াছে; দেবীপ্রসাদ ও কৃতান্তকুমারের সখ্যতরু এখন মুকুলিত ও পল্লবিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেণীভূষণ আশা করেন,—শীঘ্রই তাহা ফুল-ফল সমন্বিত হইবে, এবং তিনিই তাহার ফলভাগী হইতে পারিবেন। বাস্তবিক দেবীপ্রসাদও এখন বেণীভূষণকে কি ভক্তির চক্ষেই দেখিয়া থাকেন! বেণীভূষণের পরামর্শ ভিন্ন দেবীপ্রসাদ এখন আর এক পদও অগ্রসর হন না। বৈজ্ঞানিকগণ বিশিষ্ট আধার-সাহায্যে তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া যেমন পদার্থান্তরে ক্রিয়া-প্রকাশে সমর্থ হন, বেণীভূষণও সেইরূপ কৃতান্তকুমারের সাহায্যে দেবীপ্রসাদের উপর আপন কূট-নীতি পরিচালনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যেদিন দয়ারাম রায় দেবীপ্রসাদকে বিষয়-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলেন, তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রে বেণীভূষণ দেবীপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। আর, যাহা কিছু বুঝাইবার, স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অধিক কি; সে দিন জয়কালীর মন্দির সম্মুখে যুবক দেবীপ্রসাদকে দাঁড় করাইয়া, বেণীভূষণ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন,—"যদি পিতা বিষ্ণুরাম ফিরিয়া আসিয়া বলেন,—'শ্যামকান্তকে বিষয়ের ভাগ দেও' তথাপি সম্মত হইব না।" বলা বাহুল্য, সেই প্রতিজ্ঞারই ফল,—দয়ারামের মুখের উপর সাফ জবাব। নচেৎ এতদূর প্রস্তুত না হইলে, যুবক দেবীপ্রসাদের কি সাধ্য ছিল যে, তিনি দয়ারামের মুখের উপর উত্তর দিতে পারেন।

উত্তর শুনিয়া দয়ারাম স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিনই তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ যাইতে হয়; সুতরাং কোনও প্রতীকার উপায়

দ্বিতী পারেন নাই। বুঝিয়াছিলেন বটে, বেণী-
শ্রয় দিয়া তিনি স্বহস্তে যে বিষবৃক্ষের বীজ
তাহাই এখন পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিয়া-
—অচিরে সে বিষবৃক্ষ উন্মূলিত না হইলে সোণার সংসার ছারখারে যাইবে! তবে সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহাও বুঝিয়াছিলেন,—ঐ বিষবৃক্ষ যেরূপ শিকড় বিস্তার করিয়া বসিয়াছে, তাহাতে উহার উন্মূলন সময়-সাপেক্ষ। সুতরাং স্থির করিয়াছিলেন,—মুর্শিদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যথাকর্ত্তব্য বিহিত করিবেন।

যাহা হউক, দয়ারামও মুর্শিদাবাদ চলিয়া গেলেন; চক্রীদিগের চক্রান্ত-জালও বিস্তৃত হইতে লাগিল। বেণীভূষণ অনেক দিন হইতে রামকান্তের পারিষদবর্গকে হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টান্বিত ছিলেন। একজন বশীভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আশানুরূপ ফল ফলিতেছিল না। এখন দয়ারাম রায় মুর্শিদাবাদে যাওয়ায়, বেণীভূষণ সে পক্ষে বিশেষ সুবিধা পাইলেন। দুই এক দিন নিজেই এক একটা কার্য্যের অছিলায় রামকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন।

বেণীভূষণ প্রথম দিন রামকান্তকে একটা লেখা-পড়ার নকল দেখাইতে গেলেন; সেটা—কিছুই নয়; তাঁহার নিজের খানিকটা জমি, তিনি যেন একজন প্রজাকে বিলি করিবেন—সেটা সেই মর্ম্মের একখানা খসড়া লেখা-পড়া। সত্য কি মিথ্যা—তাহারও ঠিক নাই; অথচ, সেই উপলক্ষে গিয়া, কতই আপ্যায়িত করিয়া আসিলেন।

প্রথমেই কহিলেন,—"আজ আমার নিজের একটু পরামর্শের জন্য আসিয়াছি। অবসর হইবে কি?"

রামকান্ত সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; প্রণাম করিলেন; লজ্জিত

হইয়া ব্যস্ত-সমস্তে কহিলেন;—আপনার কি কাজ আছে বলুন। আপনার কাজের জন্য আবার অবসর অনবসর কি?"

বেণীভুষণ।—"চিরজীবী হও বাবা!—চিরজীবী হও! তোমার এমন মন না হ'লে তুমি অৰ্দ্ধ-বঙ্গের অধীশ্বর হবে কেন? যতই যা হই, আমরা তো তোমার কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কিছুই নই! কিন্তু তোমার কথা শুনে, নিজেকে ধন্য ব'লে মনে হলো!"

রামকান্ত অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—"আপনি বড়ই ভালবাসেন, তাই—"

বাধা দিয়া, বেণীভুষণ কহিতে লাগিলেন;—"বাবা! কেবল ভালবাসি ব'লে নয়! আমি সত্য সত্যই মনে করি, রাজা রামজীবন রায় পুত্ররূপে এখনও নাটোরের সিংহাসনে অবস্থিত আছেন। শাস্ত্রে আছে—'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।' শাস্ত্রবাক্য কখনও মিথ্যা নহে। আমি তাই তোমাতে রাজা রামজীবনকে দেখিতে পাই। তাই আমি নিজের বিষয়-কৰ্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ না লইয়া যেমন কখনও কোনও কাজ করিতাম না, তোমার পরামর্শ না লইয়া এখন তেমনি আমার আর কোনও কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না। এই যে দলিলখানি তোমায় দেখাইতে আসিয়াছি, ইহা অতি গোপনীয় বিষয়। অথচ, তুমি না দেখিলে আমার মন প্রত্যয় মানে না।"

রামকান্ত পূর্ব্ববৎ লজ্জিত ভাবেই কহিলেন,—"আপনি বিজ্ঞ বহুদর্শী; আপনি যাহা দেখিয়াছেন, আপনি যাহা স্থির করিয়াছেন; তাহার উপর আমি আবার কি দেখিব। আমার বুদ্ধি কতটুকু!

বেণীভুষণ।—"একথা অপরকে বলিলে, অপরে শুনিতে পারে। কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি না বাবা!—জাতি-সাপ আর ঢোঁড়া সাপে প্রভেদ নাই কি? কেউটের বাচ্ছা যত ছোট হোক্, তার যে বিষ;—ঢোঁড়া সাপ যতই বড় হোক্, তার বিষ কখনই উহার সমতুল্য

হয় না। তুমি রাজা রামজীবন রায়ের বংশধর; তোমার অভিজ্ঞতা স্বভাবজাত; জমি-জিরাৎ সম্বন্ধে তুমি যাহা বুঝিবে, আমাদের কি সাধ্য,—আমরা তাহা বুঝিতে পারি? আমাদের মধ্যে যিনিই যত পদস্থ হউন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তোমার বুদ্ধির কুশাগ্রের নিকট আমাদের কাহারও বুদ্ধির স্থান নাই।

রামকান্তের পারিষদ, হীরালাল মজুমদার, এই কথাবার্ত্তার সময় উপস্থিত ছিলেন। তাহাও বেণীভূষণেরই কৌশল। রামকান্ত হীরালালকে বিদায় দিয়া, একান্তে কথাবার্ত্তা কহিতে প্রস্তুত ছিলেন। বেণীভূষণ তাহাতে বলিয়াছিলেন,—"আমি যতদূর জানি; হীরালাল বাবু সেরূপ অসৎপ্রকৃতির লোক নহেন। তাঁহার সমক্ষে আমার কথাবার্ত্তার কোনই হানি দেখি না।" কাজেই হীরালালের সম্মুখেই কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। বেণীভূষণের কথায় আপনা আপনিই উত্তেজিত হইয়া, হীরালাল কহিলেন,—"মৈত্র মহাশয় যাহা বলিতেছেন; তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য; মানুষের জন্মগত জ্ঞান—কে অস্বীকার করিতে পারে?"

বেণীভূষণ পুনরপি কহিতে লাগিলেন,—"এই যে ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ হয়, শূদ্রের পুত্রই শূদ্র হয়,—ইহারই বা কারণ কি? যাহা হউক বাবা, সৌজন্য-বশতঃ যাহাই বল না কেন, আমার দলিলখানা একবার দেখিয়া দেও।"

এই বলিয়া বেণীভূষণ দলিলখানা রামকান্তের হস্তে অর্পণ করিলেন। অগত্যা কি করেন?—রামকান্ত দলিলখানি পড়িয়া দেখিলেন।

দলিলখানিতে একটী চৌহদ্দীর ভুল ছিল। হয় তো ইচ্ছা করিয়াই বেণীভূষণ সে ভুলটী রাখিয়াছিলেন। দলিলখানি দেখিবামাত্র, সেই ভুলটির প্রতি রামকান্তের দৃষ্টি পড়িল। তিনি বলিলেন,—

"দলিলখানিতে আর কোনই গোল দেখিতেছি না বটে; কিন্তু চৌহদ্দীতে একটা ছাড় হইয়াছে মনে হইতেছে।"

বেণীভূষণ শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বাবা! কি বাবা! কি ভুল হইয়াছে?"

রামকান্ত।—"ভুল তেমন নয়; বোধ হয়, নকল করিতে ছাড় হইয়াছে। যে জমিটা আপনি প্রজাবিলি করিবেন, তাহার পূর্ব্ব-পশ্চিম ও উত্তর দিকের সীমানা লেখা হইয়াছে; কিন্তু দক্ষিণ দিকের সীমানায় কাহার জমি আছে, তাহা লিখিত হয় নাই। সেটা নকল করিতে ছাড় হইয়াছে?"

"দেখি বাবা। দেখি বাবা! কি সর্ব্বনাশই হইয়াছিল তবে!" এই বলিয়া বেণীভূষণ দলিলখানি দেখিতে লাগিলেন। উল্‌টাইয়া পাল্টাইয়া, তিন চারিবার করিয়া, চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। পরিশেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—তাই তো বাবা! কি সর্ব্বনাশই হয়েছিল এখনই! আমি ভাগ্যিস্ এসেছিলাম—তোমার কাছে। নহিলে, দয়ারাম রায়কে পর্য্যন্ত এ দলিল দেখান হয়েছিল। তোমার কাছে আস্‌তে হবে ব'লে তো মনেই হয় নি। তোমার মামী যেই মনে করিয়ে দিলেন, তিনি যেই বল্লেন,—চিরন্তন প্রথা রহিত করো না; ভাগনে বিশেষ বুদ্ধিমান্ তাঁকে একবার দেখিয়ে নিয়ো;—তাই তো! তুমি যে আজ আমার কি উপকার করিলে, তার আর কি বল্‌বো তোমায়?"

সুবিধা বুঝিয়া হীরালাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মৈত্র মহাশয়! দয়ারাম রায় পর্য্যন্ত এ দলিল দেখেছিলেন?"

বেণীভূষণ।—"দেখা কি বাবা! তিন তিন দিন তাঁকে দেখিয়েছি! এই দেখ না কেন, দলিলের মাথায় সাটে তাঁর সই পর্য্যন্ত আছে! তাঁকে না দেখিয়ে আমরা কি কোন কাজ করি?"

এই বলিয়া বেণীভূষণ দলিলের শিরোদেশের একটা হিজিবিজি স্বাক্ষর তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। স্বাক্ষরটা—দয়ারামের স্বাক্ষরেরই মত। রাজবাড়ীর যে সকল খসড়া দলিল তিনি দেখিয়া মঞ্জুর করিয়া দেন, তাহাতে ঐরূপ স্বাক্ষর থাকে।

সেই স্বাক্ষর দেখিয়া, "সত্যিই তো—সত্যিই তো" বলিয়া হীরালাল যেন চমকিয়া উঠিলেন।

বেণীভূষণ উদ্বেগের ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—তাই তো আমি আবার এ কি করিয়া বসিলাম! তাঁহার নাম প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম! যাহা হউক, বাবা হীরালাল, যাহা করিয়াছি করিয়াছি। কথাটা যেন দয়ারাম রায়ের কাণে কখনও না উঠে। কারণ, সত্য বল্‌তে কি বাবা, তাঁকে আমরা যতটা ভয় করি, রাজা রামকান্তকেও আমাদের ততটা ভয় হয় না। তিনিই তো এখন একরূপ রাজা বল্‌লেই হয়। লোকে আর কজন এখন রামকান্ত রায়কে রাজা ব'লে জানে? লোকে তো দয়ারাম রায়কেই রাজা ব'লে ডাকে! তুমিও কি হীরালাল তা জান না?"

"আজ্ঞে, সে কথা আমি মহারাজকে প্রায়ই তো বলে থাকি? কেমন শুন্‌লেন মহারাজ, আমার কথা—সত্য কি মিথ্যা?"

হীরালাল এইরূপ উত্তর দিলেন।

বেণীভূষণ তাহাতে কহিলেন,—"তা যাই হউক বাবা, এ সব কথা যেন আর প্রকাশ না হয়। কি হতে কি হবে, শেষে, গরীব বেচারা আমরা দয়ারামের কোপে পড়ে যেন মারা না যাই।"

ইহার পর বেণীভূষণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায় গ্রহণ-কালে উপসংহারে তিনি রামকান্তকে বলিয়া গেলেন,—"বাবা! তুমি আজ যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিলে, তাহার আর তুলনা নাই। আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলিতেছি, কি দয়ারাম রায়, কি আমরা কেহই তোমার

বুদ্ধির নখাগ্রে লাগিতে পারি না। এ নাটোর-রাজ্যের তুমিই উপযুক্ত কর্ণধার!"

বেণীভূষণ বিদায় গ্রহণ-করিলে, হীরালাল আর একবার সেই সকল কথার প্রতিধ্বনি করিলেন। বুঝাইলেন,—রামকান্ত একাই এখন রাজ্যশাসনে সমর্থ। বুঝাইলেন,—দয়ারাম রায় তাঁহাকে নামে-মাত্র রাজা রাখিয়া নিজেই রাজা হইয়া আছেন। বুঝাইলেন,—বার্দ্ধক্য-হেতু দয়ারাম অকর্ম্মণ্য হইয়াছেন। বুঝাইলেন,—তিনি কেবল এখন আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্যই চেষ্টা করিতেছেন। আর বুঝাইলেন—রামকান্তের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় নাই।

যতই যিনি বুদ্ধিজীবী হউন, আত্মপ্রশংসার মোহে সকলকেই মুহ্যমান হইতে হয়। যতই যাঁহার প্রাণে জ্ঞান-বহ্নি উদ্দীপিত হউক, প্রশংসার স্নিগ্ধবারি প্রক্ষেপে সকলই শীতল হইয়া যায়। যুবক রামকান্ত কোন্ কাটা-কাট।

রামকান্তের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। হীরালাল বিদায় গ্রহণ করিলে তিনি একান্তে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"মৈত্র মহাশয় যাহা বলিয়া গেলেন, তাহা তো মিথ্যা নহে। হীরালাল যাহা বলিল, তাহাও মিথ্যা নহে। সত্যসত্যই দয়ারাম আমাকে কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া আপন কার্য্যসিদ্ধি করিতেছে। আমার পৈতৃক রাজ্য;—সে কিনা অর্দ্ধেক দেবীপ্রসাদকে দিতে বলে? আমি রাজা অথচ, কোন বিষয়ে সে আমার পরামর্শ গ্রহণ করে না; আমি আছি কি না আছি, প্রজাবর্গ সত্যই তো তাহা অবগত নহে? দয়ারামই এখন রাজা; লোকে দয়ারামকে রাজা বলিয়া জানে। আমি এতই বিড়ম্বিত! আমার কি সত্য সত্যই কোন সামর্থ্য নাই? রাজকার্য্য পরিচালনায় সত্য সত্যই কি আমি অক্ষম অপটু? দয়ারাম এমন কি কার্য্য করে—যাহা আমি করিতে পারি না! সে এমন

কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়—যে বুদ্ধি আমার নাই? অথচ, এখন আমার সম্পূর্ণরূপ দয়ারামের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। নিজের বিষয়—নিজের সব, অথচ, আমি পরের মুখাপেক্ষী! এ জীবন কি এই ভাবেই অতিবাহিত করিতে হইবে? ইহার অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? এ বন্ধনের অপেক্ষা আমার মরণই শ্রেয়ঃ। এ বন্ধন হইতে আমি কি মুক্ত হইতে পারিব না?"

রামকান্ত আপনা-আপনি বলিলেন,—"চেষ্টা করিয়া দেখি, হয় বন্ধন মোচন, না হয় জীবন-পতন।"

এই বলিয়া রামকান্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"যাহা আছে অদৃষ্টে, তাহাই ঘটিবে, কিন্তু দয়ারামের প্রাধান্য আমি কখনই মান্য করিব না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্দর্শনে।

এই সময়ে কস্তুরী দেবীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া, কয়েক দিনের জন্য ভবানী পিত্রালয় গমন করিয়াছিলেন। লোকমুখে অতিরঞ্জিত হইয়া, সেখানে রামকান্তের চরিত্র-বিকৃতির সংবাদ উপস্থিত হইল। আত্মারাম শুনিলেন; কস্তুরী দেবী শুনিলেন; ভবানীর কাণেও সেই সংবাদ উপস্থিত হইতে বাকী রহিল না

মুর্শিদাবাদ যাইবার পূর্ব্বে ভবানীকে শীঘ্র পাঠাইবার জন্য দয়ারাম রায়, আত্মারাম চৌধুরীকে পত্র দিয়া গিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে কস্তুরী দেবীর শরীরও সুস্থ হওয়া আসিয়াছিল। সুতরাং আর কাল বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নহে মনে করিয়া চৌধুরী মহাশয় ভবানীকে নাটোরে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়াও ভবানী স্বামীর সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে পাইলেন। ক্ষোভে, অভিমানে, প্রাণ অবসন্ন হইয়া আসিল। কিন্তু তথাপি মনে করিলেন,—"একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে হয়। আমার কখনই বিশ্বাস হয় না,—তিনি এমন হইবেন।"

সন্ধ্যা হইল। রাত্রি আসিল। সকলে আপন আপন কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতে গেল। ভবানীও ধীরে ধীরে স্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল,—হয় তো কক্ষ শূন্য দেখিবেন। লোকমুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হইয়াছিল ;—বুঝি বা সে দিন স্বামি-সন্দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না।

"মা ভবানী কি এমন করিবেন! কখনই না!"

সেই আশায়ই বুক বাঁধিয়া, ভবানী ধীরে ধীরে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। দেখিলেন,—পালঙ্কোপরি স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন। বাতায়ন-পথ-প্রবিষ্ট শুভ্র জোৎস্নারাশি তাঁহার মুখের উপর পতিত হইয়া, তাঁহার সুন্দর মুখ আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

কিশোরীর স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে সে সৌন্দর্য্য যেন আরও ফুটিয়া উঠিল। ভবানী অনিমিষ-নয়নে যতই স্বামীর মুখপানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, সৌন্দর্য্যের অনন্ত চাকচিক্যে ততই যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন! তেমন রূপ জগতে আর নাই—তেমন সৌন্দর্য্য জগতে কোথাও দৃষ্ট হয় না,—বিমুগ্ধার ন্যায় এক-মনে ভবানী সেই রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন।

কিশোরী—বিহ্বলার ন্যায় ব্যাকুলপ্রাণা ; কিশোরী—মন্ত্রমুগ্ধার

ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য; কিশোরী চিত্রপুত্তলীর ন্যায় দণ্ডায়মানা। তিনি একবার ভাবিতেছেন,—"কি সুন্দর রূপ! কি সরলতা-মাখা মুখখানি!" আবার ভাবিতেছেন,—"এ কি আমার নয়! এই সারল্যের ছবি—এই মনোমোহন দেবমূর্ত্তি,—এঁরা কখনও বঞ্চনা করিতে জানে?" কিশোরীর অন্তরই আবার উত্তর দিতেছে,—"না—না, কখনও নয়। ভুল শুনিয়াছি। যাহারা বলিয়াছে, তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে! এ দেবমূর্ত্তি কখনও কলুষিত হইতে পারে না।"

ভবানী ক্ষণেক জ্যোৎস্নাপুলকিত চারুচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, যুক্তকরে করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"নিশামণি! নৈশ-জগতের প্রত্যক্ষীভূত দেবতা তুমি; তুমি অন্তর্যামী;—অভাগিনীর অন্তরের বেদনা সকলই তুমি বুঝিতে পারিতেছ। তোমার সরল প্রাণে তুমি একবার সত্য করিয়া বল দেখি,—আমি ভুল শুনিয়াছি! তোমার আশ্বাসে, আমার পুনর্জ্জীবন লাভ হইবে।" ভবানী ক্ষণেক নৈশ সমীরণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন;—"পবনদেব! তুমি এ বিশ্বের প্রাণাধার! তুমি এ অভাগিনীর প্রাণদান কর! তোমার মৃদুমন্দ নিস্বন একবার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হউক,—"ভয় নাই! তোমার স্বামী তোমারই!"

"আমারই"!—মনে করিতে, কিশোরীর হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল!

তাঁহার চক্ষে তখন জগতের সকল পদার্থই সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইল! সুন্দর জ্যোৎস্না! সুন্দর আকাশ!—সকলই সুন্দর দেখিলেন। বকুলবন-পরিবৃত উদ্যানেরই বা কি অপূর্ব্ব শোভা! বেলা, মল্লিকা, মালতী, যুথী, শেফালিকা, সূর্য্যমুখী, গোলাপ, গন্ধরাজ,—উদ্যানের সকল পুষ্পই তাঁহার চক্ষে আজি যেন প্রস্ফুটিত! চারিদিকই শোভায় ঢল ঢল! আবার সকল শোভার শ্রেষ্ঠ শোভা,

কল সৌন্দর্য্যের সারভূত সৌন্দর্য্য—ভবানী দেখিতেছেন—স্বামীর মুখমণ্ডলে; দেখিতেছেন, আর আবেগভরে বলিতেছেন,—"আমার—আমার স্বামী আমারই।"

"আমার! আমার বৈ ইনি কখনই অন্যের হইতে পারিবেন না। প্রেমভক্তির প্রণিপাত-পূজায় আমার স্বামীকে আমি কখনই অন্যের হইতে দিব না।"

এই সঙ্কল্প করিয়া, আনন্দ-বিহ্বল-চিত্তে পতির চরণপ্রান্তে চাহিয়া, ভবানী কখনও বা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন,—"আজীবন বক্ষে ধরিয়া রাখিব, ঐ কমল চরণ কখনও বক্ষ হইতে অপসৃত হইতে দিব না।" কখনও বা, আপনার মৃণালবাহু লক্ষ্য করিয়া, সঙ্কল্প করিতেছেন,—"আমার করযুগল, আজীবন যদি পতিসেবায় নিয়োজিত রাখিতে পারি, তবেই তোমাদের সার্থকতা জ্ঞান করিব।" পরক্ষণেই আবার, পতির দেব-মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, মনে মনে বলিতেছেন,—"আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, আমার দেহ মন সর্ব্বস্ব তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি! আমার পূজা গ্রহণ কর!" এই বলিতে বলিতে পতির চরণযুগল এক একবার বক্ষে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুলা হইলেও, পরিশেষে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায়, নিরস্ত হইতেছেন।

সহসা একবার ভবানীর করকমল-স্পর্শে রামকান্তের নিদ্রাপসারণ হইল। তিনি ব্যস্তসমস্তে উঠিয়া, সাদর-সম্ভাষে কহিলেন—"ভবানী! ভবানী! এতক্ষণ আমায় ডাক'নি কেন?" এই বলিয়া পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া বাহুপাশে ভবানীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন।

ভবানীর প্রাণভরা কথা। ভবানী, একবার দেখা পাইলে, কত কথা—কত বেদনা—জানাইবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাহার এক কথাও কহিতে পারিলেন না। স্বামীর আদরে আদ-

রিণী কিশোরী, তাঁহার দেহোপরি এলাইয়া পড়িলেন,—যেন দৃঢ়-তমাল-শাখে লতিকা আশ্রয় লইল। ক্ষণকালের জন্য চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল। মুখে বাক্য নাই, চক্ষু পলকহীন; হৃদয় স্পন্দনরহিত। নীরব নিশীথে নীরব প্রকোষ্ঠে, নীরব ভাষায়, নীরব প্রণয়ীর নীরব মনোভাব, নীরবে প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিল।

ক্ষণপরে, রামকান্ত, ভবানীর চম্পক-বিনিন্দী অঙ্গুলি, আপন করপুটে ধারণ করিয়া, সাদর-সম্ভাষে কহিলেন,—"আমি কয় দিন কেবল তোমারই কথা ভাবিতেছিলাম। তুমি আসিয়াছ, আজ যে আমার কি আনন্দ, কি বলিব ?"

ভবানী মনে মনে কহিলেন,—"যাহা শুনিয়াছি, তবে কি সে সবই মিথ্যা !"

ভবানীকে নীরব দেখিয়া, রামকান্ত পুনরপি কহিলেন,—"আমি তোমায় কত ভালবাসি, কি বলিব? তুমি ছিলে না, যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিয়াছিলাম।"

ভবানী উত্তর দিলেন,—"যদি এত অনুগ্রহ, তবে সময় সময় বিস্মৃত হন কেন ?"

রামকান্ত কহিলেন,—"সে কেমন কথা। তোমায় কি আমি কখন ভুলিতে পারি ? আমার অন্তরে তুমি অহর্নিশ জাগরূক আছ। জীবনে মরণে সকল সময়েই তুমি আমার সহধর্ম্মিণী !"

ভবানী নতমুখে ধীরে ধীরে কহিলেন,—সেই বিশ্বাসই আমার বিশ্বাস—সেই সাহসই আমার সাহস। আপনার মুখের একটা কথা শুনিলে, আমার সকল ভাবনা— সকল দুশ্চিন্তা দূর হয়।

ভবানীর ভাবনার কথা—দুশ্চিন্তার বিষয় বুঝিতে পারিয়াও, রামকান্ত মৃদুহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের ভাবনা—কিসের দুশ্চিন্তা ভবানী ?"

ভবানী সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। সে কথা প্রকাশ করিতে, তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি অবনত-মুখে, একদৃষ্টে স্বামীর পদপ্রান্তে চাহিয়া রহিলেন।

ভবানীকে নিরুত্তর দেখিয়া, রামকান্ত ভবানীর চিবুক স্পর্শে কহিলেন,—"মিথ্যা দুশ্চিন্তায় মনকে কেন ব্যথিত কর, তোমার স্বামী—তোমার ছাড়া আর কাহারও নয়।"

ভবানী আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার চিন্তাবায়ু-বিচলিত হৃদয়সমুদ্র ক্ষণকালের জন্য যেন প্রশান্তভাব ধারণ করিল। তিনি আনন্দ-গদগদ স্বরে কহিলেন,—"আমি সকলই বুঝি। কিন্তু মন কেন প্রবোধ মানে না?" ভবানী মনে মনে কহিলেন,—"প্রাণেশ্বর! তুমি আর একবার আশ্বাস দাও, আর একবার আমায় বল—'ভবানী। আমি তোমা ছাড়া কাহারও নহি।' নহিলে, মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না।"

রামকান্ত।—"তোমার কোনও ভাবনা নাই। তুমি মনকে প্রবোধ দাও। তুমি যাহা শুনিয়াছ, সমস্তই মিথ্যা; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি,—এ হৃদয়ে তোমা ভিন্ন অন্য কাহারও স্থান নাই।"

ভবানীর চক্ষু বাহিয়া আনন্দাশ্রু পতিত হইল। ভবানী অশ্রু-সংবরণে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু সে আনন্দের স্রোত—কে রোধ করিতে পারে?

তাঁহার অন্তরের বেদনা অনুভব করিয়া, রামকান্ত বাতায়ন-পরিদৃষ্ট সুবিমল শশধরের প্রতি চাহিয়া ভবানীর হস্তধারণে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"ভবানী, তোমার সকল ভাবনা দূর কর। এই কৌমুদী-স্নাত রজনীতে—এই জ্যোৎস্না-পুলকিত পৃথিবীতে—এই নীরব নির্জন নিশীথে, চন্দ্রদেবকে সাক্ষী করিয়া তোমার সমক্ষে শপথ

করিতেছি,—ভবানী! এ হৃদয়ে তোমা ভিন্ন আর কাহারও স্থান হইবে না।—তোমায় কখনও ভুলিব না।"

চারিচক্ষে মিলন হইল। উভয়েই, পুলকিত-হৃদয়ে, পলকহীন-নেত্রে পরস্পরের প্রতি চাহিতে চাহিতে, সুখস্বপ্নে বিভোর হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঘাটে।

মুর্শিদাবাদ-সহরের খাগড়ার ঘাটে গঙ্গাস্নানে আসিয়া, মেয়েরা আজ এত গুজ্ গুজ্ ফুস্ফুস্ করিতেছে কেন? হাগো, তোমরা কেহ বলিতে পার কি?

নীরার পিসী বলিতেছে,—"শুনেছিস্, ছোট-বউ। গঙ্গা-নাওয়া এইবার থেকে বন্ধ হতে চল্লো। কর্ত্তা আজ বাড়ী ছিলেন না; তাই আজ লুকিয়ে এসেছি। নইলে কি আর বাড়ী থেকে বেরুতে পেতাম।"

ছোট-ব থমে সে কথায় কর্ণপাত করিবার অবসর পায় নাই ছোট-বউ তখন মা গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছিল। বলিতেছিল,—"হে মা, গঙ্গা! আমার মতিচাঁদের সুমতি দাও মা! সে যেন পারশালে যেতে আর না কাঁদে।"

ছোট বউ মন দিয়া কথা শুনিতেছে না বুঝিয়া, নীরার পিসী মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া, ছোট-বউয়ের গা টিপিয়া সাড় করাইতে চেষ্টা পাইল। সে টিপুনিতে ছোট বউ 'উঁহু' করিয়া সম্মুখ ফিরিল।

নীরার পিসী আবার আরম্ভ করিল,—"শুনেছিস্ ছোট-বউ,

ছোট-বউ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দিদি! কি হয়েছে গা?"

নীরীর পিসী একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"আ মর! পাড়া টি টি হ'য়ে গেল; তুই এখনও শুনলিনে?"

ছোট-বউ।—"কি হ'য়েছে দিদি! ব্যাপারখানা কি?"

পার্শ্বে আর যাহারা স্নান করিতেছিল, তাহারাও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। ননদিনী বউকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কি হয়েছে গা বউ?" বউ ননদিনীকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কি হয়েছে গা ঠাকুরঝি?" কেহ বুঝিলেন,—বুঝি বা গামছা হারাইয়াছে। কেহ বুঝিলেন,—বুঝি বা কাহারও কলসী ভাসিয়া গিয়াছে। কেহ বুঝিলেন,—হাঙ্গর আসিয়াছে, তাই তিনি ছুটিয়া ডাঙ্গায় গিয়া উঠিলেন; অনেকক্ষণ তাঁহার আর গঙ্গাস্নানই হইল না।

সকলের এইরূপ চাঞ্চল্য দেখিয়া, নিস্তারিণী দাসী, নীরীর পিসীর গা ঘেঁসিয়া গিয়া, কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে গা পিসী! আমায় চুপি চুপি না হয় বল না!"

নীরীর পিসী।—"আর নিস্তার! কি বলব মা! শুনলে পেটের ভেতোর হাত পা সেঁদোয়!"

নিস্তারিণী অধিক আর কিছু না শুনিয়াই, আপনা-আপনিই বলিতে লাগিল,—"তাই তো পিসী! তবে কি হবে! আমরা তবে আর কোথায় নাইতে যাবো, পিসী! মা গঙ্গা কি আমাদের একেবারে পায়ে ঠেললেন?"

নীরীর পিসী।—"আর কি হবে মা। হওয়ার কি আর কিছু বাকী আছে?"

এই বলিয়া, নীরীর পিসী ও নিস্তারিণী উভয়েই হা-হুতাশ করিতে লাগিল। ছোট-বউ কথাটা শুনিবার জন্য এখন বার বার আগ্রহ

প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু উত্তর আর কিছুই মিলিল না! কাজেই ছোট বউ আর হরসুন্দরী, দুই জনে স্নান করিয়া, বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তাহারা পাড়ের উপর একটু মাত্র অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় অদূরে রামমণি ঠাকুরাণীকে দেখিতে পাইল। রামমণিকে দেখিয়াই তাহারা পাশ কাটাইয়া অন্য পথে যাইবার চেষ্টা করিল। তাহাদের কথা-বার্ত্তাও বন্ধ হইল।

রামমণি ঠাকুরাণী কলসী-কক্ষে ঘাটের পথে আসিতেছিলেন, ছোট-বউ ও হরসুন্দরীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, রাগের ভরে রামমণি আপনা-আপনিই বকিতে লাগিলেন,—"একবার দেমাকটা দেখলে! ঠাকরুণদের যেন মাটিতে পা পড়ে না! চোখের মাথা খাও, চোখের মাথা খাও! মানুষ দেখতে পাও না! আমি তোদের ঠাকরুণ-দিদির বয়সী—আমার সঙ্গে কথা কওয়া হ'ল না!"

এই সময়ে, একটা কাক, রামমণির মাথার উপর, বট-গাছের ডালে বসিয়া 'কা'—করিয়া ডাকিয়া উঠিল। কাকের ডাকে, রামমণির চিত্ত আরও একটু চঞ্চল হইল। রামমণি, মন্দ-বচনে, কাকের চতুর্দ্দশ পুরুষের পিণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"পোড়ার মুখো! কোথাও আর জায়গা পাও না; আমারই মাথার উপর —'কা'! বাপের মাথা খা! চুলোয় যা—গোল্লায় যা।" রামমণি আঙুল মটকাইয়া কাকের পিতৃ-পিতামহের উদ্দেশে কটূক্তি করিতে করিতে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এমন সময় বটগাছের একটা পাতা, বাতাসে বৃক্ষচ্যুত হইয়া, রামমণির মস্তকোপরি পতিত হইল। একে মাথার উপরে কাকের ডাক, তাহার উপর বটগাছের পাতা মাথায় পড়া,—এতটা অলক্ষণ! রামমণি, অধীরা হইয়া শ্যামার মাকে সম্মুখে পাইয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ-লা,

আমার মা! তোরা বুড়ো-বুড়ী সব থাক্‌তে—আমার এখন যাবার সময় হয়েছে? তাই আমার মাথার উপর কাকের ডাক, আর বটের পাতা-পড়া। এত লোক যাচ্ছে, তাদের মাথায় পড়ে না—আর আমারি মাথায়। কেন—আমি কার পাকা ধানে মই দিয়েছি— কার বুকে উনুন জেলেছি?"

শ্যামের মা, গঙ্গাস্নান করিয়া, হরি-নামের মালা জপ করিতে করিতে বাড়ী যাইতেছিল। জপ বন্ধ করিয়া সে আর কি উত্তর দিবে? বিশেষতঃ রামমণি-ঠাকুরাণীর সহিত কথা কহিলে তো আর অব্যাহতি নাই। কাজেই সে শুনিয়াও যেন শুনিতে পাইল না।—এমনই ভাবে চলিয়া গেল।

রামমণি এবার তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগের মুখে তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি মনে মনেই শ্যামের মার ও শ্যামের চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডদান করিতে করিতে গঙ্গায় আসিয়া অবতরণ করিলেন।

কিন্তু জলে নামিতে গিয়াও বিপত্তি বাধিল। জলে কলসী ডুবাইতে কলসী-বিক্ষিপ্ত জলবুদ্‌বুদ তাঁহার মুখে-চোখে ছিটাইয়া লাগিল! এ দিকে আবার কলসী-মুখ প্রবেশপ্রয়াসী বায়ু-বিতাড়িত জলের কলকল-খলখল শব্দে জল যেন তাঁহার সহিত বিদ্রূপ করিতেছে,—রামমণির সেইরূপ মনে হইল। রামমণি জলরাশির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, বলিয়া উঠিলেন,—"মর, মর! আমার সঙ্গে ঠাট্টা! আমার কি আর সে বয়স আছে যে, আমার সঙ্গে রঙ্গ করতে এসেছ? রঙ্গ কর্‌তে হয় তো ছুঁড়িদের সঙ্গে রঙ্গ কর্‌তে পার না।" এইরূপে তর-বেতর-রূপে রামমণি জলের সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

রামমণির এই ভাব-বিপর্য্যয় দেখিয়া, নীরীর পিসী আগবাড়া হইয়া গিয়া বলিল,—"কি হয়েছে গা দিদি?"

সহানুভূতিতে গদ্‌গদ হইয়া, রামমণি-ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আর বাছা ভাগ্যিস্ তুই ছিলি! এই সব আঁটকুড়ির বেটিরা আছে; ম'রে গেলেও কেউ খোঁজ নেয় না! অথচ, আমি সব্বাইয়ের জন্যে ম'রে আছি। নইলে, আমার আর কি? একটা মানুষ; যা ছিল সুখে স্বচ্ছন্দেই চ'লে যেত।"

নীরীর পিসী।—"তা তো বটেই—তা তো বটেই। তোমার কি ভাবনা দিদি? পাঁচ জনকে নিয়েই তো তুমি ফকির!"

রামমণি আহ্লাদে আটখানা হইয়া কহিলেন,—"বল্ তো তুই, ভাল-মানষের মেয়ে। বল্ তো তুই একবার—শতেক-খোয়ারিদের ডেকে।"

নীরীব পিসী। —"আমি তো লুকিয়ে কোনও কথা বলি-নে, দিদি! আমি ডাক-হাঁকেই ব'লে থাকি; তা দিদি, একটা কথা শুনে-ছিস্ কি?"

রামমণি।—"কি কথা বোন!"

নীরীর পিসী।—"দিদি, তুই শুনিস্-নি, এখনও।"

রামমণি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি—লা বি দিদি?"

· নীরীর পিসী। —"এ সব বড় ঘরের কথা! আমরা তো আর তা হ'লে নেই দিদি!"

বড় ঘরের কথা! এইবার আবার সকলেই নীরীর পিসীর কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইল। নীরীর পিসী প্রথমে রামমণির কানে কানে, তারপর আস্তে আস্তে, তারপর প্রত্যেককে ডাকিয়া, তার পর চীৎকার করিয়া, পরিশেষে রাস্তায় যাইতে যাইতে, রাস্তার উভয় পার্শ্বের সকলকেই এবং যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই, বলিতে আরম্ভ করিল,—শুনেছ কি ব্যাপারখানা! [illegible]

বেটার বউকে নবাব নাকি ধ'রে নিয়ে গিয়েছে! বড় ঘরেই যখন এই কাণ্ড; আমাদের উপায় কি হবে? গঙ্গা-স্নান পর্য্যন্ত এইবার বন্ধ হ'তে চ'ল্‌লো!"

নীরীর পিসী প্রাতঃস্নানে আসিয়াছিল। কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় পথে ঘাটে, যাকে তাকে কথাটা বলিতে বলিতে, বাড়ী ফিরিতে তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। অথচ, গঙ্গার ঘাট হইতে তাহার বাড়ী দেখা যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

যেদিন গঙ্গার ঘাটে মেয়ে মহলে আন্দোলন হয়, তাহার কয়েক-দিন পরেই জগৎশেঠের ভবনে বাঙ্গালার জমিদারগণের মন্ত্রণা-সভা আহুত হইল। সভায় বাঙ্গালার অধিকাংশ জমিদারই উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমেই রায়-রায়াণ আলমচাঁদ কহিলেন,—"এত বড় স্পর্দ্ধা! কুলের কুলবধূর প্রতি অত্যাচার!"

আলমচাঁদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া আসিল। তিনি উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"ইহার প্রতিশোধ—লওয়াই চাই! আপনারা কে কে সহায় হইবেন বলুন! হিন্দু সব সহিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার কখনই সহিতে পারিবে না।"

হাজি আহম্মদ বলিলেন,—"হিন্দু বলিয়া বলিতেছেন কেন? আমরা মুসলমান; আমরাও এ অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না।

হিন্দু মুসলমান কেন? রক্ত-মাংসের শরীর ধারণ করিয়া কোনও জাতিই এ অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না।”

শেঠ স্বরূপচাঁদ কহিলেন,—“ফতেচাঁদ জগৎ শেঠ আমাদের পূজনীয় ব্যক্তি। তিনি ভারতবর্ষের কুবের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার নিকট কে না কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ আছে? তাঁহার উপর যখন এই অত্যাচার হইয়াছে, আমাদের আর কাহারও ধর্ম্মরক্ষার ভরসা আছে কি? এত বড় জগৎ শেঠ যখন এইরূপ ভাবে অপমানিত, তখন অন্য প্রজার অবস্থা কি শোচনীয়,—সহজেই বিবেচনা করিয়া দেখুন!”

রায়-রায়াণ আলমচাঁদ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—“আর বিবেচনা করিবার সময় নাই!” যত সত্বর সেই মুসলমান-কুলকলঙ্ক নরপিশাচ সরফরাজকে বাঙ্গালার মসনদ হইতে অপসারিত করিতে পারি,—আজ তজ্জন্য আমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে।’ ঐ সম্মুখে কলনাদিনী গঙ্গা, ঐ সম্মুখে দেবমন্দিরের উচ্চচূড়া গগনস্পর্শ করিয়া আছে; এই ধর্ম্মগ্রন্থ রহিয়াছে; আর এই আপনাদের হৃদয়ে হৃদয়ে ইষ্টদেবতা বিরাজ করিতেছেন;—আপনারা সত্য সাক্ষ্য করিয়া শপথ করুন,—সরফরাজ খাঁকে অবিলম্বে সিংহাসনচ্যুত করিতে হইবেই হইবে।”

রায়-রায়াণ আলমচাঁদ যেন আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে কহিলেন,—“হিন্দুর দেশে, হিন্দু-রমণীর প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে ও হইতেছে—সে অত্যাচার অসহনীয়। আমি লক্ষবার তাহা স্বীকার করি। সরফরাজ খাঁ—সুজা উদ্দীনের নাম কলঙ্কিত করিয়াছে,—তাহাও আমি কদাচ অস্বীকার করি না। রায়-রায়াণ যাহা বলিতেছেন,—সে বিষয়েও আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তবে একটী কথা—”

মহারাজের কথায় বাধা দিয়া, দেওয়ান হাজি আহম্মদ কহিলেন, —"মহারাজ! আর কোনও কথা নাই! আমি মুসলমান; আমি পর্য্যন্ত এ অত্যাচারে ব্যথিত, আমি পর্য্যন্ত কোনও সর্ত্ত রাখিতে প্রস্তুত নহি। আপনি কেন অন্য কথার অবতারণা করিতে চান! এ অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে 'কিন্তু' কিংবা 'যদি' থাকিলে চলিবে না। রায়-রায়াণ যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ ভাবেই আজ আমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। আমি খোদার নামে আল্লার নামে কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি,—এ অত্যাচার দমনের জন্য আপনারা আমায় যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। আজ হইতে আমার পণ—হয়, সরফরাজকে বাঙ্গালার সিংহাসন হইতে অপসারিত করিব, নয়, এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। আপনারাও কি সেরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবেন না?"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।—"দেওয়ান সাহেব! আপনার কথা আমি সমস্তই স্বীকার করি। আপনার ন্যায় আমরাও ব্যথিত ও মর্ম্মাহত; তবে কি কৌশলে, কেমন করিয়া, পাপিষ্ঠকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারা যায়, আমি সেই পরামর্শ করিতে বলিতেছি। আপনি মুসলমান হইয়াও হিন্দুপ্রজার মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য উত্তেজিত হইয়াছেন। আমরা হিন্দু হইয়া, হিন্দুর জন্য চেষ্টা করিতে পারিব না কি?"

নাটোর রাজধানী হইতে দয়ারাম রায় আসিয়া এই মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রায়-রায়াণ আলমচাঁদ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"আপনি চুপ করিয়া রহিলেন যে? আপনি বহুদর্শী; আপনার কি মত?"

দয়ারাম রায় গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"আপনাদের মতে কি আমার অমত হইতে পারে? আপনারা যাহা করিবেন, নাটোর কখনই তদ্বিষয়ে অসম্মত নহেন। তবে একটী কথা আমার বলিবার

আছে। যে দিক দিয়াই যাই, বিদ্রোহের অশান্তি আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। ফলে, প্রজার রক্তশোষণ অনিবার্য্য।"

দয়ারামের বাক্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন,—"আমিও ত তাহাই বলিতেছিলাম। বাঙ্গালার মসনদে এখন যিনিই বসিবেন, হিন্দুর পক্ষে সবই সমান। হিন্দুর প্রতি সহানুভূতি—মুসলমানের নিকট আমি কখনই আশা করি না। সরফরাজ যাইবেন ; হয়তো তাঁহার পরিবর্তে ফতে খাঁ আসিয়া বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করিবেন। কিন্তু ফতে খাঁ যে আবার সরফরাজ হইয়া না দাঁড়াইবেন, কে বলিতে পারে ?"

দেওয়ান হাজি আহম্মদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি তীব্র কটাক্ষে চাহিলেন। দয়ারাম রায়, তাহা বুঝিতে পারিয়া, মহারাজের কথার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ যাহা বলিতেছেন, তাহার সকল কথার অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। মুসলমানের মধ্যেও বহু সজ্জন সাধু আছেন। এক সরফরাজ খাঁর চরিত্র দেখিয়া সকলের চরিত্র বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। মুসলমানের মধ্যে আকবরও ছিলেন, আওরঙ্গজেবও ছিলেন। সুজাউদ্দীনও ছিলেন, আবার সরফরাজ খাঁও আছেন। দৃষ্টান্ত কি আর দেখাইব ? কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকলের মধ্যেই ভালমন্দ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে হাজি সাহেব আমাদের পরামর্শসভায় মিলিত হইয়াছেন ; কোন হিন্দুর অপেক্ষা ইঁহার প্রাণ অনুদার বলিতে পারি ?"

ফতেচাঁদ জগৎ শেঠ নীরবে একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। দয়ারামের উক্তিতে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন,—"রায় মহাশয়ের বাক্য, আমিও অনুমোদন করি। আমি অনেক হিন্দু ও অনেক মুসলমানের সহিত এ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, ভালমন্দ দুই

দিকই আমি দেখিয়াছি। আমারও সেই ধারণা—হিন্দুর মধ্যেও যেমন সজ্জন আছেন, মুসলমানের মধ্যেও তদ্রূপ সজ্জন ব্যক্তির অভাব নাই।"

এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর বাদানুবাদে রায়-রায়াণ আলমচাঁদ কিছু বিরক্ত হইতেছিলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"ভালমন্দের বিচার করিবার সময় এখন আর নাই। এখন বিচার্য্য—সরফরাজ খাঁকে কিরূপে সিংহাসনচ্যুত করা যায়। অধিক কথা না কহিয়া, আপনারা তাহারই মীমাংসা করুন।"

"আমিও তাই বলি। যে নরপিশাচ সতীর সতীত্বনাশে উদ্যোগী হয়, একদণ্ড তাহার আর সিংহাসনে স্থান নাই, তাহাকে কোনক্রমেই আর বাঙ্গালার মসনদে বসিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।" হাজি আহম্মদ এইরূপে রায় রায়াণের কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন।

"কিন্তু কি প্রকারে কার্য্যোদ্ধারের সম্ভাবনা। বাঙ্গালার জমিদার-গণ, একত্র হইলে, নবাবকে অবশ্যই সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন—এখনও তাঁহাদের সে ক্ষমতা আছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হইবে কি প্রকারে? বিদ্রোহী জমিদারগণ আজ যদি নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করেন, বিনা রক্তপাতে তাহা যে সুসিদ্ধ হইবে, কখনই সেরূপ আশা করা যায় না। তার পর যদিও আপনাদের বলক্ষয় করিয়া, নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সমর্থ হই, তাহাতেই বা নিস্তার কোথায়? নবাব—বাদশাহের প্রতিনিধি। নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে বাদশাহের বিপুল বাহিনী আসিয়া এখনই বঙ্গদেশ ছারেখারে দিবে। অতএব, কোনও কার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে পরিণাম ফল বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দয়ারাম রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন,

রায় মহাশয়! আপনি এ বিষয়ে কি বলেন? যদি কোনও যুক্তি থাকে, বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি।"

সকলেই দয়ারাম রায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি যাহা উত্তর দিবেন, সেই উত্তরই যুক্তিযুক্ত,—সকলেরই তাহাই বিশ্বাস ছিল, সকলেই তাঁহাকে সদ্যুক্তি অবধারণের জন্য অনুরোধ করিলেন।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া দয়ারাম গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"আমি সকল দিক্ ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমার মনে একটী ভিন্ন অন্য উপায় শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইতেছে না। আপনারা সকলেই জানেন, দিল্লীর বাদশাহ এখনও বাঙ্গালার জমিদারদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। জমিদারদিগের অনুরোধ-উপরোধ আজকাল প্রায়ই বাদশাহের নিকট উপেক্ষিত হয় না।"

দয়ারামের কথায় বাধা দিয়া, শেঠ ফুলচাঁদ বলিলেন,—"আমি এতক্ষণ কোনই কথা কহি নাই; কিন্তু আর সহ্য হইতেছে না। আবার সেই পদ-লেহনে স্পৃহা। সতী রমণীর সতীত্বনাশের অপ-রাধের আবার বিচার আছে কি? সেজন্য আবার বাদশাহের কাছে দরবার করিব কি? আপনারা হুকুম দিন, আমি তিন দিনের মধ্যে সেই নরাপিশাচ নবাব সরফরাজ খাঁর মুণ্ড—"

রায়-রায়াণ আলমচাঁদ, ফুলচাঁদের মুখ চাপিয়া ধরিলেন; বলি-লেন,—"উদ্ধত যুবক! চুপ কর। দয়ারাম রায় কি বলেন, আগে শোন, তারপর, যাহা বলিতে হয়, বলিও।"

ফুলচাঁদ অভিমানে পরামর্শ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কেহই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সাহসী হইলেন না। অগত্যা জগৎ শেঠ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর অনুসরণ করিয়া অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। সেই হইতে ফুলচাঁদ অনেকক্ষণ এক কোণে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন।

পুনরায় দয়ারাম বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বাদশাহের নিকট এখনও বাঙ্গালার জমিদারদিগের সম্মান আছে। জমিদারগণ যদি সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে আবেদন করেন, বাদশাহ তাহা শুনিতে পারেন। অতএব আমার ইচ্ছা,—কোনও উপযুক্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে দিল্লীতে আমাদিগের প্রতিনিধি-রূপে প্রেরণ করা হউক। আর—"

দূত-প্রেরণের প্রস্তাবে প্রায় সকলেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অধিকন্তু দয়ারাম রায় আর কি বলিতে চাহেন, তাহা শুনিতেও উৎসুক হইলেন।

দয়ারাম বলিলেন;—"আমার এক পরামর্শ আছে। যেমন দূত প্রেরণ করিতে হইবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার আয়োজন করিতে হইবে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন,—"সে কি প্রকারে সম্ভবপর ?"

দয়ারাম।—"তারও উপায় আছে। মীর্জ্জা সাহেব এখন দিল্লী গিয়াছেন। হাজী সাহেব যদি আমাদের দূতরূপে দিল্লী গমন করেন, এবং সেখানে গিয়া যদি মীর্জ্জা সাহেবকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইবার সনন্দ লইতে পারেন, সব দিক্ রক্ষা হয়।"

দুলিচাঁদ হতাশ্বাসে চুপ করিয়াছিলেন; এইবার আশান্বিত হওয়ায়, তাঁহার মুখ ফুটিল। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মীর্জ্জা সাহেব আবার কে ? আবার কেন অপরিচিত অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইবার কথা কহিতেছেন ?"

দয়ারাম খোলসা করিয়াই কহিলেন,—"মীর্জ্জা সাহেবকে চেনেন না? মীর্জ্জা মহম্মদ আলি—আমাদের হাজী সাহেবেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা; তিনিই এখন পাটনার শাসনকর্ত্তা; আলিবর্দ্দী খাঁ নামে পরিচিত। যেমন হাজী সাহেব, তেমনি আলিবর্দ্দী; উভয়েই উচ্চমনা; উভয়েই হিন্দুদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার মনে হয়, আলি-

রজীর ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি এখন আর দ্বিতীয় নাই; বিশেষতঃ তাঁহার সৈন্যবল আছে, তিনি বীর, তিনি সাহসী। আমাদিগের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, তাঁহার দ্বারাই সেই কার্য্য সুসিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। এ সময়ে তিনি দিল্লীতে আছেন, তাহাতে আমাদের কার্য্যোদ্ধারের পথ প্রশস্ত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি। কেমন এ বিষয়ে আপনাদের কি মত?"

সকলেই দয়ারামের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। হাজী মহম্মদ দিল্লী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কেহ বুঝিলেন কি—কেন এই ষড়যন্ত্র? নবাব সরফরাজ খাঁর অত্যাচার বাঙ্গালীর অসহ্য হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়লালসায় মোহান্ধ হইয়া সরফরাজ খাঁ যেদিন জগৎশেঠের পুত্রবধূকে ধরিয়া লইয়া যায়, সেদিন হইতেই বাঙ্গালার লোক উত্তেজিত হইয়া উঠে; সে দিন হইতে সরফরাজের পাপের ভরা পূর্ণ হয়। সতীর সতীত্ব-নাশের চেষ্টা—ইহার অধিক গুরুতর অপরাধ আর কি আছে? তাই সরফরাজের দণ্ডের জন্য বাঙ্গালার জমিদারবর্গ জগৎশেঠের ভবনে সমবেত হইয়া, এইরূপ মন্ত্রণা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরিবর্ত্তন।

দয়ারাম রায় মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পর, বেণীভূষণ এখন প্রায়ই গোপনে গোপনে রামকান্তের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করেন। বিষয় কর্ম্ম-সম্পর্কেও উভয়ে সলা-পরামর্শ হয়। রামকান্ত যে বিষয়কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহার যে এখন আর উপরওয়ালা

অভিভাবকের প্রয়োজন নাই,—বেণীভূষণ, অবসর পাইলেই, তাহা বুঝাইয়া দেন। এদিকে, কর্ম্মচারীও কেহ কেহ রামকান্তের সমক্ষে তাঁহার কর্ম্মপটুতার প্রশংসা করেন। কর্ম্মচারিগণের সেরূপ প্রশংসা-বাদের যে বিশেষ কোনও কারণ ছিল না, তাহা নহে। দয়ারামের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কাহারও চুরি-জুয়াচুরির বড় সুবিধা হইত না; দয়া-রামের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সকলকেই কম্পিত থাকিতে হইয়াছিল। সুতরাং দয়ারামের প্রাধান্য যাহাতে লোপ পায়, কর্ম্মচারীদের অনেকেই তজ্জন্য উৎসুক ছিলেন। পরন্তু সে বিষয়ে বেণীভূষণেরও বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল।

যে কারণেই হউক, দয়ারাম মুর্শিদাবাদ রওয়ানা হওয়ার অল্প-দিন পরেই রামকান্ত আপনার বিষয়-কর্ম্ম আপনিই দেখিতে আরম্ভ করিলেন। এই উপলক্ষে দুই এক জন প্রবীণ কর্ম্মচারীরও পদ-চ্যুতি ঘটিল। রামরূপ সরকার বহুদিন হইতে রাজসরকারে কর্ম্ম করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি একদিন দয়ারাম রায়ের কর্ম্ম-পটুতার বিষয় উল্লেখ করিয়া রামকান্তের সমক্ষে তাঁহার প্রশংসা-বাদ করিয়াছিলেন। রামকান্তের তাহা সহ্য হয় না; অধিকন্তু পারি-ষদগণ বুঝাইয়া দেন,—"রামরূপ, দয়ারামের গুপ্তচর।" এই ঘটনায় একদিন পরেই বৃদ্ধ রামরূপকে সদরের চাকরী হইতে বদলী করিয়া যশোহরের জঙ্গল পরগণায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদ যাতায়াতে এবং সেখানে অবস্থিতি হেতু, দয়ারাম প্রায় তিন মাস কাল রাজধানীতে অনুপস্থিত ছিলেন। তাহারই মধ্যে এত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এক দিকে রামকান্ত; রাজ্যের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত ওলট-পালট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অন্য-দিকে সুবিধা পাইয়া দেবীপ্রসাদের পক্ষ আপনার দাবীদাওয়ার ভিত্তি-ভূমির দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছিলেন।

তিন মাস পরে দয়ারাম রায় যখন মুর্শিদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন পাশা বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি নগরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার একজন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গোপনে তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাপন করিল। রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াও তিনি সেই ভাব উপলব্ধি করিলেন। যখনই তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করিতেন, রাজবাটীর সকল কর্ম্মচারীই তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য উপস্থিত থাকিত। কিন্তু আজ তিনি দেখিলেন—সমস্তই বিপরীত। প্রত্যেক তোরণ দ্বারেই দ্বারবানগণ আজিও তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিল বটে, কিন্তু তাহার ভিতরে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ভয়-ভক্তি-ব্যাকুলতা দেখিতে পাইলেন না। সদর-নায়েব মনোহর রায় সেদিন আর দয়ারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই আসিলেন না। বিশেশ্বর গুহ পূর্ব্বে মুহুরীর কাজ করিত, নূতন ব্যবস্থাক্রমে সে খাজাঞ্চির পদ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কতকটা গৌরবের ভাবে সে আসিয়া আপনা হইতেই দয়ারামের সহিত সাক্ষাৎ করিল; বলিয়া গেল,—"মহারাজ আমাকে এখন খাজাঞ্চির পদ দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং এখন রাজকর্ম্ম দেখিতেছেন; সুতরাং আমাদিগকে বড়ই ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। সময়ান্তরে আপনার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিব।" অনুচর যাহা বলিয়াছিল, তাহাতেও দয়ারাম রায় এতদূর বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু এখন ক্রমশঃ তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে সমস্তই অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, রামকান্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে যেমন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেদিনও সেইরূপ সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। সুতরাং সেদিন সেইভাবেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

দয়ারাম রায় ইতিপূর্ব্বে নাটোরের প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে দীঘাপতিয়া গ্রামে আপনার আবাস-ভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

রাত্রিতে এখন প্রায় সেই বাটীতে বসবাস করিতেন। দিবাভাগে নাটোর রাজবাটীর অন্তর্ভুক্ত আপনার কক্ষে বসিয়া কাজকর্ম্ম করিয়া যাইতেন। মুর্শিদাবাদ হইতে আসিয়া এখন রাজধানীর প্রকোষ্ঠেই অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু রামকান্ত দেখা করিতে আসিলেন না। দয়ারাম ভাবিতে লাগিলেন,—"সে তো কোন দিন আমার সহিত দেখা করিতে বিস্মৃত হয় না, বিশেষতঃ আজ আমি তিন মাস পরে মুর্শিদাবাদ হইতে আসিয়াছি। এমন দিনে রামকান্ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল না। আমি যে জন্য মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলাম, সে সংবাদ জানিবার জন্যও তো তাহার কৌতূহল হওয়া উচিত ছিল! কেন সে আসিল না? তবে সত্যসত্যই কি কেহ কুপরামর্শ-বিষে তাহার হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়াছে? সত্যসত্যই কি তাহার মন কলুষিত হইয়াছে?"

সে কথা ভাবিতেও যেন তাঁহার কষ্ট হইল। তিনি আপনমনে আপনা-আপনিই সিদ্ধান্ত করিলেন,—"হয় তো তাহার কোনও অসুখ-বিসুখ ক'রেছে। নইলে, আমি এসেছি শুনে, এখনও কি না-দেখা ক'রে থাকতে পারে? অথবা, আমার আগমন-সংবাদ এখনও তাহার নিকট পৌঁছায় নাই।"

কি জানি কেন এমন হইল!—দয়ারাম রায় ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। মনে যতই সন্দেহের আবর্জ্জনা সঞ্চার হয়, স্নেহের প্রস্রবণে সকলই ভাসিয়া যায়।

তিনি ভাবিয়া দেখিলেন,—"রামকান্ত কখনই আমার অবাধ্য হইতে পারে না। যতই যে তাহাকে ভুল বুঝাইয়া থাকুক, যতই যে তাহার হৃদয়ে গরল ঢালিয়া দিউক, আমার সহিত চোখো-

চোখি হইলে, সে কখনই আমার অবাধ্য হইতে পারিবে না। সে তো এখন আর শিশুটী নাই; কে হিতাকাঙ্ক্ষী, কে অহিতাকাঙ্ক্ষী অবশ্যই সে বুঝিতে পারিবে।” এইরূপ ভাবনার পরই, দয়ারাম স্থির করিলেন,—“রামকান্ত আসে নাই;—তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে? আমি নিজেই গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আসি।” দয়ারাম উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সহসা মনোহর রায় এবং বিশ্বেশ্বর গুহ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিতেছেন দেখিয়া, প্রথমে দয়ারামের মনে হইয়াছিল,—“আমি যাহা ভাবিয়াছি, বোধ হয় তাহাই ঠিক, রামকান্তের শারীরিক কোনরূপ অসুস্থতার সংবাদ লইয়াই ইহারা আসিতেছেন।” কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সে ধারণা দূরীভূত হইল। মনোহর রায় ও বিশ্বেশ্বর গুহের মুখ-চোখ, পদক্ষেপ এবং ভাবভঙ্গী দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন,—ভিতরে কোনও রহস্য আছে। অতএব যথারীতি তাঁহাদিগকে বসিতে বলিয়া, তাঁহাদের উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিশ্বেশ্বর বা মনোহর—কে আগে উত্তর দিবেন, সেই সংশয়েই কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের মুখ চাহাচাহি করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের ভাব দেখিয়া তাঁহারা কোনও বিশেষ কথা বলিতে আসিয়াছেন বুঝিয়া, দয়ারাম কহিলেন,—“বলুন কি বলিবার আছে, বলুন!”

বিশ্বেশ্বরের মুখের পানে চাহিয়া, মনোহর রায় কহিলেন,—“বলনা, হে বিশ্বেশ্বর! বল-না?”

বিশ্বেশ্বর উত্তর দিল,—“আপনিই বলুন না! মহারাজ আপনাকেই তো বলিতে ব'লেছেন!”

মনোহর।—"তা—তা—তুমিই বল না?"

দয়ারাম মনে মনে বিরক্ত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিতে আসিয়াছেন? রামকান্ত কি বলিতে বলিয়াছে? আমি তো এখনই তাহার কাছে যাইতেছি। তাহার শরীর ভাল আছে তো?"

মনোহর রায় অগত্যা বলিলেন,—"হাঁ তিনি ভাল আছেন।"

দয়ারাম ভাবিলেন,—"রামকান্ত ভাল আছে, তবু আমার কাছে আসিল না!" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"কি বলিবেন, তবে বলুন!"

মনোহর রায় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তা—তা তিনি মনীব ব'ল্‌তে ব'লেছেন; তাই বল্‌তে হচ্ছে। আপনার কাছে কোনও কথা ব'ল্‌তে যাওয়া—আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি কি করি?—তিনি আদেশ ক'রেছেন; কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আস্‌তে হয়েছে!"

দয়ারাম পুনরায় বিরক্তি-ভাবে কহিলেন,—ভূমিকার কি প্রয়োজন? যাহা বলিতে হয়, সাদাসিদে বলে ফেলুন না!"

মনোহর।—মহারাজ বলেছেন,—"এখন থেকে তিনি স্বয়ং কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌বেন। কি জানেন, এখন আপনার বয়স হ'য়েছে; মহারাজের ইচ্ছে—আপনি এখন বিশ্রাম লন।"

বলিতে বলিতে মনোহর রায় থতমত খাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বর গুহ সুর ধরিলেন,—"তা, মহারাজ খুব সুবিবেচক হ'য়েছেন, তার আর সন্দেহ কি? খাট্‌তে খাট্‌তে আপনার জীবনটা মাটী হয়ে গেল; ক'য় দিনই বা আর আপনি বাঁচবেন? যদিচ আপনার দুই দশ বছর বাঁচবার সম্ভাবনা থাকে, এখনও হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাট্‌লে, কি তা আর থাকবে! তা, মহারাজ ভালই করেছেন।"

দয়ারাম গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"আর কিছু বলিবার আছে কি ?"

মনোহর।—"না, বিশেষ আর কিছু বলিবার নাই। আপনি আমাদের সকলের উপরে থেকে, সব দেখা-শুনা করুন; মহারাজ কাজকর্ম্ম সব নির্ব্বাহ করবেন। চিরকাল যে আপনাকেই সব ক'রতে হবে, তার তো কোনও মানে নেই।"

দয়ারাম।—"এ তো আমার আহ্লাদের কথা! তা, এ কথা ব'লতে আপনাদের পাঠানো কেন? রামকান্ত নিজে ব'ল্লেই তো পারতো। রামকান্ত আপন বিষয়-সম্পত্তির আপনি তত্ত্বাবধান করবে। ইহার অধিক আহ্লাদের বিষয় আমার আর কি হ'তে পারে? মুর্শিদাবাদ যা'বার পূর্ব্বে আমি নিজেই এ বিষয় চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমায় সেখানে যেতে হওয়ায়, আমি কোনই ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারিনি। তা না হলে, এতদিন আপনারা দেখতে পেতেন— রামকান্ত নিজেই আপনার কাজকর্ম্ম চালাতে আরম্ভ ক'রেছে! যা হক, রামকান্ত এখন বৈঠকখানায় আছে তো? চলুন, আমিও গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে সব ব'লে আসিগে।"

দয়ারামের কথা শুনিয়া, মনোহর ও বিশ্বেশ্বর গা-টেপাটেপি করিলেন। বিশ্বেশ্বর মনে মনে বলিলেন,—"দয়ারাম যে এত সহজে রাজি হবে, তা ভাবি-নি। মা জগদম্বা মুখ তুলে চেয়েছেন; দয়ারামের তাই সুমতি হ'য়েছে।" কিন্তু মনোহর ভাবিলেন,—"গতিক বড় ভাল নয়! আবার দেখা ক'রতে চায় যে।" যাহা হউক, কাহারও ভাবনায় কিছু আসিয়া যায় না। দয়ারাম অগ্রে অগ্রে এবং মনোহর ও বিশ্বেশ্বর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামকান্তের কক্ষে গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চক্রান্তের ফল।

পারিষদ-পরিবৃত রামকান্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যাইবার সময় মনোহর রায়ও বলিয়া গিয়াছিলেন,—"দয়ারাম সে বান্দা নয়; আমাদের কথা শুনলে, সে নিশ্চয়ই দেখা করতে আসবে!" কিন্তু রামকান্তও তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—"কুছ পরোয়া নেই! আমি মন বাঁধিয়াছি! কাহারও সাধ্য নাই—আর আমার মন ফিরাইতে পারে। দয়ারামকে তাড়াইব, ইহাই আমার স্থির সঙ্কল্প। আপনারা কেহ কিছু বলিতে না পারেন, আমি তাঁহার মুখের উপর স্পষ্টাস্পষ্টি সকল কথা বলিব।"

মনোহর রায় যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহাই সংঘটিত হইল। দয়ারাম, রামকান্ত রায়ের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অন্য দিন দয়ারাম সে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলে, রামকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইতেন, পারিষদবর্গ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সরিয়া যাইত। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব! দয়ারামকে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া, রামকান্ত গম্ভীরভাবে মুখ অবনত করিয়া রহিলেন; পারিষদবর্গ দয়ারামের প্রতি তাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করিল না! কিন্তু দয়ারাম বুঝিয়াও তাহা বুঝিলেন না—এমনই ভাব প্রকাশ করিলেন। তিনি আপনা-আপনি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, আপনা-আপনিই রামকান্তকে স্নেহব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন!—"কি দাদা! শরীর ভাল তো!"

রামকান্ত গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"হুঁ"।

এ অবস্থায় দয়ারামের আর কোনও কথা কহা উচিত ছিল কিনা, দয়ারাম তাহা বিবেচনা করিলেন না। উত্তেজনায় বা অবস্থাবিপর্য্যয় সে বিবেচনা-শক্তি বুঝি বা মানুষের লোপ পায়। দয়ারাম তাই কহিলেন,—"তোমার যাহা বলিবার ছিল, তুমি নিজে অনায়াসে, তাহা বলিতে পারিতে। এ তো আমার আহ্লাদের কথা।"

মনোহর রায় কহিলেন,—"মহারাজের বলিতে সঙ্কোচ হইতেছিল। তাই আমাকে বলিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।"

দয়ারাম।—"তার আর সঙ্কোচ কি?"

এই বলিয়া, রামকান্তকে সম্বোধন করিয়া, দয়ারাম কহিলেন,—"বল" দাদা। কি কি করতে হবে, বল? আমি আজই তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

রামকান্ত গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"আজই যে কিছু করতে হবে, তেমন কথা কিছু বলছি না। তবে যে দিন-কাল পড়েছে, তাতে এ ভাবে আর বেশী দিন কাজ চলা উচিত নয়। ইহাই আমার অভিপ্রায়। বিশেষতঃ, আমার নিজের কাজ, এখন থেকে আমি যদি না বুঝি, কবে আর বুঝব?"

দয়ারাম।—"তোমার কি কি বুঝবার আছে, বল?"

রামকান্ত।—"আমি স্থির ক'রেছি, আমি নিজেই এখন থেকে আমার কাজকর্ম্ম দেখবো;—"

ইহার পর, "এখন আর আপনার আবশ্যকতা নাই,"—রামকান্ত এই কথা বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু আপনা-আপনিই মুখ আটকাইয়া গেল।

অতঃপর রামকান্ত প্রকারান্তরে পূর্ব্বের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া কহিলেন,—"আমার কাজকর্ম্ম, আমি এখন নিজেই দেখবো; অপর কাহারও সহায়তার আর প্রয়োজন নাই।"

দয়ারাম নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন,—"আর বল্‌তে হবে না; আমি সমস্তই বুঝিয়াছি! তোমার স্বর্গীয় পিতা রাজা রামজীবন রায়, দয়ারামের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই দয়ারামের গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট। তবে যে দয়ারাম এ বয়সেও চাকরী স্বীকার করিয়া আছে, তাহার কারণ, অপরে কি বুঝিবে?—তাহার কারণ,—রামকান্তকে এবং দেবী-প্রসাদকে মানুষ হইতে দেখিয়া যাওয়া। তা তোমরা দুই জনই এখন মানুষ হইয়াছ; দুই জনই এখন আপন পথ আপনা-আপনিই দেখিতে পাইয়াছ। সুতরাং এখন আর আমার প্রয়োজন কিছুই নাই। আমি আজ হইতেই নাটোর রাজধানীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম; তোমাদের খাইয়া মানুষ হইয়াছি; সুতরাং অসমর্থ হইলেও, তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারি না,—ছাড়িয়া যাইবার কথা বলিবারও কখন সাহস হয় নাই। কিন্তু আজ তুমি আমার বাসনার অনুকূল কার্য্য করিলে, আজ তুমি আমায় বিদায় দিবার প্রস্তাব করায়, আমার দায়িত্ব অনেকাংশে হ্রাস পাইল। তুমি আপনার বিষয়কর্ম্ম আপনি দেখিবে—আমার পক্ষে তাহাও যেমন সুখকর; আবার, তোমার রাজ্য তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া, আমি নিশ্চিন্ত-মনে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন অতিবাহিত করিব, তাহাও আমার পক্ষে তেমনই সুখকর।"

বেণীভূষণ মৈত্র ইতিমধ্যে আসিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হন। যেন রামকান্ত তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বেণীভূষণ সেই ভাব প্রকাশ করেন। দয়ারামের স্বার্থত্যাগ ও পরহিতৈষণাদির কথা শুনিয়া রামকান্তকে লক্ষ্য করিয়া, তিনি কহিলেন,—"দেখলে বাবাজি! আমি ব'লেছিলাম কি না? দয়ারাম রায় কি তেমন লোক? এখন উনি যা বলেন, শোন?"

দয়ারাম পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"তবে যাইবার পূর্ব্বে দুই চারিটী কথা তোমায় বলিয়া যাই। কথা কয়টী মনে রাখিও। সময়ে কাজে লাগিবে। আমার প্রথম কথা,—ভ্রাতৃবিরোধ করিও না। ভ্রাতৃবিরোধের—জ্ঞাতিবিরোধের অশুভ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। অতএব দেবীপ্রসাদের সহিত যাহাতে আপোষ নিষ্পত্তি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিও। আমার দ্বিতীয় কথা,—প্রাচীন কর্ম্মচারীদিগকে সহসা পদচ্যুত করিও না; কাহারও নিন্দা বা সুখ্যাতিতে অণুমাত্র বিচলিত হইও না। আমার তৃতীয় কথা,—প্রজাগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিও। দেখিও, যেন তাহাদের প্রতি কখনও কোনরূপ অন্যায় পীড়ন না হয়। আমার চতুর্থ কথা,—নবাবসরকারে কিস্তীমত রাজস্ব-প্রেরণে কখনও শৈথিল্য করিও না। যথারীতি খাজনা না দিতে পারিলে, রাজ্য রক্ষা হইবে না। আমার শেষ কথা—উপকারীর উপকার কখনও বিস্মৃত হইও না। স্বধর্ম্মে মতি রাখিও।"

এই বলিয়া দয়ারাম বিদায় গ্রহণ করিলেন; সেই রাত্রেই নায়েব মনোহর রায় তাঁহার নিকট হইতে হিসাব-পত্র বুঝিয়া লইলেন।

দয়ারাম চলিয়া গেলে, দয়ারামের উপদেশ-পরম্পরা লইয়া নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ আলোচনা চলিতে লাগিল। বেণীভূষণ আপনা হইতেই বলিলেন,—"দেখ, বাবাজী! আমি ব'লেছিলাম কি না! দেখ্‌লে—দেবীপ্রসাদের প্রতি টান্‌টা। আমি অন্যায্য দিকে কখনও নেই! দেবীপ্রসাদের জন্য তুমি কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেও,—এ কথা আমি তোমায় দ'শ বার বল্‌তে পারি; কিন্তু ভাগাভাগির কথার মধ্যে আমি থাকতে চাই-নে। ভাগাভাগির কথা কি করেই বা উঠ্‌তে পারে? আমার তো এ রাজ্যের কিছুই অবিদিত নাই।

রাজা রামজীবন রায় রাজা ছিলেন, সম্পত্তি তাঁর ছিল। তুমি তাঁর পুত্র, অন্যকে আবার ভাগ দিতে যাইব কেন?” সঙ্গে সঙ্গে নায়েব মনোহর রায়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“কেমন, রায় মহাশয় আপনি কি বলেন।”

মনোহর।—“আমিও তো তাই বলি। দেখলেন একবার দয়ারামের উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গী। যেন কেউ কিছু জানে না; ‘তিনিই সব-জানত।’ এই ভাবেরই উপদেশ নয় কি? আর বাপু! ঠিক সময়ে নবাবের খাজনা দেওয়া উচিত, কে না জানে? মহারাজ কি তা বোঝেন না। তাঁকে আবার উপদেশ দেওয়া।”

হীরালাল-প্রমুখ রামকান্তের পারিষদগণ হা, হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—“মহারাজকে আবার উপদেশ! হা—ভাই হেসেও বাঁচিনে।”

বেণীভূষণ।—“আরও দেখলেন,—কেমন টিপ্পনী কাটা। পুরানো কর্ম্মচারীদের ছাড়তে না। ঐ যে রামরূপকে জঙ্গল-পরগণায় পাঠিয়েছেন,—সেই জন্যই যেন শোকটা উথলে উঠেছে।”

বিশ্বেশ্বর এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। তিনি মনে করিলেন—“এ মরসুমটা আমারই বা ফাঁক যায় কেন।” তাই, সুযোগ পাইয়া তিনিও কহিলেন,—“আরও দেখেছেন, ধর্ম্ম দেখিয়ে যাওয়া।”

বেণীভূষণ সকলের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—“যাক, ওসব আর মনে করতে নেই। এখন কাজকর্ম্ম কিসে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করুন। সংসারের যাতে ভাল হয়, তাই তো এখন সকলের দেখা উচিত।”

মনোহর রায় কহিলেন,—“দয়ারাম আর টিটকিরী দিতে না পারে, মৈত্র মহাশয়, শুধু সেই আশীর্ব্বাদ করুন। নইলে, আমরা কাজে কেউ পেছু-পাও নই।”

এইবার রামকান্ত সোৎসাহে কহিলেন,—"সেজন্য আপনাদের কোনও চিন্তা নাই। যখন ভার গ্রহণ করেছি, তখন কিছুতেই কিছু আটকাবে না।

"তা তো বটেই—তা তো বটেই!" বলিয়া সকলেই অনুমোদন করিলেন। অতঃপর রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া, বেণীভূষণ কহিলেন,—"আমার শরীরটা আজ ক'দিন থেকে রাত্রি হ'লেই কেন ঝিম্ ঝিম্ করে; নিতান্ত বাবাজি ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই আস্‌তে হ'য়েছে। তা আমি এখন আস্‌তে পারি কি?"

অপরাপর সকলেরও সেই ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া, রামকান্ত কহিলেন,—"তা আজকের মত আমাদের সভাভঙ্গ হউক।"

সভাভঙ্গ হইল। সকলে যথাস্থানে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চিন্তা-তরঙ্গ।

সভাভঙ্গ হইল বটে; কিন্তু চিন্তা-ভঙ্গ হইল না। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে আজ একেই রাত্রি হইয়াছিল, তাহার উপর আবার চিন্তায় চিত্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। রামকান্তের তাই আজ নিদ্রা আসিতেছিল না!

দয়ারামকে বিদায় দিয়াছেন বটে, কিন্তু দয়ারামের চিন্তা তো মন হইতে দূর হয় না। দয়ারামের স্মৃতি বিস্মৃতির গর্ভে যতই লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন; কি জানি-কেন, সে স্মৃতি প্রাণের ভিতর ততই ভাসমান হইয়া উঠিতেছে।

শুইয়া শুইয়া রামকান্ত ভাবিতেছেন,—"কাজটা ভাল করিলাম কি? আমার রাজ্য আমি প্রাপ্ত হইলে তাঁহার এত আনন্দ—এত শান্তি! তবে কি আমি তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছিলাম? যাহা দেখিলাম, তাহাতে তো মনে হয়, দয়ারাম মানুষ নয়—দয়ারাম দেবতা।"

রামকান্ত শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন,—"না—না, কখনই আমার ভ্রম হয় নাই! দয়ারাম আমার শত্রু—নিশ্চয়ই আমার শত্রু! তা না হ'লে, বিদায় গ্রহণের সময়ও দেবীপ্রসাদের কথা অমন করিয়া কহিয়া যাইবে কেন? দয়ারাম ঘোর চতুর। তাই আপন মনোভাব অব্যক্ত রাখিয়া, আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া গেল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, তাহার প্রত্যেক বাক্য বিষপূর্ণ। দয়ারাম—বিষকুম্ভপয়োমুখ।"

চিন্তার গতি আবার ফিরিয়া গেল। রামকান্ত আবার উপাধানে মস্তক ন্যস্ত করিয়া শয়ন করিলেন। আবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"না—না; দয়ারাম কখনই শঠ প্রবঞ্চক নহেন। তিনি যদি শঠ প্রবঞ্চক হইতেন, তবে তিনি যে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, ক্ষুদ্র কীটাণুকীট আমি, তাহাতে স্রোতের তৃণকণার ন্যায় এত দিন কোন্ দিকে ভাসিয়া যাইতাম! দয়ারামই আমায় প্রতিপালন করিয়াছেন; দয়ারামই আমার পক্ষপুট-বিস্তারে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। দয়ারাম কি কখনও আমার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইতে পারেন। আমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়াছি। যাই,—দয়ারামকে এখনই ফিরাইয়া আনি।"

উৎসাহে রামকান্ত আবার উঠিয়া বসিলেন। আবার চিন্তাস্রোত পরিবর্তিত হইল; আবার আপনা-আপনিই বলিতে লাগিলেন,—ফিরাইয়া আনিব কি? যে আমাকে এতকাল মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া কেবল আত্ম-প্রাধান্য-বিস্তারে সচেষ্ট ছিল, তাহার একাধি-

পত্যে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছিল, তাহাকে আবার ফিরাইয়া আনিব কি? দয়ারামের আবছায়ায় পড়িয়া এত দিন আমার জীবনমুকুল সঙ্কুচিত হইয়াছিল; অবাধ অরুণ কিরণে বর্ষার অপ্রতিহত বারি-সিঞ্চনে, নির্ম্মুক্ত পবনহিল্লোলে, এতদিনে তাহা প্রস্ফুট হইতে চলিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া, আবার সেই বর্দ্ধনোন্মুখ জীবনে কেন প্রতিবন্ধ উপস্থিত করিব? সে গিয়াছে, বালাই গিয়াছে; আমি যাহা বুঝিয়াছি, কখনই ভুল বুঝি নাই।”

রামকান্ত আবার শুইয়া পড়িলেন। কি আশ্চর্য্য!—আবার চিন্তাস্রোত অন্য পথ অবলম্বন করিল। রামকান্ত আবার ভাবিলেন,—“হয় ত ভুলই বুঝিয়াছি। এই বিশাল রাজ্য, চারিদিকে বিপ্লববিদ্রোহ; চারিদিকে শত্রুর লোলুপ দৃষ্টি; সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ যুবক আমি। এ অবস্থায় দয়ারামের ন্যায় বহুদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিদায় দিয়া ভাল কাজ করিয়াছি কি? দয়ারাম—নাটোর রাজ-সংসারের স্তম্ভস্থানীয়। সেই স্তম্ভ স্থানচ্যুত করিলাম। জানি না, এ সংসার কিসের উপর অবস্থান করিবে? আমি কি বুঝি—কি জানি? উঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া কার্য্য করিব, সে সামর্থ্য আমার কোথায়? তবে কি আবার দয়ারামকে ডাকিয়া আনিব?—সেই ভাল—সেই শ্রেয়ঃ।”

রামকান্ত আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। আবার বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। আবার চিন্তাগতি ভিন্নমুখী হইল। রামকান্ত ভাবিতে লাগিলেন,—“আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে? আমি কি এতই অকর্ম্মণ্য, নিজের সম্পত্তি নিজে রক্ষা করিতে পারিব না? যদি না পারি, এ জীবন যাওয়াই শ্রেয়ঃ। ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন’, হয়, সব জাহান্নমে যাইবে—না

আপন গৌরবে আপনি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিব। দয়ারামকে আর কখনই ডাকিব না।"

এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া রামকান্ত আবার শয়ন করিলেন। কিন্তু আবার চিন্তায় চিত্ত চঞ্চল হইল। আবার উঠিলেন, আবার ভাবিলেন। আবার শুইলেন; আবার ভাবিলেন। চিন্তারও শেষ হয় না; নিদ্রারও শুভাগমন হয় না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া, কহিলেন,—"দূর হোক, আর ভাবতে পারি না।"

কথাটা একটু উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত হইল। এমন সময়ে ভবানী শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং কথাটা তাঁহার কর্ণে গিয়াও প্রতিধ্বনিত হইল।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই ভবানী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাবিতে পারেন না?"

রামকান্ত চমকিয়া উঠিলেন। ভবানী কি তবে সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছে? রামকান্ত একটু চঞ্চল হইলেন।

ভবানী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাবিতে পারেন না—বলছিলেন না?

রামকান্ত অবসর পাইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভাবনাস্রোত ফিরাইয়া লইয়া, হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন,—"কি ভাবিতে-ছিলাম?—ভবানী! তোমারই মুখখানি।"

ভবানী ব্রীড়াবনত-মুখী হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলুন না—কি ভাবিতে পারেন না, বলিতে-ছিলেন?"

রামকান্ত আবার বলিলেন,—"বলিয়াছি তো—তোমার ঐ মুখখানি।

এই বলিয়া, সাদর-সম্ভ্রমে বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া, বাম করে

ভবানীর গলদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক, দক্ষিণ-হস্তে কুসুম-কোমল চিবুক স্পর্শ করিয়া, রামকান্ত বলিলেন,—"ভবানী! তোমার এই কমল-মুখ ভিন্ন আমার কি ভাবিবার থাকিতে পারে?"

ভবানী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"আমার মুখখানি! কিজন্য এ দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল? সংসারে আপনার সহস্র ভাবনার স্থান আছে। সত্যসত্যই তো—আমার ভাবনা ভাবিবার আপনার সময়াভাব। আপনার সহস্র চিন্তার—সহস্র ভাবনার এক প্রান্তভাগে আমার যদি স্থান থাকে, তাহাই আমার যথেষ্ট! এ তো ভাবনার জিনিষ নয়। তবে, ভাবিতে পারি না—বলিতেছিলেন কেন?"

ভবানী কোনরূসংশয়-প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন না। কিন্তু রামকান্ত আপনার জেরাতে আপনি ধরা পড়িলেন। মনও উদ্বেগপূর্ণ ছিল। সুতরাং আসল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। রামকান্ত কহিলেন,—"ভবানী! তুমি যাহা মনে করিয়াছ, তাহা বড় মিথ্যা নয়।"

ভবানী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—"কেন, আমি কি মনে করিয়াছি?"

রামকান্ত।—"আমার চিন্তার বিষয়।"

ভবানী।—"তাই তো জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—আপনি কি ভাবিতে পারেন না, বলিতেছিলেন?"

রামকান্ত উদ্বেগ-আবেগ-ভরে কহিলেন,—"মনে করিয়াছিলাম, ভবানী, আমার চিন্তার কথা শুনাইয়া তোমায় আর উদ্বিগ্ন করিব না। কিন্তু—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই রামকান্ত আবার মৌনাবলম্বন করিলেন।

ভবানী অধিকতর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, কিসের চিন্তা আপনার? রায় মহাশয় মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন; আজ

ফিরে এসেছেন—শুনেছি। তবে কি তিনি কোনও কুসংবাদ এনেছেন?"

রামকান্ত।—"মা ভবানী! তা নয়! আমার ভাবনা—এখন কি প্রকারে এই বিশাল রাজ্যের গুরুভার বহন করিব?"

ভবানী।—"হঠাৎ আজ আপনার মুখে এ কথা কেন? আপনার কিসের অভাব! সুখের, সৌভাগ্যের, আদরের, স্নেহের, ভালবাসার,—আপনার কিসের অভাব? রাজ্যের ভাবনা—সে তো রায় মহাশয় আছেন। যতদিন তিনি জীবিত আছেন, তত দিন আপনার কিসের ভাবনা?"

রামকান্ত।—"তাই তো ভাবছিলাম, ভবানী!—তিনি যতদিন ছিলেন, অনেকটা পর্ব্বতের আড়ালে ছিলাম।"

'ছিলেন' ও 'ছিলাম' শুনিয়া ভবানী চমকিয়া উঠিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন তাঁহার কি হইয়াছে? আপনি এমন কথা বলিতেছেন কেন?"

রামকান্ত বিষণ্ণভাবে উত্তর দিলেন,—"আজ হইতে তিনি বিদায়-গ্রহণ করিয়াছেন।"

ভবানী।—"কেন বিদায় গ্রহণ করিলেন? কি হইয়াছিল?"

রামকান্ত।—"সে অনেক কথার কথা। ভবানী! তোমাকে কত বলিব?"

ভবানী।—"বলিতে কোনও বাধা আছে কি? যদি বাধা থাকে, বলিবার প্রয়োজন নাই। নচেৎ, আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছি।"

রামকান্ত।—"আমার নিজের রাজ্য, আমি এখন হইতে নিজে চালাইবার চেষ্টা করিব। সে কি ভাল নয়—ভবানী?"

ভবানী।—"তবে কি আপনিই তাঁহাকে বিদায় দিয়াছেন?"

রামকান্ত।—"হাঁ ভবানী! প্রকারান্তরে তাই বটে।"

ভবানী সঙ্কুচিতভাবে কহিলেন,—"আপনার কোনও কর্ম্মে বা কোনও কথায় প্রতিবাদ করা আমার কর্ত্তব্য নয়। আপনি যাহা করিয়াছেন, ভাল বুঝিয়া ভালই করিয়াছেন! কিন্তু আমার যেন মনে হয়, কাজটা ভাল হয় নাই। বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে আমি কখনও কোনও কথা আপনার নিকট বলি নাই, বলিবার অধিকারও আমার নাই। তথাপি, কে যেন আমায় বলিতে উৎসাহ দিতেছে, তাই বলিতে সাহসী হইতেছি। রায় মহাশয়কে যদি ফিরাইয়া আনিবার কোনও উপায় থাকে, সে চেষ্টা করিলে ভাল হয়!"

রামকান্ত।—"কেন তোমার মনে এ ভাব জাগিয়া উঠিতেছে! আমি কি রাজকার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইব না?"

ভবানী।—"অপরাধ লইবেন না। আপনি অসমর্থ—এ কথা আমি কখনই বলিতে পারি না। তবে, তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি এই রাজসংসারে থাকিলে, সংসারের মঙ্গল ভিন্ন কখনই অমঙ্গল নাই; তাই আমার অনুরোধ—যদি ফিরাইবার সুবিধা থাকে, তাহা হইলে দয়ারাম রায়কে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করুন।"

রামকান্ত আবার সেই চিন্তাসাগরে ভাসমান হইলেন। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন,—"ভবানী! সেই ভাবনাই আমি ভাবিতে-ছিলাম। একবার ভাবিতেছিলাম—দয়ারামকে ডাকিয়া আনি; আবার ভাবিতেছিলাম—ডাকিয়া আনার কোনই প্রয়োজন নাই। ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল; তাই বলিতে-ছিলাম—'আর ভাবিতে পারি না।' এমন সময় ভবানী! তুমি আসিয়াছ। যখন জানিতে পারিয়াছ, তখন তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি,—ভবানী! এখন কর্ত্তব্য কি?"

ভবানী।—"দয়ারামকে ফিরাইয়া আনাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ

ছোট তরফের সহিত বিবাদের সম্ভাবনা আছে। এ সময় দয়ারামের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যস্থতা প্রয়োজন। এখন, যেরূপে হউক আপনি রায় মহাশয়কে ফিরাইবার চেষ্টা করুন!"

রামকান্ত অন্য কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না;—বলিলেন,—"কিন্তু কেমন করিয়া সে চেষ্টা আর করিতে পারি?—লোকে কি বলিবে?"

ভবানী।—"তিনি বিচক্ষণ, আপনার প্রতি তাঁহার স্নেহ অসীম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায় আপনার দোষ নাই। লোকনিন্দা তাঁহারই কৌশলে ঢাকিয়া যাইবে; সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া, কাল প্রত্যুষেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন। নিজে যাইতে যদি সঙ্কোচ-বোধ করেন, বিশ্বস্ত ভৃত্যের দ্বারা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিবেন। আপনার নাম শুনিলে, দেখিবেন—তিনি নিশ্চয়ই আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

রামকান্ত।—"তুমি যখন বলিতেছ, আমি নিজেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। লোকে যে যাহা বলে, বলুক। তিনি আমার পালনকর্ত্তা।"

বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিবে? রামকান্তের মতি পরিবর্ত্তিত হইল বটে; প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি নিজেই দয়ারামকে ডাকিয়া আনিতে গেলেন বটে; কিন্তু দয়ারাম রায় কোথায়?

দয়ারাম রায়, হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া, সেই রাত্রিতেই সহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রামকান্ত ভাবিলেন,—তিনি দীঘা-পতিয়ার বাটীতে গমন করিয়াছেন, সুতরাং সেইখানে তাঁহার উদ্দেশে গমন করিলেন। কিন্তু কৈ—সেখানেও ত তিনি নাই। নাটোর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, প্রথমে তিনি দীঘাপতিয়ার বাটীতেই গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তারপর শেষরাত্রিতে সেখান হইতে অন্যত্র

কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তিনি কোথায় গিয়াছেন, সে বাড়ীরও কেহই বলিতে পারিল না!

নাটোর পরিত্যাগ করিবার পর, ঘৃণা, অভিমান, অপমান, আত্মসম্মান—সকল চিন্তায় যুগপৎ তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তোলে। তিনি মনে করেন,—"আমি সেই দয়ারাম—যে দয়ারামের নামে রাজধানী কম্পমান হইত; আমি সেই দয়ারাম—যে দয়ারামের প্রভাবে সিংহ-শৃগালে একই জলাশয়ে জলপান করিত; আমি সেই দয়ারাম—যে দয়ারামের অনুগ্রহলাভের জন্য নাটোরের ধনী দরিদ্র সকলেই যুক্ত-করে দণ্ডায়মান থাকিত, সেই আমি—আমি কেমন করিয়া কাল প্রাতে এ মুখ রাজধানীতে দেখাইব। সেই আমি—যখন দেখিব, আমাকে দেখিয়া লোক টিটকিরী দিতেছে, আমি কেমন করিয়া সহ্য করিব? সেই আমি—যাঁহার অনুগ্রহলাভের জন্য উচ্ছিষ্টপ্রয়াসী কুকুরের ন্যায় রাজ-কর্ম্মচারিগণ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিত, আমি কিরূপে সহ্য করিব—তাহারা আমার মস্তকে পদাঘাত করিতেছে?"

এইরূপ চিন্তায়, উদ্বেলিত হৃদয়ে, দয়ারাম রায় রাত্রিতেই নাটোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু তিনি কোথায় চলিয়া যান, রামকান্ত তাহার সন্ধান করিতে পারিলেন না; সুতরাং দয়ারামকেও আর ফিরাইয়া আনা হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিপর্য্যয়।

ষড়যন্ত্রের ফল ফলিল। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধে আলি-বর্দ্দীর নিকট সরফরাজ খাঁ পরাজিত হইলেন। এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার সিংহাসনে ওলোট-পালোট হইয়া গেল।

জগৎ শেঠের বাড়ীর পরামর্শসভার পর, ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে, হাজি-আহম্মদ দূতরূপে দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। দিল্লীতে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন,—নাদির শা দিল্লী আক্রমণ করিয়া আছেন। দিল্লীতে রক্তের নদী প্রবাহিত হইয়াছে। সম্রাট্ মহম্মদ শা সন্ত্রস্ত। সুতরাং হাজি আহম্মদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। এ দিকে দিল্লীতে নাদির শাহের অত্যাচারও চরম সীমায় উপনীত হইল। একদিন রাত্রি ৩টার পর হইতে আরম্ভ করিয়া, পর দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় পনের ঘণ্টা কাল, দিল্লীতে অবাধ হত্যাকাণ্ড চলিল! নাদির শা দিল্লীর চাঁদনী চকে 'সোনার মস্‌জিদে'র সম্মুখে উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন; আর তাঁহার অনুচর সৈন্যগণ দিল্লীর রাজপথে যথেচ্ছভাবে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। দিল্লীর সম্রাট্ হীনবল মহম্মদ শাহ কোন প্রতিকার-উপায় গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না; অথচ তাঁহার চোখের উপর সহস্র সহস্র নিরীহ নর-নারীর প্রাণনাশ হইতেছে। সম্রাট্ মহম্মদ শা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন, তিনি আপন প্রাণের মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া নাদির শাহের চরণতলে আপন তরবারি রক্ষা করিয়া কাতর-কণ্ঠে প্রজাপুঞ্জের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। মহম্মদ শাহের সেই কাতরতায় পাষাণ নাদির শাহের হৃদয়েও একটু করুণার

সঞ্চার হইল। সম্রাট্ মহম্মদ শাহকে পদতলে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, নাদির শাহ আপনার অসি কোষ-মধ্যে বদ্ধ করিলেন। ইঙ্গিত পাইয়া নাদির শাহের অনুচরগণও প্রতিনিবৃত্ত হইল। ইহার পর নাদির শাহের সহিত সম্রাট্ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সন্ধির ফলে 'কোহিনুর' মণি, 'ময়ূর' সিংহাসন, লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, অসংখ্য হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি লইয়া, নাদির শাহ দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন।

দুই মাস নাদির শাহ দিল্লীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লী হইতে চলিয়া যাইবার পর, মহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, হাজি আহম্মদ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইলেন। সরফরাজ খাঁর অত্যাচারের কথা সম্রাটের গোচরীভূত হইল। হাজী আহম্মদ আপন ভ্রাতা আলীবর্দীর নামে নবাবী সনন্দ মঞ্জুর করাইয়া লইলেন। তাহার পর, দুই ভ্রাতায় সসৈন্যে বাঙ্গালার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সরফরাজ খাঁ যথাসময়েই সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে শেঠভবনে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। চেষ্টারও তিনি ত্রুটি রাখেন নাই। কিন্তু চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত এতই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহার কোনও চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। ষড়যন্ত্রকারীরা কৌশলে তাঁহার সৈন্যদলকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছিল; ষড়যন্ত্রকারীরা কৌশলে তাঁহার শিবিরে গোলা বারুদের পরিবর্তে ধূলিরাশি ও ইষ্টক প্রভৃতি রাখিয়া আসিয়াছিল। সরফরাজের সেনাপতি ঘোষ খাঁ বিপক্ষ-পক্ষে মিলিত হইয়াছিলেন। এদিকে আলিবর্দীর সৈন্যদল শেঠভবন হইতে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছিল।

যাহার দিন ঘনাইয়া আসে, এইরূপেই আসিয়া থাকে। গিরিয়ার

যুদ্ধের দিন, যথারীতি উপাসনার পর কোরাণ হস্তে লইয়া, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সরফরাজ খাঁ অসীম সাহসে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। সহসা বিপক্ষ-পক্ষের এক গোলা আসিয়া তাঁহার মস্তকের উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সরফরাজের বাঙ্গালার নবাবী ফুরাইয়া গেল।

গিরিয়ার যুদ্ধ-জয়ের তিন দিন পরে আলিবর্দ্দী এবং তাঁহার ভ্রাতা হাজি আহম্মদ বিজয়-নিনাদে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। সরফরাজের জামাতা নগর-রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! বিজয়লক্ষ্মী যখন যাহার অঙ্কশায়িনী হন, কেহই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। যে আলিবর্দ্দী সরফরাজখাঁর পিতা সুজা-উদ্দীনের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; যে আলিবর্দ্দী সরফরাজ খাঁর অধীনে পাটনার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—সেই আলিবর্দ্দীর হস্তে সেই সরফরাজের এতরূপ পরিণতি সংঘটিত হইল! কাহার কোন পাপের দণ্ড কিরূপভাবে বিহিত হয়,—বিচিত্র জগৎ-রহস্য, কে বুঝিতে পারে?

কিন্তু যাউক সে কথা। বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করিয়া নবাব-পরিবারের সমস্ত ধনরত্নের অধিকারী হইয়া, আলিবর্দ্দী যখন বঙ্গদেশ শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন, ঠিক সেই সময়ে নাটোর রাজধানী হইতে দয়ারাম রায় বিতাড়িত হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী যখন সিংহাসনে অধিরূঢ়, দয়ারাম রায় তখন মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর, অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি মুর্শিদাবাদেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অপমানের কথা—তাহার হৃদয়ে মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিত। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"ভগবান যদি কখনও দিন দেন, আবার নাটোরে এ মুখ দেখাইব; নচেৎ, এই পর্য্যন্তই শেষ।" সুতরাং মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিয়া

সেখান হইতে দয়ারাম আপন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাঙ্গালার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া আলিবর্দ্দী যে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, এমন নহে। নানা কারণে তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হইল। প্রথমতঃ, দিল্লীর সম্রাটের নিকট বহু অর্থ উপঢৌকন পাঠাইতে হইল। দ্বিতীয়তঃ, উড়িষ্যার যুদ্ধে, বর্গীর হাঙ্গামায়, অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া গেল। সুতরাং রাজকোষে কেবলই অর্থের অনাটন ঘটিতে লাগিল। আলিবর্দ্দী বাঙ্গালার জমিদারগণের নিকট বাকী রাজস্ব চাহিয়া পাঠাইলেন। নাটোরেও পরওয়ানা প্রেরিত হইল।

দয়ারাম রায় চলিয়া যাওয়ার পর, রাজসংসারে আদৌ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হয় নাই। যাহা কিছু রাজস্ব আদায় হইত, সকলই ব্যয় হইয়া যাইত। কোনও কোনও মহলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, প্রজারা খাজনা দিতে চাহিত না, কোনও কোনও মহলে দেবীপ্রসাদ চক্রান্ত করিয়া খাজনা আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নবাব সরকারে অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে; অতএব টাকার সংস্থান করা হউক,—এ কথায় প্রায় কেহই কর্ণপাত করিতেন না। কখনও সে কথা উঠিলে প্রধান প্রধান আমলাগণ হাসিয়া তাহা উড়াইয়া দিতেন। তাঁহারা বুঝাইতেন,—"বাঙ্গালার নবাব কে হন, আগে ঠিক হউক; তার পর, রাজস্ব দেওয়ার কথা।" আর বুঝাইতেন,—"বাঙ্গালার নবাব এখন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার সাধ্য নাই যে, রাজসাহী প্রদেশ দখলে রাখিতে পারেন। নাটোর সে হিসাবে এখন স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত।"

এইরূপ বুঝাইয়া কষ্টে স্বষ্টে রাজবাড়ীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, যাহা কিছু উদবৃত্ত থাকিত, আমলারা পাঁচ জনে, যে যেমন পারিত, লুঠিয়া লইত।

অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, সঙ্গদোষে রামকান্ত দিন দিন আমোদে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি রাজ-কার্য্য দেখিতেন বটে; কিন্তু পরিশেষে কর্ম্মচারীদিগকে লইয়াই প্রমোদে মত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। দুই দিকের দুই মহলে এখন দুই দুই রকমের আড্ডা বসিতে আরম্ভ হইয়াছিল! এক দিকে রামকান্তের মজলিসে আমোদের হর্‌রা চলিত; অন্য দিকে দেবীপ্রসাদের বৈঠকখানায় পঞ্চমকারের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, ভবানীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির গুণে রামকান্ত কতকটা সংযত ছিলেন বটে; কিন্তু দেবীপ্রসাদের প্রমোদ-প্রবাহ অপ্রতিহত ভাবেই চলিয়াছিল।

এই সময়ে সহসা রামকান্তের নামে নবাবের পরওয়ানা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে আমলারা সে পরওয়ানা চাপিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু শেষে যখন নবাব-সরকার হইতে কড়াকড়ি আরম্ভ হইল, তখন আর তাহা চাপা রহিল না। দয়ারাম থাকিতে এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই। কিন্তু দয়ারাম চলিয়া যাওয়ার পরই বা কেন হইল,—সুতরাং নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ কহিল—দয়ারামের চক্রান্ত; কেহ কহিল—রামকান্তের দূরদৃষ্ট, কেহ কহিল—দেবীপ্রসাদের শুভগ্রহ।

রামকান্ত বিশেষ ভাবনায় পড়িলেন। তিনি কি করিবেন? কে তাঁহাকে সদুপদেশ দিবে? তাঁহার রাজ্যরক্ষারই বা অন্য উপায় কি আছে?

দশম পরিচ্ছেদ।

কৃতান্ত কুমার।

দেবীপ্রসাদের বৈঠকখানায়, তাঁহার পারিষদ-মহলে, আজ আনন্দের কলকল্লোল উঠিয়াছে। কেহ বলিতেছে,—"এইবার তো তুমিই মহারাজ। দেও—আমাদের কি পুরস্কার দেবে, দেও?" কেহ বলিতেছে,—"আমায় একটা পরগণা লিখে না দিলে, আমি ছাড়ছি না।" ফেলারাম বলিতেছে,—"আমার বাপু নিকাম কর্ম্ম! আমি নিজের জন্য কিছু চাইনে। আমি চাই—আমাদের আড্ডাটার একটা কায়েমী বন্দোবস্ত। তার জন্যে একটা বন্দোবস্ত লিখে দিতে হবে। প্যালারাম বলিতেছে,—"আমি চাই—মদের একটা পুকুর হোক। ছোট ফোঁটায় আর রাজবাড়ী মানায় না?" কৃতান্ত-কুমার সকলের উপর টেক্কা দিয়া বলিতেছে,—"আমি চাই—অষ্ট-প্রহর নাম-সঙ্কীর্ত্তন আমার ইচ্ছে—এমন একটা বন্দোবস্ত হোক, আমাদের মজলিসের নাচ-গান যেন কামাই না যায়।"

সকলের এইরূপ কোলাহলে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া, দেবীপ্রসাদ কহিলেন,—"তোমরা আগেই এতটা বাড়াবাড়ি করে তুলেছ কেন? কোথায় কি—তার ঠিক নেই; এর মধ্যে এতটা হৈ-চৈ।"

কৃতান্তকুমার চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"আরে ভায়া—আবার কি চাই। এবার রামকান্তকে বৈকুণ্ঠে যেতে হয়েছেই হয়েছে। তুমি তা ঠিক জেন!"

ফেলারাম কহিল,—"তবে তো তুই আচ্ছা বলেছিস্! বৈকুণ্ঠে গেল, তার তার মন্দ হ'ল কি?"

কৃতান্ত।—"আরে মুখ্খু! তাত জানিস্-নে? এ কি আর তোর সে বৈকুণ্ঠ!—এ যে নবাবের বৈকুণ্ঠ।"

প্যালারাম।—"নবাবের আবার বৈকুণ্ঠ কি রে? তোর্ বুদ্ধিটে দিন দিনই সূক্ষ্ম হ'য়ে লোপ পেয়ে গেল যে?"

কৃতান্ত।—"আরে তুইও জানিস্ নে—বৈকুণ্ঠ কাকে বলে? নবাবদের তিন পুরুষ থেকে বৈকুণ্ঠের সৃষ্টি! তোরা তো শুনিস্ নি! কত কত বাঙ্গালার জমিদার যে সেই বৈকুণ্ঠে বাস ক'রে তরে গেল,—সে তত্ত্বও তোরা রাখিস-না। গলায় দড়ি তোদের!"

প্যালারাম, ফেলারাম গলায় দড়ির কথা শুনিয়া, চটিয়া উঠিল। ক্রমশঃ তর্ক-বিতর্কে একটা হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল।

দেবীপ্রসাদ তখন সকলকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"কৃতান্ত যাহা বলিতেছে, তাহা মিথ্যা নয়। বৈকুণ্ঠ কাকে বলে—শোন নি?"

এইবার সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়া কহিল,—"সত্যি না কি মহারাজ! মুসলমানদেরও তা হ'লে বৈকুণ্ঠ আছে? সে বৈকুণ্ঠ আবার কেমন!"

তখন দেবীপ্রসাদ বৈকুণ্ঠ-বর্ণনা আরম্ভ করিলেন,—"মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব হ'য়ে আসেন, সেই সময় থেকে মুর্শিদাবাদে সেই বৈকুণ্ঠ স্থাপিত হয়। মুর্শিদকুলির দৌহিত্রী-পতি রেজা খাঁ সেই বৈকুণ্ঠের প্রতিষ্ঠাতা। রেজা খাঁর উপর বাঙ্গালার রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল। তিনি বাঙ্গালার দেওয়ান ছিলেন। জমিদারদিগের নিকট রাজস্ব আদায়ের জন্য—ঐ বৈকুণ্ঠের সৃষ্টি। বৈকুণ্ঠ—একটা নরক-কুণ্ড। সেখানে মানুষ-সমান গর্ত্তের মধ্যে অস্পৃশ্য পূতিগন্ধময় পদার্থ সঞ্চিত থাকে। কোনও জমিদার যদি রাজস্ব-দানে অক্ষম হন, তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, সেই বৈকুণ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়। বৈকুণ্ঠে নাকানি-চুপানি খাওয়াইয়াও পরিতৃপ্তি না হইলে, আরও

নানা প্রকারের জমিদারদিগকে উৎপীড়ন করার ব্যবস্থা আছে। কখনও তাঁহাদিগকে লবণ-মিশ্রিত মহিষ-দুগ্ধ পান করাইয়া উদরাময় রোগে জর্জ্জরিত করা হয়; কখনও বা ঢিলা পায়জামা পরাইয়া, তাহার মধ্যে বিড়াল ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদিগের অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করা হয়। এরূপ নৃশংস দণ্ডের কথা বোধ হয় স্বপ্নেও মনে আসে না। কিন্তু সত্য সত্যই নবাবদের বৈকুণ্ঠে হিন্দু-জমিদারদিগের জন্য এমনই দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।"

দেবীপ্রসাদের মুখে বৈকুণ্ঠমাহাত্ম্য শুনিয়া কেলারাম ও প্যালারাম শিহরিয়া উঠিল,—"বাপরে! এমন বৈকুণ্ঠ! আমাদের চৌদ্দপুরুষ যেন কখনও বৈকুণ্ঠে না যায়।"

এই সময় কৃতান্তকুমার সকলকে বাধা দিয়া কহিলেন,—"তোমরা এক দিক্ দেখেই চমকে গেলে যে? যারা খাজনা দিতে না পারে, যারা বাদশাকে না মানে, সেই দুষ্ট জমিদারের জন্যই এই ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু যারা ভাল জমিদার, নবাবকে মানিয়া চলে, খাজনার একটী পয়সাও বাকী রাখে না,—তাদের জন্য আবার কেমন ব্যবস্থা আছে জান কি? তাদের জন্য—নবাব পরী ধরে রেখেছেন। তারা সহরে গেলে, যেমন আদর—তেমনি আপ্যায়ন। শিষ্টের জন্য শিষ্টাচরণ; আর দুষ্টের জন্য দুষ্ট ব্যবহার;—কোথায় নেই ভাই?"

"হাঁ হাঁ-তা বটে! তবে তার নাম বৈকুণ্ঠ কেন হ'ল? নরককুণ্ড হ'লেই ত হোত।" সকলে একবাক্যে এইবার সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।

দেবীপ্রসাদ কহিলেন,—"রেজা খাঁ ঘোর হিন্দুবিদ্বেষী ছিল! হিন্দুদের বৈকুণ্ঠের প্রতি উপহাস করবার জন্যই ঐ নরককুণ্ডোপম খাদকে সে বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত করিয়াছিল। সেই অবধি ঐ নামেই উহা চলিয়া আসিতেছে। নবাব আলিবর্দ্দীর সময়ে, এখনও

সেই বৈকুণ্ঠ সেই ভাবেই আছে কিনা—আমি তাহা ঠিক বলিতে পারি না। আমি বাবার কাছে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই বলিলাম। এখনকার অবস্থা কৃতান্ত হয় তো বলতে পারে।”

কৃতান্ত।—“হাঁ হাঁ—আছে বৈ কি। আমি ঠিক জানি। সেদিনও কৃষ্ণনগরের মহারাজকে ধ’রে নিয়ে গিয়ে, বৈকুণ্ঠে কয়েদ ক’রে রেখেছিল—বাবার কাছে শুনেছি।”

এইবার সকলে আহ্লাদে যেন আটখানা হইয়া উঠিল। কেহ বলিল,—“হাঁ হাঁ ঠিক হইয়াছে—রামকান্তকে এবার বৈকুণ্ঠে যাইতে হইবে।” কেহ বলিল,—“যেমন মন, তার উপযুক্ত ফল! হাতে হাতে বৈকুণ্ঠবাস। সরল দেবীপ্রসাদকে একবারে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা!”

কৃতান্তকুমার কহিলেন,—“দেখ—ধর্ম্ম এখনও আছেন। হক দাবী-দার, তাকে কিনা ফাঁকি দিবার চেষ্টা! যা হোক্, ভগবান্ মুখ রেখেছেন। আনন্দের দিন এসেছে, এখন হরদম আনন্দ চলুক।”

বৈকুণ্ঠ প্রভৃতির চিন্তা ভাসিয়া গেল। আবার আনন্দের রোল উঠিল। আবার সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল,—“জয় মহা-রাজ দেবীপ্রসাদের জয়।” তখন সকলেই আবার স্ব স্ব অভীপ্সিত পারিতোষিক লাভের জন্য হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিল।

হঠাৎ দেবীপ্রসাদের বৈঠকখানায় আজ এত আনন্দের রোল কেন, কেহ শুনিয়াছেন কি? এ বৈঠকখানায় নিত্যই আমোদের ফোয়ারা ছোটে; কিন্তু এমন নূতনতর ফোয়ারা কেন উঠিল?

কৃতান্তকুমার পিতার নিকট শুনিয়া আসিয়াছিলেন—“নবাবের দাবীর টাকা দিতে না পারায়, রামকান্তের উপর নবাব বড়ই রুষ্ট হইয়াছেন। এদিকে দেবীপ্রসাদকে রাজা দেওয়াইবার জন্য নবাবের সরকারের সঙ্গে পরামর্শ চলিয়াছে।” আভাসে সেই কথা শুনিয়া

আসিয়া কৃতান্তকুমার এখন দেবীপ্রসাদকে কল্পনার রাজসিংহাসনে বসাইয়াছেন, আর সেই উপলক্ষে দেবীপ্রসাদের পারিষদগণ পারিতোষিক চাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সাবধান।

মজলিসে আনন্দের রোল এমনই উঠিয়াছে—যেন সত্য সত্যই দেবীপ্রসাদের অভিষেক-উৎসব চলিয়াছে।

এমন সময়, সহসা বেণীভূষণ আসিয়া, পার্শ্বের ঘরে বসিয়া, চুপি চুপি দেবীপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমোদ বন্ধ হইলে কি হয়? বেণীভূষণ ডাকিয়াছেন, সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া দেবীপ্রসাদ মজলিস ত্যাগ করিলেন। পারিষদগণকে বলিয়া গেলেন,—"আমি শীঘ্রই আসিতেছি; তোমরা একটু অপেক্ষা কর।"

দেবীপ্রসাদের সহিত নির্জনে বেণীভূষণের সাক্ষাৎ হইল। বেণীভূষণ প্রথমেই কহিলেন,—"আজ তোমাদের এত গণ্ডগোল হইতেছিল কেন? তুমি বুদ্ধিমান্, তোমাকে চতুর ও গম্ভীর বলিয়া জানি; বিষয়-কর্ম্ম-সম্পর্কে একটা কাণাকাণি হওয়া উচিত কি?"

দেবীপ্রসাদ বুঝিলেন—বেণীভূষণ সমস্তই শুনিয়াছেন। আরও বুঝিলেন—গণ্ডগোল করাটা ভাল হয় নাই। তিনি সঙ্কুচিত-ভাবে কহিলেন,—"কৃতান্তই এই গোল বাধাইয়াছে। সে আসিয়া রামকান্তের রাজা গেল, আর আমি রাজা হইলাম—এই কথা বলায়, সকলেই লাফাইয়া উঠিয়াছে।"

বেণীভূষণ গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"আমি তোমাকে পুনঃপুন নিষেধ করিয়াছি—সব কথা গোপন রাখিতে হইবে; আমি যাহাকে যাহা বলিতে বলিব, তদ্ভিন্ন অন্য কথা কোনরূপে প্রচার না হয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি, হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গিল। যাহা হউক, এখনও সকলকে বারণ ক'রে দেবে—যেন কোনও কথা কোথাও রাষ্ট্র না হয়।"

দেবীপ্রসাদ কহিলেন,—"আমি সকলকেই সাবধান করিয়া দিব। কিন্তু কৃতান্তকে আপনি বলিয়া দিবেন, সে আমার কথা শুনিবে না।"

বেণীভূষণ মনে মনে বলিলেন,—"আমিও সেই আশঙ্কাই করি! যাহা ভাবিয়াছিলাম, ছোড়াটা ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" যাহা হউক, তিনি দেবীপ্রসাদকে কহিলেন,—"আচ্ছা! তাহাকে আমি সাবধান করিয়া দিব।"

এইবার দেবীপ্রসাদ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা! কৃতান্ত যাহা বলিতেছিল, তাহা কি তবে সত্য নয়?"

বেণীভূষণ।—"সেই কথা তো বলিতে আসিয়াছি। তবে তোমাদের যেরূপ চাপল্য, তাহাতে তোমাদের নিকট কোনও কথা কহিতে স্বতই শঙ্কা হয়।"

দেবীপ্রসাদ।—"তা, আমি এবার হইতে খুব সাবধান হইব। এত দূর কি যোগাড়-যন্ত্র হইয়াছে, কোনও সংবাদ আসিয়াছে কি?"

বেণীভূষণ।—"সংবাদ পাইয়াছি বৈ কি? কৃতান্ত যাহা বলিয়াছে, অনেকটা ঠিক। রামকান্ত যদি এক মাসের মধ্যে টাকা না দিতে পারে, তাহার রাজত্ব নিশ্চয়ই নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে,—সে রাজ্যভ্রষ্ট হইবে। এইবার সুযোগ উপস্থিত।"

দেবীপ্রসাদ। আমাদের পক্ষের উপায় কিছু স্থির ক'রেছেন কি ?

বেণীভূষণ।—"পূর্ব্বেই বলেছি তো, সুজা খাঁকে হাত করা হয়েছে, তাকে আমি অনেক টাকা দিয়েছি। আমার হাতে এখন আর এক কপর্দ্দক নেই; কিন্তু এখনও বহু টাকার প্রয়োজন। টাকা যদি কোন প্রকারে সংগ্রহ করিতে পারি, তোমার রাজ্যপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।"

দেবীপ্রসাদ উদ্বিগ্ন হইলেন, বলিলেন,—"এতদূর অগ্রসর হইয়াও শেষ আটকাইবে! আপনি তো জানেনই—আমার সংসারে আর কিছুই নাই। সকলই আপনার চেষ্টায় হইয়াছে। শেষরক্ষা আপনাকেই করিতে হইবে। যাহাতে ভাল হয়, আপনি তাহাই করুন। আমায় যে আদেশ করবেন, আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি। যদি কখনও রাজ্য পাই, আপনি নিশ্চয়ই জানবেন, সে রাজ্য আমার নয়—আপনারই।"

বেণীভূষণ মনে মনে বলিলেন,—রাজ্য যে আমারই, তা তুমি বলিয়া কষ্ট পাইতেছ কেন! আমার নিকট তোমার মাথা বিক্রয় হইয়া আছে। নবাব-সরকারেও আমার প্রাধান্যের পরিচয় হ'য়ে থাকছে। তুমি নামে রাজা হ'য়ে থাকবে বটে; কিন্তু রাজা আমিই।" কিন্তু প্রকাশ্যে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—"রাম! রাম! তুমি অমন কথা কখনও মুখে এন না! তোমার রাজ্য, তুমি ভোগ ক'রবে, আমি আশীর্ব্বাদ করব; আর দেখে সুখী হব।"

দেবীপ্রসাদ কহিলেন,—"আপনার মন এমনই উদার বটে! আমি কি আর সাধে ক'রে বলি—আপনি দেবতা! যা করতে হয়, আপনি করুন। জানবেন—আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।"

বেণীভূষণে ও দেবীপ্রসাদে কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন

চাকর আসিয়া চুপি চুপি বেণীভূষণকে বলিল,—"আপনাকে একটী ভদ্রলোক ডাকিতেছেন।"

বেণীভূষণ বুঝিলেন,—হীরালাল আসিয়াছে। তিনি বলিলেন—"তাঁহাকে এইখানেই লইয়া আইস!"

অবিলম্বে হীরালাল সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বেণীভূষণ কহিলেন,—"কি—হীরালাল! খবর কি?"

হীরালাল।—"খবর বড় ভাল নয়! আমি যা বলেছিলাম, তাই ঠিক। রামকান্তের টাকার যোগাড় হ'য়েছে। তাঁর শ্বশুর আত্মারাম চৌধুরী আপনার বাকী সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে কতক টাকার যোগাড় ক'রে দিয়েছেন,—আর কতক টাকা জঙ্গলঘাট থেকে রূপরাম নিয়ে এসেছে। এখানেও কিছু ধার হ'য়েছে। ফলে, টাকার যোগাড় হয়েছে, কাল সে টাকা নবাব-সরকারে পাঠান হবে।"

সত্য।—বেণীভূষণ চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি চারিদিকের পথ রোধ করেছি; তবু টাকার যোগাড় হ'য়ে গেল? মহলে এক পয়সা খাজনা আদায়ের উপায় রাখিনি। যাও আদায়পত্র হচ্ছে, তাও মনোহর রায় আর বিশ্বেশ্বর গুহ লুটে নিচ্ছে। রামরূপ বেটাকে অনেক ক'রে জঙ্গলঘাটে সরিয়েছিলাম; মনে ক'রেছিলাম—সে বেটা জঙ্গলঘাটের নোণা জল খেয়ে পেট ছেড়ে দিয়ে মারা পড়বে। কিন্তু সেই বেটাই শেষে টাকার যোগাড় ক'রে নিয়ে এল? তবে কি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে!—সব টাকা জলে যাবে! না—তা কখনই হইতে দেব না!"—বেণীভূষণ প্রকাশ্যে কহিলেন,—"যাক্ বাবাজি! সেজন্যও চিন্তা নাই!"

দেবীপ্রসাদ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"এখন উপায় কি? আমাদের এত চেষ্টা—সব ব্যর্থ হবে? আমি যে ঘরে একটী

কপর্দ্দক পর্য্যন্ত রাখি নি ;—স্ত্রীর গায়ের গহনা কয়খানি পর্য্যন্ত সেদিন আপনাকে খুলে দিয়েছি! তাই তো মামা! তবে উপায় কি হবে? রামকান্ত যা ব'লেছে, সত্য সত্যই কি তাই হবে? আমায় কি পথের ভিখারী করবে?"

বেণীভূষণ আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—"হতাশ হইও না। আমার এই হাড় ক'খানা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ হতাশ হইও না।"

দেবীপ্রসাদ।—"আপনি কি এখনও আশা-পথ চেয়ে থাকতে বলেন?"

বেণীভূষণ।—"দেবীপ্রসাদ! তুমি বালক। তাই অল্পেই অবসন্ন হ'য়ে আসছ। দৃঢ় হও,—বুক বাঁধ। আমি যাহা বলি, তাহা করিবার জন্য প্রস্তুত হও।"

দেবীপ্রসাদ।—"কি করিতে হইবে, বলুন। আমি তো বলিয়াছি, আপনার আদেশ পেলে আমি রামকান্তের মাথা পর্য্যন্ত কেটে নিয়ে আসতে পারি।"

বেণীভূষণ।—"তাই প্রস্তুত থাক। যখন যা বলব, যেন অবহেলা ক'র না। এখন আমি আসি।"

এই কথা বলিয়া বেণীভূষণ ও হীরালাল নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু দেবীপ্রসাদের মন কোনক্রমেই প্রবোধ মানিল না। বৈঠকখানায় পুনরায় আমোদ করিতে যাইতেও তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না। তিনি ভৃত্যের দ্বারা পারিষদগণকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আমার শরীর খারাপ করেছে; আমি শুতে চললাম।"

ভৃত্যের মুখে সেই কথা শুনিয়া, পারিষদবর্গ বিষণ্ণ-মনে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভৃত্য মনে মনে হাসিল,—"বড়লোকের বাড়ীর মোসাহেবদের অবস্থাই এইরূপ।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আশা-নৈরাশ্যে।

পরদিন যথারীতি পাইক-বরকন্দাজের ব্যবস্থা করিয়া, নবাবের টাকা পাঠান হইল। রামকান্তের হৃদয় বর্ষাধিক কাল যে চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন ছিল, আজ যেন সে মেঘ উড়িয়া গেল।

রামকান্ত আবার মোহ-মদিরায় উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন। রাজা রাম-জীবনের মৃত্যুর পর হইতেই দেবীপ্রসাদের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে বিদ্বেষ-ভাব সঞ্চিত হইতেছিল। এখন সেই বিদ্বেষ-বিষে তাঁহার হৃদয় মাতাইয়া তুলিল। দেবীপ্রসাদ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার খাজনার টাকা আদায়ের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে, দেবীপ্রসাদ, কোনও কোনও মহলে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে;—নবাবের রাজস্ব সংগ্রহ করিতে না পারায়, রামকান্ত এতদিন সমস্তই সহ্য করিতেছিলেন। কিন্তু টাকা পাঠাইয়া, মনে তমোভাবের উদয় হওয়ায়, আজ আর তিনি সে আবেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজস্বের টাকাও রওয়ানা হইল, বন্ধু-বান্ধবগণের উৎসাহে রামকান্তও নাচিয়া উঠিলেন। তিনি সেই দিনই দেবীপ্রসাদকে নাটোর ত্যাগ করিবার জন্য আদেশ-প্রচার করিলেন। প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন,—সেই দিনই দেবীপ্রসাদকে নাটোর হইতে বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই কি জানি কি মনে করিয়া, দেবীপ্রসাদকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"দেবীপ্রসাদ! তুমি যদি তিন দিনের মধ্যে নাটোর পরিত্যাগ না কর, তোমাকে জোর করিয়া নাটোর হইতে বাহির করিয়া দিব।" যাহারা এই কার্যে রাম-

কান্তকে উৎসাহ দিল, তাহারাও কেহ ভাবিয়া দেখিল না,—রামকান্ত নিজেও একবার ভাবিয়া দেখিলেন না,—দেবীপ্রসাদের সহিত নাটোর রাজ্যের কি সম্বন্ধ বিদ্যমান এবং সে রাজ্যে তাঁহার কোনও স্বত্বাধিকার আছে কি না। মোহাচ্ছন্ন-মানুষ এইরূপ মোহে পতিত হয়!

এই সকল ব্যাপারে এবং নবাবের রাজস্ব পাঠাইয়া আনন্দের উৎসবে, সেদিন অন্দরে প্রবেশ করিতে রামকান্তের বিলম্ব হইয়াছিল।

ভবানী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—স্বামী তখনও আসেন নাই।

কোনও দিনই এরূপ ঘটে নাই; আজ কেন এরূপ হইল? ভবানী চিন্তিত হইলেন। নানা রূপ দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

তিনি একবার ভাবিলেন—"নবাবের রাজস্ব প্রেরণে আবার কি কোনও বিঘ্ন ঘটিল?" কিন্তু পরক্ষণেই মনকে প্রবোধ দিলেন,—"আর বিঘ্ন কেন ঘটিবে?" টাকার যোগাড় হইয়াছে; উপযুক্ত পাইক-বরকন্দাজ সঙ্গে দিয়া সেই টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে. বিশেষতঃ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রামরূপ সেই টাকার সঙ্গে গিয়াছে সুতরাং বিঘ্নের আশঙ্কা আর তো কিছুই দেখিতে পাই না।"

তবে তিনি এখনও আসিলেন না কেন? বিলম্বের কারণ কি? টাকা পাঠাইয়া, আনন্দে অধীর হইয়া, আবার কি কুসংসর্গে কুপরামর্শে মন কলুষিত হইল?

ভবানী আর ভাবিতে পারিলেন না; স্বামীর কোনরূপ অশুভ চিন্তা করিতে তাঁহার প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভূত হইল। তিনি একান্তে ভগবানকে ডাকিলেন,—"ভগবন! এ কি বিড়ম্বনা! কেন এ দুর্ভাবনা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে? কেন আমার মনে

সদাই আশঙ্কা হয়—সংসারে ঐ বুঝি পাপ প্রবেশ করিল! আমি পিতার নিকট শুনিয়াছি—কর্ম্মের ফল অবশ্যই আছে! আমার তাই ভয়—পাছে কোন কুকর্ম্ম করিয়া আবার কোন কুফল ভোগ করিতে হয়! পতি—দেবতা! দেবতার কার্য্যে প্রতিবাদ করাও আমার পক্ষে অন্যায়। তাই আমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি;—ভাল-মন্দ বুঝিতে পারিয়াও, আমার দেবতাকে অনেক সময় আমি কোনও কথাই বলিতে পারি না। পাছে তিনি ক্ষুণ্ণ হন, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন,—তাই কোনও বিষয়ে প্রতিবাদ করিতেও সঙ্কুচিত হই। এ অবস্থায়, ভগবান, তুমি ভিন্ন আমার মনোবেদনা জানাইবার অন্ত আর কে আছেন? আমি ভাল বুঝি, কি আমি মন্দ বুঝি, কিছুই জানি না; তুমিই ভাল-মন্দ বিচার করিয়া, আমার স্বামীর মঙ্গল-বিধান করিও। আমি আর কিছু চাই না।"

সহসা ভবানীর দক্ষিণ-নেত্র স্পন্দিত হইল। ভবানী, চমকিয়া উঠিয়া, নেত্র নিমীলিত করিয়া, যুক্তকরে ভগবানকে ডাকিলেন,—"হে ভগবন! আবার কেন এ অমঙ্গলসূচনা! পরীক্ষার এখনও কি শেষ হয় নাই?"

ইতিমধ্যে রামকান্ত সহাস্যবদনে প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। রামকান্তের পদশব্দে ভবানীর যোগভঙ্গ হইল। তাঁহার মনে হইল,—ভগবান প্রসন্ন হইয়া যেন প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। তিনি চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে আপনার আরাধ্য দেবতা।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই রামকান্ত আহ্লাদ-সহকারে কহিলেন,—"ভবানী! এতদিনে আজ আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। রাজস্ব পাঠান হইয়াছে, তাহা তো তুমি পূর্ব্বেই জানিয়াছ! আর একটী শুভ সংবাদ"—

ভবানীর প্রাণটা যেন কেমন করিয়া উঠিল।

রামকান্ত কহিলেন,—"আর একটা শুভ সংবাদ—নিষ্কণ্টকে রাজ্য-ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আমি স্থির করিয়াছি—তিন দিনের মধ্যে দেবীপ্রসাদ যদি নাটোর পরিত্যাগ করিয়া না যায়, আমি জোর করিয়া তাহাকে নাটোর হইতে বাহির করিয়া দিব।"

ভবানী, আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিলেন,—"সে কি! সে কি বলেন! এ পরামর্শ আপনাকে কে দিল? কৈ—এ কথা তো এতদিন আপনার মুখে শুনি নাই।"

রামকান্ত।—"ভবানী, দেবীপ্রসাদ আমায় বড় মনঃকষ্ট দিয়াছে। আমার সকল উদ্বেগের মূল—দেবীপ্রসাদ; সে যদি প্রতিবাদী না হ'ত; তা হ'লে খাজনার টাকা কি এত দিন অনাদায়ী থাক্‌তো? তা হ'লে কি নবাব-সরকারে টাকা পাঠাতে বিলম্ব ঘট্‌তো? তা হ'লে কি, শ্বশুর-মহাশয়কে আমার জন্য আপন সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে টাকার সঙ্কুলান ক'রে দিতে হ'ত? তা হ'লে কি নাটোরেও আমাকে নানারূপে ঋণগ্রস্ত হ'তে হ'ত?"

ভবানী।—"সব স্বীকার করি কিন্তু"—

রামকান্ত বাধা দিয়া বলিলেন,—"কিন্তু আর কেন ব'লছ?—আমি সব কাজ আজ শেষ ক'রে এসেছি। আমি আজই তাকে নগর থেকে দূর করে দিতাম, কিন্তু তা না ক'রে তাকে তিন দিনের সময় দিয়েছি। আপনা আপনি চ'লে যায়—ভালই; কোনও অত্যাচার হবে না। না যায়,—"

ভবানী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ভবানীকে বিষণ্ণ দেখিয়া, বাক্যস্রোত বন্ধ করিয়া, রামকান্ত জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি বিষণ্ণ হ'লে যে? যদি কিছু বলবার থাকে, আমায় স্পষ্ট ক'রেই বল-না কেন?"

আদেশ পাইয়াছেন; তথাপি সঙ্কুচিত-ভাবে ভবানী উত্তর দিলেন,—"আপনার কার্য্যের উপর আমার কথা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে। তথাপি প্রাণ ব্যাকুল হয়, আপনিও বলিতে বলেন, তাই বলিতে সাহসী হই। আপনি সত্যসত্যই কি তাঁকে কিছু ব'লে পাঠিয়েছেন? না—আপনার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে, তাই এরূপ বলিতেছেন।"

রামকান্ত।—"না ভবানী। কেবল মনের ভাব নয়, আমি সত্য-সত্যই বলিয়া পাঠাইয়াছি। আর, সত্যসত্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, তিন দিনের দিন তাহাকে নগর হইতে তাড়াইয়া দিব।"

ভবানী আর উদ্বেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কি যেন এক ভবিষ্যৎ বিপদ প্রত্যক্ষ করিয়া, আপনা-আপনিই তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল,—"হা ভগবন! এ আবার কি করিলে!"

রামকান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ভবানী! তবে কি আমি এ কাজ ভাল করি নাই?"

ভবানী।—"ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। কে জানি কি ভবিষ্যতের অমঙ্গল-চিত্র আমার চোকের উপর প্রতিভাত হইতেছে!"

রামকান্ত।—"ভবানী! নারীর প্রাণ একেই কোমল। তোমার প্রাণ কমল হইতেও কোমল। তাই তুমি প্রতিপদেই অমঙ্গল-আশঙ্কা কর। দেবীপ্রসাদ আমার শত্রু; সে অন্যায় করিয়া আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে চায়। আমি তাহাকে জব্দ করিব না?"

ভবানী।—"যতই হউন্, তিনি তো আপনার পিতৃব্যপুত্র; তাঁহারও তো সংস্থানের একটা উপায় চাই!"

রামকান্ত।—"তুমিও তা হলে দেখ ছি—দেবীপ্রসাদের পক্ষ!"

ভবানী নীরবে অধোমুখ হইয়া রহিলেন।

রামকান্ত তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাহা হউক, তুমি ভয় পাইতেছ কেন?"

ভবানী।—"আমি অজ্ঞান। আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝি না। তবে আমার আশঙ্কা—আমরা যেন ধর্ম্মপথভ্রষ্ট না হই।"

রামকান্ত।—"ইহাতে আর অধর্ম্ম কর কি হইয়াছে? বিষয়-সম্পত্তি রাখিতে গেলে এরূপ করিতে হয়।"

ভবানী—"আপনিই বলুন—অধর্ম্ম হইতেছে না। আপনার মুখে তাই শুনিলেই আমার পরিতৃপ্তি। তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত।"

রামকান্ত বিষম সমস্যায় পড়িলেন। এ আবার কি নূতন চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল? অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াও সে চিন্তা তিনি মন হইতে বিদূরিত করিতে পারিলেন না। একদিকে রাজস্ব-প্রেরণের আনন্দ, অন্যদিকে দেবীপ্রসাদের প্রতি দুর্ব্বাক-প্রয়োগ-নিবন্ধন উদ্বেগ,—সারারাত্রি রামকান্তের চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

খাজনা-লুট।

রজনি!—তুমি অনন্ত মূর্ত্তিধারিণী—তুমি অনন্ত কার্য্যকারিণী। কখনও তুমি প্রাণানন্দদায়িনী চন্দ্রমা-শালিনী মধুযামিনী—আবার কখনও তুমি ভুজঙ্গ-ভীষণ-ভয়প্রদায়িনী ঘনান্ধকারময়ী প্রকট নিশীথিনী! কখনও মন্দমন্দ-মলয়ানিলবাহিনী মল্লিকা-মালতী-যুথী-কু

কুসুমদলশোভিনী কোকিলকণ্ঠনিনাদিনী সুহাসিনী, আবার কখনও তুমি বিশ্বত্রাসিত-বিদ্যুচ্চকিত ঘনঘটাচ্ছন্ন স্ফুরিতানল-বজ্রবর্ষী ভীমা ভৈরবী। রজনী!—যখন তোমার অনন্ত-প্রসারী নীল বসনাঞ্চলে মণিমুক্তা-হীরকোজ্জ্বল নক্ষত্র-রত্নমালার অনন্ত চাকচিক্য নিরীক্ষণ করি, তখন মনে হয়—তুমিই একমাত্র শান্তি-প্রদায়িনী! কিন্তু আবার যখন দেখি—তোমার সেই কালস্বরূপিণী সংহারিণী করালিনী অন্ধকারময়ী মূর্ত্তি, তখন আতঙ্কে ও বিস্ময়ে হৃদয় অবসন্ন হয়। রজনি!—তুমি অনন্তকার্য্যকারিণী—সদসৎ অনন্ত কার্য্যের জনয়িত্রী। তোমার নীরব নিথর নিশীথে, স্তিমিতনেত্র ধ্যানমগ্ন যোগী, নীরবে ভগবৎসান্নিধ্যলাভ, পরমানন্দ লাভ করে;—প্রেমিক, প্রেম-বিভোরতায় বিভোর হইয়া পড়ে; আবার কুকর্ম্মী কদাচারী—তোমারই অঙ্কে মুখ লুকাইয়া কুকর্ম্ম-কদাচারে প্রশ্রয় পায়। তাই বলিতেছিলাম—শান্তি-অশান্তি, সুখ-দুঃখ, গৌরব-অগৌরব,—তুমি সদসৎ সকল কার্য্যেরই আশ্রয়-স্বরূপ; তুমি স্বপ্নময়ী!—তুমি হাসাইতেও পার, তুমি কাঁদাইতেও পার। সুখৈশ্বর্য্যপালিত সংসার-সংশয়শূন্য রামকান্ত তোমারই অঙ্কে শান্তিসুখে শায়িত ছিলেন, আবার তুমিই তাঁহাকে অভাবনীয় দুঃসংবাদ-দাবানলে দগ্ধ করিতে জাগরিত করিলে। রজনি! তোমার অনন্ত মহিমা!

নিশা-শেষে, স্বপ্নাবেশে, রামকান্ত চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু সে তো স্বপ্ন নহে!—সে যে সত্য ঘটনা! কত আয়াসে, কত কষ্টে, কত চেষ্টায়, নবাবের রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রামরূপের সঙ্গে, উপযুক্ত পাইক-বরকন্দাজ দিয়া, সেই টাকা সদরে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব!—বিগত সন্ধ্যার প্রাক্কালে, চলন-বিলের ধারে, দস্যু কর্ত্তৃক সেই টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে। রামরূপ খাজনার টাকা রক্ষার জন্য বহু চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে

চেষ্টা—সকলই বৃথা। তাহারা দস্যুদল, সাংঘাতিকরূপে তাঁহাকে আহত করিয়াছে। রক্ষিগণের কেহ বা নিহত কেহ বা বিতাড়িত হইয়াছে। এক্ষণে প্রভুর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া, রামরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় কাছা-রীতে পড়িয়া আছেন। সংবাদবাহক ভৃত্য সেই সংবাদ লইয়া রামকান্তের নিকট উপস্থিত।

ভৃত্যের ক্রন্দনে হঠাৎ আনন্দময়ী পুরী প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। তাহাতে রামকান্তের সুখশয্যা কণ্টকিত করিয়া তুলিল। রামকান্ত, নিদ্রাভঙ্গেই ব্যাকুল-হৃদয়ে, কক্ষ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। প্রভাতেই ভৃত্যের রুধিরাক্ত কলেবর সন্দর্শন করিয়াই তিনি সমস্তই উপলব্ধি করিলেন। ভৃত্য তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—"মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে! সর্ব্বস্ব গিয়েছে! আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিছুই রক্ষা করিতে পারি নাই।" এই বলিয়া, ভৃত্য একে একে আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বর্ণনা করিতে লাগিল।

ভৃত্য বলিতে লাগিল—"আর আধ কোশ পথ যেতে পারলেই আমরা পলাশডাঙ্গার কাছারীতে পৌঁছাতে পারতেম। সবে মাত্র সন্ধ্যা; ভয়ের কোনই কারণ আমাদের মনে স্থান পায় নাই। আগে আগে দশ জন ঢাল-সড়কিওয়ালা পাইক, তার পাছে পাঁচ জন করে ল্যাঙ্গা তলওয়ারওয়ালা বরকন্দাজ, মাঝখানে খাজনার মুটের সঙ্গে নায়েব মহাশয়ের পাল্কী, তার পাছে আবার আমরা প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন সর্দ্দার লেঠেল, তারপর বন্দুকধারী দশ জন সিপাই। বাঁওয়ের বাঁধটা পার হ'য়ে আমরা জোড়া বটতলার নীচের আল পথ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় বটগাছের উপর থেকে বাজ-পড়ার ন্যায় একটা শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে এমন হাঁক-ডাক উঠলো যে, শুনে আমরা চমকে উঠলাম। তাকিয়ে আর দেখবো কোন্ দিক্?—পিঁপড়ের

সাপের মত পিল-পিল ক'রে প্রায় আট দশ কুড়ি লোক আমাদের মাঝখানে এসে পড়লো। কোথা থেকে এলো, কি ক'রে এলো,—কিছুই আমরা বুঝতে পারলেম না। আমাদের লোকজন পঞ্চাশ হাত পেছিয়ে প'ড়লো। বরকন্দাজের দল ফিরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ওরা খাজনার মুটেগুলিকে ঘাল ক'রে ফেললো। নায়েব ম'শায় তখন পাল্কী থেকে লাফিয়ে প'ড়লেন; টাকার মোটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে চেয়ে, আমার নাম ক'রে ডাক দিয়ে উঠলেন। তাঁর গলার আওয়াজ শুনে, একদল লোকের কাঁধের উপর দিয়েই লাফিয়ে গিয়ে আমি তাঁর কাছে হাজির হ'লেম। কিন্তু বলতে বুক ফেটে যায়: আমিও তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছিলাম; আর অমনি ডাকাতেরা তাঁর পেটের ভিতর বর্শা বসিয়ে দিল। তিনি তো অজ্ঞান হ'য়ে শুয়ে পড়লেন। তার পর, আর কার কি হ'লো,—আমি দেখবার আর অবসর পেলেম না। নায়েব ম'শায়ের পানে তাকাতে তাকাতেই যেন নিমিষের মধ্যে ডাকাতেরা সব লুটে নিয়ে পালালো। সঙ্গে সঙ্গে, তাদেরও যে ২৫।৩০ টা ঘাল হ'য়েছিল, সে মড়া-কটাকেও সরিয়ে ফেললো। একটা লোককে যেন চেনা-চেনা বোধ হ'লো। কিন্তু তখন আর ক'রব কি?—উপায় নেই। নায়েব ম'শায় ঘোর অচৈতন্য—চোখ চাইতেও পারলেন না। আমি চেয়ে দেখলাম—সামনে তিন চারি জন পাইক ম'রে পড়ে রয়েছে; রক্ত গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি সামনের বিল থেকে কাপড় ভিজিয়ে জল এনে নায়েব ম'শায়ের মুখে দিলাম। তিনি যেন কি ব'লতে গেলেন; কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না; ইসারায় বুঝতে পারলাম যে, বাড়ী এসে আপনাকে খবর দিতে বললেন। তার পর, চার পাঁচ জনে ধরাধরি ক'রে তাঁকে কাছারীতে পৌঁছে

দিয়ে, লাশগুলোর বন্দোবস্ত ক'রতে বলে, আমি ছুটতে ছুটতে চলে আস্‌ছি।" এই বলিয়া, ভৃত্য মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

রামকান্ত স্তম্ভিতের ন্যায় কথাগুলি একে একে শ্রবণ করিলেন। হতাশে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে—তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। দুশ্চিন্তা-বৃশ্চিকের তীব্রদংশনে তাঁহার কুসুম-সুকুমার প্রাণ ছিন্ন হইতে লাগিল। যখন তিনি শুনিলেন—তাঁহার বহুযত্নসংগৃহীত রাজস্বের টাকা দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে, তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল। যখন তিনি বুঝিলেন,—নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে সেই টাকা সংগ্রহের আর কোন উপায় নাই; তখন তিনি চারিদিকেই অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যখন তিনি শুনিলেন,—তাঁহার বিশ্বস্ত নায়েব রামরূপ আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, টাকা রক্ষা করিতে গিয়া দস্যু কর্ত্তৃক সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন,—তখন আর তাঁহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। যখন তিনি শুনিলেন,—তাঁহার প্রভুপরায়ণ ভৃত্যগণ তাঁহার খাজনার টাকা আটকাইতে গিয়া একে একে দস্যুহস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে,—তখন তিনি একেবারে অবসন্ন হইলেন।

কখনও মনে হইল,—"হায়! ফুৎকারে সব উড়িয়া গেল!" কখনও মনে হইল,—"হায়! আমি না মরিয়া কেন তাহারা মরিল?" কখনও মনে হইল,—"আবার সব হইতে পারে; কিন্তু রামরূপকে যদি হারাই, আর কি তেমন পাইব!"

অবশেষে সে স্থান হইতে সরিয়া গিয়া, মনের আবেগে একবার রামকান্ত আকাশের পানে চাহিলেন। দেখিলেন,—প্রভাতপ্রায়া শর্ব্বরী তাঁহার প্রতি প্রসন্না নহেন। দেখিলেন,—তারাদল আকাশ শূন্য করিয়া—নৈশ শোভা অপহরণ করিয়া, একে একে পলায়ন করিতেছে, দেখিলেন,—হাস্যময় শশধর; ম্লানমুখে মেঘান্তরালে লুক্কা-

য়িত হইতেছেন। তাঁহারও হৃদয়াকাশ শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি কাতরপ্রাণে ঊর্দ্ধনয়নে একবার ভগবানের প্রতি চাহিলেন; কারুণ্যকণ্ঠে ডাকিলেন,—"ভগবন্! আমায় এ কি করিলে!"

রাণী ভবানী।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চক্র-পরিবর্ত্তন।

অদৃষ্টচক্র পরিবর্ত্তনশীল। কাল যিনি রাজেশ্বর ছিলেন; আজ তিনি পথের ভিখারী। আর, কাল যে পথের ভিখারী ছিল, আজ সে রাজচক্রবর্ত্তী। বিধাতার কি বিচিত্র বিধান!

যে রামকান্ত তিন দিন পরে দেবীপ্রসাদকে নাটোর হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া দম্ভপ্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই তিন দিন পরেই, নবাবের ফৌজ আসিয়া তাঁহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল, দেবীপ্রসাদ নাটোরের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিলেন। কর্ম্মফলই বল, আর অদৃষ্টই বল,—ক্ষণস্থায়ী মনুষ্য-জীবনের অতি-ক্ষণস্থায়িত্ব তিন দিনের মধ্যেই তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল।

পুনঃপুন নবাবের তাগিদ সত্বেও রামকান্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা দিতে পারিলেন না; অথচ, দেবীপ্রসাদের পক্ষ গোপনে

গোপনে উৎকোচদানে নবাবের কর্ম্মচারিবর্গকে হস্তগত করিল। নবাবকে বুঝাইল,—"দেবীপ্রসাদই নাটোর-রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তিনি রাজা রামজীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র।" ষড়যন্ত্রকারিগণ নবাবের নিকট আরও জানাইল,—"রামকান্ত নামক একজন দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি, বঙ্গসিংহাসনসংক্রান্ত গোলযোগের সুবিধা বুঝিয়া, নাটোর দখল করিয়া বসিয়াছে। সে নবাবকে মানিতে সম্মত নয়।" ষড়যন্ত্রকারীরা আপনাদের কথার প্রমাণজন্য নবাব-সরকারে দয়ারামের নাম উল্লেখ করিল। নবাবকে জানাইল,—"দেবীপ্রসাদ সত্য সত্যই রামজীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না, দয়ারাম রায়ের নিকট সন্ধান লইয়াই তাহার সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন।"

এক দিকে রাজস্ব না পাওয়া, অন্য দিকে দেবীপ্রসাদের পক্ষের অনুযোগ অভিযোগ, সর্ব্বোপরি নবাবের অর্থের প্রয়োজন ;—সুতরাং অচিরে সব কাজ শেষ হইয়া গেল, রামকান্তের পরিবর্ত্তে দেবীপ্রসাদ নাটোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

একদিকে নাটোর-রাজধানীতে অভিষেক-উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। অন্যদিকে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে ভবানী ও রামকান্ত রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু রামকান্ত কোথায় যাইবেন? তাঁহার বিপদের সংবাদ পাইয়া ভবানীর মাতুল-পুত্র চন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে নাটোরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন,—"অন্য কোথায় যাওয়ার এখন আর প্রয়োজন নাই। এখন মুর্শিদাবাদ গিয়া, নবাবের দরবারে বিশেষরূপ তদ্বির করা আবশ্যক। সেখানে জগৎশেঠের যদি সাহায্য পাওয়া যায়, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া অন্যত্র কোথাও যাওয়া শ্রেয়ঃ নহে।"

প্রথমে কথা হইয়াছিল, ভবানীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া, চন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামকান্ত একাকীই মুর্শিদাবাদ যাইবেন। কিন্তু ভবানী তাহাতে আপত্তি করিলেন; বুঝাইয়া বলিলেন,—"তিনি সঙ্গে না থাকিলে, স্বামীর সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি হইতে পারে!" সুতরাং চন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাতে সম্মতি দিলেন। নাটোর পরিত্যাগ করিয়া, মুর্শিদাবাদ গিয়া তাঁহারা এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দয়ারামেরও সন্ধান লইতে লাগিলেন। যদিও দুষ্ট লোকে রাষ্ট্র করিয়াছিল,—দয়ারামই এই ষড়যন্ত্রের মূল; কিন্তু ভবানী তাহা বিশ্বাস করেন নাই। তাই তিনি দয়ারামের সন্ধান লইবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত দয়া-রামের কোন সন্ধান মিলিল না, নবাব-দরবারে তদ্বিরেরও কোনও সুবিধা ঘটিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হাহাকার।

যেদিন রাজা রামকান্ত ও ভবানী নাটোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেদিন নাটোরের অধিবাসী অনেকেরই চক্ষে অশ্রু সঞ্চার হইয়াছিল। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, সে অশ্রুর নিবৃত্তি হইল না; তাঁহারা চলিয়া গেলে, সেই হইতেই লোক বলিতেছে— "অযোধ্যাপুরী শূন্য হইল; রাম সীতা যেদিন বনগমন করেন,— সেদিন হইতে অযোধ্যার যে অবস্থা হইয়াছিল, নাটোর রাজধানীরও এখন সেই অবস্থা!" রামকান্তের জন্য যত না হউক, ভবানীর জন্য

প্রাণ কাঁদে নাই,—নাটোরে এমন লোক বিরল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যে বেণীভূষণ সকল চক্রান্তের মূলীভূত, ভবানীর বিদায়ের দৃশ্য দেখিয়া সেদিন তিনিও অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই; রাজ্যৈশ্বর্য্যের অধিকার-লাভে যে দেবীপ্রসাদের আনন্দের অবধি ছিল না, ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া সেদিন তাঁহাকেও বলিতে শুনা গিয়াছিল—"নাটোরের রাজলক্ষ্মী আজ চলিয়া গেলেন!"

দেবীপ্রসাদের অভিষেক-উৎসবের দিন নগরী উৎসাহশূন্য—বিষাদপূর্ণ। পথে ঘাটে, গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে—সর্ব্বত্রই সেই একই কথা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ দেবীপ্রসাদের অভিষেকের বিদায় লইয়া ফিরিতেছেন; তাঁহারাও বলাবলি করিতেছেন,—"মা যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছিলেন!" কর্ম্মচারিগণ বলাবলি করিতেছে,—"এ রাজ্যের সুখ-সৌভাগ্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে!"

বিন্দুঠাকুরাণী বলিতেছেন,—"মায়ের কথাগুলি যেন অমৃত বর্ষণ ক'রত। সে মধুর বাক্য শ্রবণ করিলে পুত্রশোক নিবারণ হইত।"

মৈত্রগৃহিণী বলিতেছেন,—"এখন সংসার চ'লবে কি ক'রে, সেই ভাবনাই বিষম ভাবনা হ'য়েছে! আমি যখনই গিয়ে যে অভাব জানিয়েছি, যে জিনিষটী চেয়েছি,—ভবানী কখনও দ্বিরুক্তিটী করেন নাই,—কখনও তাঁকে মুখ ব্যাজার করিতে দেখি নাই! যখনই যা চেয়েছি, হাসি-হাসি মুখে আহ্লাদ-সহকারে প্রদান করিয়াছেন। পাছে লজ্জিত হই, এজন্য আবার বলিয়াছেন,—"মা! আমি আপনাদের পর নই। আপনাদের যখন যা দরকার হবে, আমাকে এসে জানাবেন, আমি সাধ্যমতে অভাব মোচনের চেষ্টা পাইব। হায়! তেমন কথা আর কাহার মুখে শুনিব? কৃষাণেরা

মাঠের কাজ সারিয়া বাটী যাইতেছে, তাহারা বলাবলি করিতেছে,—"লক্ষ্মী চ'লে গিয়েছে, মাঠও তাই শুকিয়ে আসছে। যে ভুঁয়ে বিশ সলুই ধান পাবার আশা ছিল, এবার দশ কাঠা ধান পাই কিনা তাও সন্দেহ। এতে রাজার খাজনাই বা দেবো কি ক'রে, আর খাবোই বা কি? এ রাজার আর ভরসা নেই; লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গেই সব চলে গিয়েছে।"

নিমু মদনদাসের স্ত্রী, তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর, সাবিত্রী অপোগণ্ড শিশু লইয়া, ভবানীর অনুগ্রহের উপর সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত; কি প্রকারে তাহার সংসার চলিত,—লোকে কেহই জানিতে পারিত না। রাণী ভবানী চলিয়া যাওয়ার পর, সে প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই, ভবানীর শত্রুদের উদ্দেশে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিয়াছে; প্রত্যহই ধর্ম্মকে ডাকিয়া বলিতেছে,—"আমার ভাতে যারা ছাই দিয়েছে, হে ধর্ম্ম! তুমি যদি সত্য হও, তাদের ভাতে ছাই পড়ুক।"

যতই দিন যাইতেছে, ভবানীর গুণের কথা লোকের মনে ততই জাগিয়া উঠিতেছে। যতদিন তিনি নাটোরে ছিলেন, কোনই উচ্চ বাচ্য শোনা যায় নাই। তিনি যাহাকে যাহা সাহায্য করিতেন, যাহার যাহা উপকার করিতেন,—সকলকেই তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিতেন। তাঁহার অনুরোধ কেহই উপেক্ষা করিতে পারিত না। কাজেই যত দিন ভবানী নাটোরে ছিলেন, তাঁহার অনুগ্রহে কাহারও কোন অভাবও হয় নাই এবং সে অভাব দূরীকরণে তাঁহার চেষ্টার কথা লইয়া কোনও আন্দোলনও হয় নাই; নীরবে ভবানী আপন কার্য্য করিয়া যাইতেন, নীরবে লোকে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত; কিন্তু এখন সকলে হাহাকার করিয়া কহিতেছে,—"হায় হায়! তেমন লক্ষ্মীর কেন এমন হইল!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিধিলিপি।

বর্ষায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। পদ্মার জল উচ্ছলিয়া উঠিয়াছে। এক পার হইতে অপর পারে দৃষ্টি চলিতেছে না। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতেছে। কলকল জলস্রোত সতত মিলিত হইয়া অষ্ট-প্রহরব্যাপী গম্ভীর মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতেছে। কোথাও কোন বন্দরের নিকট অথবা কোথাও কোনও উচ্চস্থানে দ্বীপের ন্যায় ভূমিখণ্ড দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তদ্ভিন্ন, চারিদিকেই যেন অনন্ত জল-রাশি বিস্তৃত হইয়া আছে।

বর্ষার এই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সময়, বিল-খাল পার হইয়া, নৌকাখানি পদ্মার উপরে ভাসমান হইল। মাঝিরা 'বদর' 'বদর' বলিয়া জলদেবতার উদ্দেশে অভিবাদন জানাইল, আরোহীরা দুর্গা-নাম জপ করিতে লাগিলেন।

এই ভীষণ জলপ্লাবনের দিনে, পদ্মার উপরে নৌকারোহণে কে আরোহী, কোথায় যাত্রা করিয়াছেন? পদ্মার প্রবল স্রোতে নৌকা যেরূপ ঘূর্ণমান, অকূলে পড়িয়া আরোহীরা যেরূপ সঙ্কটাপন্ন, কে বল,—তাহাদের পরিচয় দিবে? নৌকা কূলে না পৌঁছিলে, নৌকায় কে আছে দেখিতে না পাইলে, কেমন করিয়াই বা জানিতে পারা যাইবে—কে তাহারা?

সারাদিন তরঙ্গভঙ্গে আহত লাঞ্ছিত হইয়া তৃতীয় প্রহরের সময় নৌকা বদরগঞ্জের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। পদ্মার পারে, এ অঞ্চলে, নৌকা চালাইতে হইলে, বদরগঞ্জের পর এক দিনের পথ, কোথাও কোনও দোকান পাট মিলিবে না। সুতরাং এখানে নৌকা নঙ্গোর করা হইল।

ঘাটের ধারে নৌকা বাঁধিয়া মাঝিরা গঞ্জের ভিতর বাজার করিতে গেল। আরোহীদেরও দুইজন তাহাদের অনুসরণ করিল। নৌকায় রহিল,—মাঝিদের একটী বালক; আর রহিলেন,—যিনি নৌকা ভাড়া করিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার একজন সরকার। আরোহী স্নানাহ্নিকের জন্য প্রস্তুত হইলেন, সরকার তাহার যোগাড়যন্ত্র করিয়া দিল।

কে এ আরোহী? এ আরোহী—অপর কেহ নহেন—আত্মারাম চৌধুরী! আত্মারাম চৌধুরী—মুর্শিদাবাদ চলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে একজন চাকর, একজন ব্রাহ্মণ, আর তাঁহার সরকার কৃত্তিবাস। মন বড়ই উদ্বিগ্ন, বিলম্ব করিতে মন প্রবোধ মানে না; তাই এ দারুণ বন্যার দিনেও তাঁহাকে যাইতে হইতেছে।

তিনি শুনিয়াছেন,—তাঁহার জামাতা রাজা রামকান্ত রায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন,—তিনি যে টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, সে টাকা লুঠ হইয়া গিয়াছে। তিনি শুনিয়াছেন,—নবাব আলিবর্দ্দী রাজা রামকান্তের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া, তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা দেবীপ্রসাদকে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন,—তাঁহার বড় আদরের কন্যা ভবানী ও জামাতা রামকান্ত আশ্রয়হীন ও সহায়হীন হইয়া, নবাবের নিকট আবেদন করিতে গিয়াছেন। তিনি আরও শুনিয়াছেন,—নবাব যদি কোনও বিবেচনা না করেন, যদি কোনও প্রতিকার উপায় বিহিত না হয়; তাহা হইলে কন্যা ও জামাতা কাহাকেও আর মুখ দেখাইবেন না!

এই সংবাদ শুনিয়া অবধি আত্মারাম চৌধুরীর প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কস্তূরী দেবী দিনরাত্রি কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কন্যা ও জামাতার তত্ত্ব লইবার জন্য এই দারুণ বন্যার দিনেও স্বামীকে মুর্শিদাবাদ পাঠাইতে সঙ্কুচিত হন নাই। মাঝিদিগকে দ্বিগুণ বেতন প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া, দিনরাত্রি নৌকা চালাইয়া

..ত্মারাম চৌধুরী তাই মুর্শিদাবাদ রওনা হইয়াছেন। মন মুর্শিদাবাদ পৌঁছিয়াছে; কিন্তু দেহ তখনও পৌঁছিতে পারে নাই। তাই তিনি ...তই মাঝিদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। নিতান্ত জিনিষ-পত্র ... কিনিলে নয়; নহিলে, বদরগঞ্জে নৌকা লাগাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

আত্মারাম চৌধুরী, নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া, অল্প একটু ...র গিয়া, অবগাহনানন্তর গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া পূজাহ্নিক করিতেছেন। নেত্রদ্বয় নিমীলিত, করে উপবীত, শরীর নিশ্চল নিস্পন্দ,—চিত্ত ...পমগ্ন। বেলা অপরাহ্ণ হওয়ায়, স্নানঘাটে একমাত্র তিনিই এখন ...ন করিতে নামিয়াছেন, সরকার কৃত্তিবাস,—নৌকার উপর বসিয়া ...র প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে!

চৌধুরী মহাশয় প্রায় আধঘণ্টা কাল জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ...ছেন; পূজাহ্নিক প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; এমন সময় কৃত্তিবাস ...তে পাইল,—একটা হাঙ্গর, মুখব্যাদান করিয়া, চৌধুরী মহাশয়ের ...কে অগ্রসর হইতেছে। বুঝিল,—হাঙ্গরের গ্রাস হইতে কর্তার ...র অব্যাহতি নাই। উপায়? কিন্তু উপায় উদ্ভাবনের আর সময় ...ল। কৃত্তিবাস অবিলম্বে নৌকা হইতে ঝম্প প্রদানে হাঙ্গর ও ...র মাঝখানে পতিত হইল। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল,—তাহাকে ...রে পাইলে তাহাকে গ্রাস করিয়াই হাঙ্গর পরিতৃপ্ত হইবে; ...র অন্নদাতা প্রভুর প্রতি আর ধাবিত হইবে না। তাই সে ...লমাত্র 'হাঙ্গর'—এই কথা উচ্চারণ করিয়াই জলে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল।

কৃত্তিবাসের বিকট চীৎকারে এবং জলমধ্যে ঝম্পপ্রদান শব্দে ...ধুরী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন! তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। নৌকার ...র মাঝিদের যে বালকটী ছিল, চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল,

—"কর্ত্তা মহাশয়! সাবধান! আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে আপনার সরকার হাঙ্গরের মুখে প্রাণ দিলেন।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে এই ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে চৌধুরী মহাশয় জল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে কৃত্তিবাস অদৃশ্য হইল!

যাহারা গঞ্জের ভিতর বাজার করিতে গিয়াছিল, তাহারাও ফিরিয়া আসিল। কৃত্তিবাসের কথা যে শুনিল; সেই চমকিয়া উঠিল।

চৌধুরী মহাশয়, মাঝিদিগকে কহিলেন,—"তোমরা যত টাকা চাও আমি দিতে প্রস্তুত আছি; কৃত্তিবাসকে খুঁজিয়া বাহির কর।"

মাঝিরা নৌকা লইয়া জলের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া, কৃত্তিবাসের সন্ধান লইতে লাগিল। কিন্তু কৃত্তিবাসকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। চৌধুরী মহাশয় প্রথমে গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, শেষে ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমাকে না লইয়া হাঙ্গর কেন তাহাকে লইল?" এই বলিয়া এক একবার তিনি জলে ঝাঁপ দিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। মাঝি এবং তাঁহার নফর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিল।

চৌধুরী মহাশয়ের তখন কত কথাই মনে হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল,—কত অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া তিনি কৃত্তিবাসকে বিদায় দিতে চাহিয়াছিলেন। মনে হইতে লাগিল,—কৃত্তিবাসের জন্য ভবানী কেমন ছলছলনেত্রে আসিয়া তাঁহার নিকট অনুরোধ করিয়াছিল। মনে হইতে লাগিল,—ভবানীর মুখ দেখিয়া তিনি কৃত্তিবাসকে রাখিবার মানস করিয়াছিলেন। মনে হইতে লাগিল,—রক্ষিত [illegible] পর্য্যন্ত কৃত্তিবাস তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই।

...ন হইতে লাগিল—অল্পদিন পূর্ব্বেই কৃত্তিবাস কেমন সুস্থ ... কর্ম্মঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতে লাগিল,—ভবানী কি তবে ভাবষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াই পরিত্যক্ত একখানা বৃদ্ধ ভৃত্যের বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিল। যতই সেই সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল, ততই প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি এক একবার সকলের হাত ছাড়াইয়া জলে লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন। তিনি এক একবার চীৎকার করিয়া "কৃত্তিবাস! কৃত্তিবাস!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; একে কন্যা জামাতার বিপদের সংবাদ, তাহার উপর তাঁহাকে রক্ষার জন্য তাঁহার প্রভু-পরায়ণ ভৃত্যের প্রাণদান—চৌধুরী মহাশয় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অধিকতর অনুশোচনা উপস্থিত হইল,—যে ভৃত্য তাঁহার জন্য প্রাণদান করিল, তিনি তাহাকেই বিদায় দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই ঘাটে কৃত্তিবাসের অনুসন্ধান চলিল। সারাদিন কাহারও জলগ্রহণ করিবার অবসর হইল না। বাজার হইতে জিনিস-পত্র যাহা ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছিল, সমস্তই নৌকার উপর পড়িয়া রহিল। চৌধুরী মহাশয়ের ব্যাকুলতায় মাঝিরা পর্য্যন্ত আহারের উদ্যোগ করিতে পারিল না।

আত্মারাম চৌধুরীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া, বদরগঞ্জের ঘাটে বহুলোক জমিয়া গিয়াছিল। অনেকেই চৌধুরী মহাশয়ের সহিত শোকপ্রকাশ করিতেছিল; আবার অনেকেই সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কিছুতেই আত্মারাম চৌধুরী শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

সন্ধ্যা হয় হয়;—এমন সময় এক ব্রাহ্মণ সেই ঘাটের ধারে উপস্থিত হইলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ যাইবার জন্য চলতি নৌকা খুঁজিতেছিলেন। আত্মারাম চৌধুরীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া ঘাটের

অন্যান্য লোকের ন্যায়, তিনিও সেই নৌকার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থি
হইলেন। দেখিলেন—আত্মারাম চৌধুরী 'হা-হুতাশ' করিতেছেন
চৌধুরী মহাশয়ের সহিত তাঁহার অনেক দিনের পরিচয়। চৌধুর
মহাশয়কে সে ভাবে আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া, তিনি আপন
আপনিই নৌকার উপর উঠিলেন।

চৌধুরী মহাশয়ের সমস্ত অবস্থাই তিনি অবগত ছিলেন। তাঁহা
জামাতা ও কন্যার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের বিষয়—কিছুই তাঁহার অবিদি
ছিল না। অপিচ, চৌধুরী মহাশয় যে কন্যা-জামাতার তত্ত্ব লইবা
জন্য মুর্শিদাবাদ চলিয়াছেন, মাঝিদের নিকট সে সংবাদও তি
শুনিয়াছিলেন।

নৌকায় উঠিয়া, চৌধুরী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া তিনি বলি
লাগিলেন—"মানুষের যখন বিপদ্ আসে, এই রকমই হয়। আ
বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ, আপনি অনেক দেখিয়াছেন—অনেক শুনিয়াছেন-
অনেক সহ্য করিয়াছেন, আপনাকে আমি আর বেশী কি বলিব
আপনি যদি এরূপ অস্থির হন, আপনার সেই কিশোর কিশো
কন্যা-জামাতার অবস্থা কি হইবে?"

ব্রাহ্মণের কথায় চৌধুরী মহাশয়ের যেন চমক ভাঙ্গিল। তি
চাহিয়া দেখিলেন—চণ্ডীদাস শিরোমণি মহাশয় নৌকায় উপস্থি
কিন্তু এ কি!—তাঁহার সে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ প্রদীপ্ত মূর্ত্তি এখন
কোথায়? কয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার এত পরিবর্ত্তন কেন হইল?
তাঁহাকে দেখিয়া, চৌধুরী মহাশয় প্রথমে তাই চিনিতে পারেন নাই।
তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, নমস্কার করিয়া, তই
জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি হঠাৎ এখানে কোথা হইতে
আসিলেন? আপনার এ অবস্থা কেন?" জিজ্ঞাসা করিয়াই তি
আপনা-আপনিই উদ্বেগ-আবেগে কহিতে লাগিলেন,—"শিরোম

মহাশয়। আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" এই শিরোমণি মহাশয়ই নাটোর হইতে ভবানীর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া ছাতিমগ্রামে গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া শোকাবেগ আরও যেন বাড়িয়া উঠিল।

শিরোমণি মহাশয় সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন,—"আপনি উতলা হইতেছেন কেন? আপনার কন্যা-জামাতার যে অবস্থা, তাহাতে আপনার অধৈর্য্য হওয়া উচিত নহে।"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন,—"আপনি বলিতেছেন বটে; কিন্তু মন প্রবোধ মানে কৈ? বিপদের উপর বিপদ্ আসিয়াছে; কত সহ্য করিতে পারি?"

শিরোমণি মহাশয় উত্তর দিলেন,—"সহ্য না করিলেই বা উপায় কি? এ সংসারে ভাল-মন্দ দুই দিকেরই সীমা পাওয়া যায় না। ভাবিতে গেলে—সুখেরও সীমা দেখিতে পাই না; আর ভাবিতে গেলে—দুঃখেরও সীমা দেখিতে পাই না।"

চৌধুরী মহাশয়।—তা' বটে! কিন্তু আর যে সহ্য হয় না!

শিরোমণি মহাশয়।—"বলিতেছেন বটে। কিন্তু তুলনায় আর কতটুকু সহ্য করিয়াছেন? যদি আমার ইতিহাস শোনেন, মনে হবে—আপনার এ বিপদ্ কিছুই নয়।"

এই বলিয়া, শিরোমণি মহাশয় আপন কাহিনী কহিতে লাগিলেন;—"আমার একটী মাত্র পুত্র ছিল। অনেক দেবতার আরাধনা করিয়া শেষ বয়সে সেই পুত্রসন্তান লাভ হয়। অনেক কষ্টে তাহাকে ষোল বৎসরের করিয়া তুলিয়াছিলাম। এই শ্রাবণ মাসের ৫ই তারিখে তাহার বিবাহ দিই। মানসিক ছিল, বিবাহের পর সপ্তাহ মধ্যে, আমরা সস্ত্রীক, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া, ভাবদার পীঠস্থানে গিয়া ভবানীর পূজা করিয়া আসিব। পূজা দিয়া ফিরিয়া আসিতেছি,

আনন্দের অবধি নাই। সারাপথ কোথাও কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই। কিন্তু বাড়ীর কাছে আসিয়া, নৌকায় করিয়া যখন পদ্মা পার হই, হঠাৎ একটা বাতাস উঠিল! পাল-ভরে নৌকা চলিতেছিল; এক বাতাসেই নৌকা উল্টাইয়া গেল। ইষ্টনাম উচ্চারণেরও সময় পাইলাম না। নিমেষের মধ্যে সব শেষ হইল। পুত্র, পুত্রবধূ, স্ত্রী—সংসারে আমার যে কেহ ছিল, পদ্মার জলে তলাইয়া গেল। কাহাকেও আর উঠিতে হইল না; কাহাকেও আর দেখিতে পাইলাম না। দ্বিপ্রহরে এই নৌকাডুবি হয়; সন্ধ্যার প্রাক্কালে, ভাসিতে ভাসিতে, আমি অজ্ঞান অবস্থায় উজানের চড়ায় আটকাইয়া যাই। কি অবস্থায়, কি ভাবে, এই দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছিল, কিছুই আমার মনে নাই। সংজ্ঞা হইলে দেখিলাম—এক গৃহস্থের বাড়ীতে মাদুরের উপর পড়িয়া আছি; গৃহস্থ আমার শুশ্রূষা করিতেছে। এইরূপে এক দণ্ডের মধ্যে আমার সব হারাইয়াছে। এখন আর আমার আপনার বলিতে সংসারে কেহ নাই।"

বলিতে বলিতে শিরোমণি মহাশয়ের চক্ষু ছলছল হইয়া আসিল। ব্রাহ্মণ সে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—"আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই শোকে মুহ্যমান ছিলাম,—পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তারপর আপনা-আপনিই আমার মনে হইল,—বৃথা শোক করিয়া ফল কি? যাহারা গিয়াছে, তাহারা আর তো ফিরিয়া আসিবে না! এই ভাবিয়া এখন মনকে প্রবোধ দিয়াছি। প্রবোধ না দিলে ত আর উপায় নাই, তাই প্রবোধ দিয়াছি। বিধাতার লিখন—অদৃষ্টের ফল—আপনিই সংঘটিত হইবে। কে সে গতি রোধ করিতে পারে?"

চণ্ডীদাস শিরোমণি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, আত্মারাম চৌধুরীও দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

আপন বিপদের সময় অপরের গুরুতর বিপদের কাহিনী শুনিলে স্বতই সান্ত্বনা আসে। শিরোমণি মহাশয়ের কথায় চৌধুরী মহাশয়ের যেন কতকটা সান্ত্বনা হইল। তিনি মুর্শিদাবাদে যাইবার জন্য নৌকা খুঁজিতেছেন শুনিয়া, আত্মারাম চৌধুরী তাঁহাকে আপনার নৌকাতে আপনার সঙ্গে লইলেন। কথাবার্ত্তায় সান্ত্বনা পাইয়া, চৌধুরী মহাশয় নৌকা ছাড়িতে আদেশ দিলেন। নৌকা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওনা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্যপথে।

চণ্ডীদাস শিরোমণি মহাশয়কে সঙ্গী পাইয়া, চৌধুরী মহাশয়ের অনেকটা সান্ত্বনা হইল। কথাবার্ত্তায় কতকটা আশা ভরসাও পাইতে লাগিলেন।

কথায় কথায় শিরোমণি মহাশয় কহিলেন,—"আপনি মুর্শিদাবাদ যাইবার সংকল্প করিলেন বটে; কিন্তু সেখানে গিয়াই বা কি ফল হইবে? নবাব-সরকারে আপনার এমন বন্ধু কে আছেন, যিনি আপনার জামাতার পক্ষে দুই কথা কহিতে পারেন।"

চৌধুরী মহাশয়। "সে কথা ঠিক বটে। আমি যে মুর্শিদাবাদে গিয়া কন্যা-জামাতার কি উপকার করিতে পারিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে মন বুঝে না, তাই একবার দেখিতে চলিয়াছি।"

শিরোমণি মহাশয়।—"শুধু দেখিতে গিয়াই বা কি হইবে? যদি

তাহাদের কোনও কাজ করিতে পারিতেন, বুঝিতাম, আপনার যাওয়া সার্থক।"

চৌধুরী মহাশয়।—"আমার দ্বারা কি হইতে পারে? অর্থবল, লোকবল,—আমার আর কোন বল নাই। আমি কি চেষ্টা করিতে পারি?"

শিরোমণি মহাশয় উত্তরে কহিলেন,—"আপনি যে একেবারে কোনই কাজ করিতে পারেন না, তাহা আমার মনে হয় না। আমার বোধ হয়, মুর্শিদাবাদ না গিয়া আপনি যদি অন্য চেষ্টা করিতেন, অনেকটা সুফল লাভের আশা ছিল।"

চৌধুরী মহাশয় সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"আমি কি চেষ্টা করিতে পারি? যদি আমার প্রাণ দিলে তাহাদের মঙ্গল হয়, আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি। সত্য বটে, যদি কোনও উপায় থাকে এবং সে উপায় আপনি যদি জানেন, আমায় বলুন, আমি স্বতঃপরতঃ তাহাতে প্রস্তুত আছি।"

শিরোমণি মহাশয়—"আমি এ বিষয়ে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি! উপায় নাই বলিয়াই আমারও বিশ্বাস বটে। তবে একটা চেষ্টা—"

এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয় ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। কি যেন কি ভাবনায় তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইল।

চৌধুরী মহাশয় তাহাতে অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। শিরোমণি মহাশয়ের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চৌধুরী মহাশয় কহিলেন,—"কি চেষ্টা? কি চেষ্টা করিতে হইবে, খোলসা করিয়াই বলুন না? এখন আর কোনও বিষয়ে সঙ্কুচিত হইবার বা সঙ্কোচ বোধ করিবার সময় নাই।"

শিরোমণি মহাশয় কহিলেন,—"একটু সঙ্কোচ বোধ হইবার কথা

বটে; কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে, সঙ্কোচ বোধ হইবার কোনই কারণ দেখি না!"

চৌধুরী মহাশয় উত্তর দিলেন,—"সঙ্কোচ বোধ হইবার কারণ থাকিলেও, আমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ-বোধ করিব না। আপনি অণুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, আমায় বলুন,—কি করিতে হইবে!"

শিরোমণি মহাশয়।—"আমার মনে হয়, যদি দয়ারাম রায়কে হস্তগত করিতে পারেন, কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে।"

দয়ারাম রায়ের নাম শুনিয়াই চৌধুরী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—"ব্রাহ্মণ এ আবার কি কথা বলে! আবার সেই পাষণ্ডের নাম! দয়ারাম রায়কে হস্তগত করিতে হইবে!" প্রকাশ্যে উত্তর দিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, দয়ারাম রায়ই এই সর্ব্বনাশের মূল; আমি শুনিয়াছি,—তাঁহারই চক্রান্তে আমার জামাতা আজ পথের ভিখারী।"

শিরোমণি মহাশয়।—"আমি সেই জন্যই তো বলিতে সঙ্কোচ-বোধ করিতেছিলাম। তবে একটা কথা, আপনি বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না, দয়ারাম রায়ের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত। এ চক্রান্তের মূলে দয়ারাম রায় কখনই সংশ্লিষ্ট নহেন।"

চৌধুরী মহাশয়।—"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?—দয়ারাম রায় রাজসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পর, একে একে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে—রটনারও অবধি নাই; তবে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব,—দয়ারাম রায় এ ব্যাপারে লিপ্ত নহেন!"

শিরোমণি মহাশয়।—"সে বিশ্বাস কিসে হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে দয়ারাম রায় নাটোর হইতে চলিয়া আসার পর দুই তিনবার তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাতে

আমি যাহা বুঝিয়াছি, দয়ারাম রায়কে কোনও বিষয়ে দোষী করিতে ইচ্ছা হয় না। দয়ারাম রায় আপনার কন্যা ভবানীকে জননীর ন্যায় সম্মান করেন। রামকান্তের প্রতিও তাঁহার স্নেহানুরাগ অপরিসীম। আপনাকে তিনি প্রগাঢ় ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন।”

চৌধুরী মহাশয়।—“আগে তাই মনে করিতাম বটে। কিন্তু এখন আর তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি তাহারই চক্রান্ত না হইবে, নাটোর ত্যাগ করিয়াই সে কেন মুর্শিদাবাদ গিয়া বিপক্ষ-পক্ষে যোগদান করিবে? সে যদি সত্যসত্যই রামকান্তকে স্নেহ করিত, রামকান্তকে সামান্য কিছু সম্পত্তিও দেওয়াইতে পারিত না কি? আমার বিশ্বাস হয় না যে, দয়ারাম নির্দ্দোষ।”

শিরোমণি মহাশয়।—“আপনার বিশ্বাস না হইতে পারে। কিন্তু যে দুইটী কথার উল্লেখ করিয়া দয়ারাম রায়ের উপর দোষারোপ করিলেন, সে দুইটী বিষয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? আপনি শুনিয়াছেন—লোক পরম্পরায় রাষ্ট্র হইয়াছে,—দয়ারাম রায় নাটোর পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ গিয়া ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছেন। এ সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা। এ পর্য্যন্ত একদিনও তিনি মুর্শিদাবাদ যান নাই। এখনও তিনি মুর্শিদাবাদে নাই।”

চৌধুরী মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কহিলেন,—“সে কি বলেন! দয়ারাম রায় এ পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদেই যায় নাই।”

শিরোমণি মহাশয়।—“সে বিষয় আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারেন। আরও আপনার জামাতাকে সামান্য কিছু সম্পত্তি দেওয়াইবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করেন নাই, তাহাও নহে। সে বিষয়েও আমি স্বয়ং সাক্ষ্য দিতে পারি। ইতিপূর্ব্বে তিনি আমাকে মুর্শিদাবাদে এবং দেবীপ্রসাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্র লইয়া আমি দেবীপ্রসাদের সহিত

সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সে পত্রে রামকান্তকে কিছু সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবার জন্য তিনি দেবীপ্রসাদকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবীপ্রসাদ সে পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। পরন্তু দয়ারামের উদ্দেশে কটূক্তি করিয়া আমাকে বিদায় দিয়াছিলেন। এদিকে নবাব-সরকারে তদ্বির করিতে গিয়াও আমি উত্তর পাইয়াছিলাম,—"দেবীপ্রসাদ যদি ইচ্ছা করেন, অংশ দিতে পারেন; তিনি ইচ্ছা না করিলে, নবাব সে পক্ষে কোনও চেষ্টাই করিবেন না।" তারপর, দায়ারম রায় আরও নানারূপে রামকান্তের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সে কথা প্রকাশ নাই। তিনিও প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন।

চৌধুরী মহাশয়ের মনে হইল,—"এ কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। দয়ারাম রায় সত্যই কি আমার কন্যা-জামাতার প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী।"

চৌধুরী মহাশয় চিন্তার কূল-কিনারা পাইলেন না। পরন্তু শিরোমণি মহাশয়ের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেই তিনি প্রলুব্ধ হইলেন। চৌধুরী মহাশয় কহিলেন,—"ভাল, আপনার কথাই আমি বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু আপনি এখন আমায় কি করিতে পরামর্শ দেন?"

শিরোমণি মহাশয়। পরামর্শ আমি আর কি দিব? তবে আমার মনে হয়, আপনি যদি দয়ারাম রায়কে একটু অনুরোধ করেন, আর তিনি যদি স্বয়ং একবার মুর্শিদাবাদে গিয়া আপনার জামাতার সম্বন্ধে তদ্বির করিতে প্রবৃত্ত হন, সুফল-লাভের আশা আছে।"

আত্মারাম চৌধুরী, শিরোমণি মহাশয়ের কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলেন। বুঝিলেন,—'বৃথা মুর্শিদাবাদে গিয়া ফল কি? বুঝিলেন,—তাঁহার নিজের এমন কোনও ক্ষমতাই নাই, যাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়।' বুঝিলেন, 'সে অবস্থায় দয়ারাম রায়কে হস্তগত করিতে পারিলে, আশা পূর্ণ হইলেও হইতে পারে।'

চৌধুরী মহাশয় তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দয়ারাম রায় এখন আছেন কোথায়?"

শিরোমণি মহাশয়।—"আপাততঃ তিনি গৌড়ে গিয়াছেন। এক মাস সেখানে থাকিবার কথা আছে।"

চৌধুরী মহাশয়।—"আমায় কি তবে গৌড়ে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন?"

শিরোমণি মহাশয়।—"করিলে ভাল হয়। আমার মতে—এই নৌকা ছাপঘাটীর মোহানা হইতে ভাটীপথে না চালাইয়া উজানের পথে গৌড়ের দিকে চালাইতে পারেন।"

চৌধুরী মহাশয়।—"আপনি যখন এত করিয়া বলিতেছেন, তখন তাহাই স্থির। কিন্তু আপনি কি আমার সঙ্গী হইতে পারিবেন?"

শিরোমণি মহাশয়।—"যদি আবশ্যক বোধ করেন, আমিও যাইতে পারি। আমার তো আর অন্য কোনও আকর্ষণ নাই।"

অবশেষে সেই পরামর্শই স্থির হইল। আত্মারাম চৌধুরী বুঝিলেন,—মুর্শিদাবাদে কন্যা-জামাতাকে চোখের দেখা দেখিতে যাওয়া অপেক্ষা প্রকৃতপক্ষে তাহাদের যদি কোন হিতসাধন করিতে পারেন, তাহাই শ্রেয়ঃ।" এ বিষয়ে শিরোমণি মহাশয়ের পরামর্শে তিনি আস্থাবান্ হইলেন। নৌকা মুর্শিদাবাদের দিকে না চলিয়া উত্তরাভি-মুখে গৌড়ের পথে পাল-ভরে চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উভয়-সঙ্কট।

"তোমার পায়ে পড়ি—"তুমি এখনও প্রতিনিবৃত্ত হও।"

"কাত্যায়নী! আমি অনেক দূর এগিয়ে প'ড়েছি; এখন যদি

"আমি বলি—সেও বরং ভাল। নইলে, এত লোকের দীর্ঘ-নিশ্বাসে ভস্ম হ'য়ে যেতে হবে যে। আমি পায়ে পড়ি—মিনতি করি; যা গিয়েছে—সব যাক্। আর কাজ নেই।"

"তুমি প্রথম থেকেই বাধা দিতে আরম্ভ ক'রেছ; এক দিন শুনলে—তবু যা হয়, অন্নের উপর দিয়ে যেত। কিন্তু এখন আর শোনবার সময় নেই। এখন শুনতে গেলে, আমায় পথে বসতে হয়।"

"বসতে হয়, হবে! ভিক্ষে ক'রেও তো লোকের দিন চলে। এই এক অধর্ম, ভগবান কখনও সইবেন না; আমার কেবল আশঙ্কা হয়—কোন দিন হঠাৎ বজ্রপাত হবে, কোন দিন হঠাৎ ভরা-ডুবি হ'তে হবে। তার চেয়ে এখনও সাবধান হওয়া ভাল নয় কি?"

"দেখ—কাত্যায়নি! আমার জন্য আমি আর তত ভাবছি নে। ভাবনা—তোমার জন্য; ভাবনা—ছেলেদের জন্য; ভাবনা—বৌমার জন্য। তাই আমি আর ফিরতে পারছি না। নইলে, আত্মগ্লানি যে আমারও হয়-নি, তা মনে ক'রো না! যখন ডুবতেই বসেছি, তখন শেষ কোথায়—একবার দেখবোই দেখবো।"

"আমাদের মুখ চেয়ে যদি তুমি এখন কাজে প্রবৃত্ত হ'য়ে থাক, আমি তোমায় পুনঃপুনঃ বলছি—আমাদের ভাগ্যে যা থাকে, তাই হবে; তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।"

"তাও কি কখনও হয়—কাত্যায়নী। কৃতান্তেরও তো একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া কর্ত্তব্য! পরের মেয়ে ঘরে এনেছি, তার মুখের দিকে তো একবার চেয়ে দেখা উচিত।"

"সে কথা বলে আমায় আর ভুলাবার চেষ্টা ক'রো না! তাদের মুখ পানে যদি সত্যি সত্যিই চাইতে, তা' হলে কি আমার অদৃষ্ট এমন ক'রে পুড়তো? তাদের দশা এখনই কি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—একবারও ভেবে দেখেছ কি?"

"কেন—তাদের কি করেছি!"

"এখনও ব'লছ—কি ক'রেছি? কি কর-নি—বল দেখি? আমার দুধের বালক কৃতান্ত—তাকে এই বয়সেই তুমি উৎসন্ন দিয়েছ! একবার ভেবে দেখ দেখি—তার কি দশা হ'য়েছে! ভেবে দেখ দেখি—যে কৃতান্ত আমাদের মুখের পানে চাইতে ভয় ক'রতো, সে এখন বাপ-মা ব'লেই গ্রাহ্য করে না। সে দিন তোমারই মুখের সাম্নে কি কথা ব'লে গেল—স্মরণ হয় কি? তুমি যদি তারে সুপথে রাখ্বার চেষ্টা ক'রতে, সে কি কখনও এমন হ'ত? তবুও বলছ—তার কি করেছি!"

"আমি করেছি!"

"তুমি কর নাই তো কে করলে? দেবীপ্রসাদের সঙ্গে তাকে মিশ্তে কে শিখিয়ে দিলে? বড়-লোকের ছেলের সঙ্গে ভাব থাকলে, মনঃপ্রাণ বড় হবে—এই বলে না তুমি তাকে দেবীপ্রসাদের কাছে আনাগোনা করতে শিখিয়েছিলে? তার পর আমি যখন তোমায় নিত্য নিত্য বল্তাম কৃতান্তের চাল খারাপ হচ্ছে; তুমি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিতে! মনে পড়ে কি?"

"এর জন্য তুমি এত ভাব্ছ কেন? তার আর হয়েছে কি? ছেলে মানুষ—এখন বুঝতে পারে না, বয়েস হলে এমন

থাক্‌বে না। এ বয়সে এমন হ'য়েই থাকে। এ ভাব শীঘ্রই শুধ্‌রে যাবে!"

"আর শুধরে যাবে! তুমি এখনও যখন আমার কথা শুনতে রাজি নও, আর শুধরেছে! তুমি ব'লছ—ছেলের আর বউমার ভবিষ্যৎ ভেবে তুমি এই কাজ ক'রেছো! কিন্তু ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা; এখন তারা বাঁচলে, পরে তো তাদের ভবিষ্যতের কথা। এখনই আমার বউমার কি অবস্থা হ'য়েছে, তোমার একবার তা মনে হয় না কি? আমার সোনার কমল শুকিয়ে যেতে ব'সেছে। সেই হাসি-মুখখানি—এখন কেবলই অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে আছে। তার এ ব্যারাম কি জন্য—তোমাকে কি তাও বোঝাতে হবে? ওদিকে ছেলের ঐ অবস্থা; এদিকে বৌমা শয্যাগত। কার জন্যে তুমি আর অধর্ম্ম করতে চাও? তুমি ফের, আমি এখনও ব'লছি তুমি ফের।

"তুমি বার বার অধর্ম্ম অধর্ম্ম ক'রছো, কেন? আমি কি সত্য সত্যই অধর্ম্ম ক'রছি? আমি ঘর থেকে টাকা বার ক'রে দিয়েছি; আমি শরীরের রক্ত জল ক'রে খাটছি, আমি না মতলব ক'রলে, দেবীপ্রসাদ কখনই রাজাধিকার প্রাপ্ত হ'ত না। রামকান্ত তাহাকে পথে বসাইতেছিল, আমি তাহার ভাল করেছি। এতে আমার কি অধর্ম্ম?"

"তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক কর্‌বার ক্ষমতা আমার নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম কাকে বলে, তাও বুঝি না। ধর্ম্মাধর্ম্ম মনে মনেই তুমি বিচার ক'রে দেখ দেখি? লোকে তোমার সাম্‌নে কিছু ব'লতে পারে না বটে; কিন্তু তোমার জন্য লোকের নিকট আমার মুখ দেখাতেও লজ্জা হয়। সে দিন ঘাটের ধারে শুনছিলাম, মেয়েরা সব কানাকানি ক'র্‌ছিল,—রামকান্ত রায়ের খাজনা-লুটের মধ্যেও তোমার ষড়যন্ত্র

আছে! জানি না—সত্য কি মিথ্যা। কিন্তু শুনে অবধি প্রাণটা আমার আকুল হয়ে উঠেছে।"

"বেণীভূষণ চমকাইয়া উঠিয়া, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন,—"এ—এ! এ কথাও লোকে বলে না কি? লোকের তো বড় স্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি! কে এ কথা ব'লেছে শুনি!"

কাত্যায়নী কহিলেন,—"সে কথা আর শুনে কাজ কি? সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তোমার সম্বন্ধে সে কথা শুনতে হ'লে, আমার প্রাণ ফেটে যায়। তাই আমার ইচ্ছা—এ সব কথা যেখানে শুনতে না হয়, এ সব সংসর্গে যেখানে থাকতে না হয়, চল, আমরা সেই খানে চ'লে যাই! এ নাটোরের সম্বন্ধ তুমি ত্যাগ ক'রতে পারবে না কি?"

বেণীভূষণ।—"কাত্যায়নী! তুমি বড়ই উতলা হ'য়েছ—দেখছি, তোমার মতে আমারও মত বটে। কিন্তু,—"

কাত্যায়নী।—"এখনও কিন্তু কেন? জাল ফেলেছ, গুটুতে পারছ না—সেই ভাবনা। মনে কর না কেন—জাল ছিঁড়ে গিয়েছে। মনে কর না কেন—আমরা যে গরীব ছিলাম, সেই গরীবই আছি। দেখ! মনের সুখই সুখ। দিনরাত্রি এই দুশ্চিন্তার মধ্যে থেকে, এ জীবন-ভার বহন করা অপেক্ষা নিশ্চিন্ত হয়ে শাকান্ন খেয়ে জীবন ধারণ করা মঙ্গলকর নয় কি?"

বেণীভূষণ।—"কিছু ছিল না—সে এক কথা! কিন্তু যখন হ'য়েছে, কি ক'রে ত্যাগ ক'র্‌তে পারি! তুমি যাই বল, আমি শেষ একবার দেখবো! তার পর যা হয়,—"

বেণীভূষণ এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—তাঁহার কথা শেষ হয় নাই এমন সময় কৃষ্ণকান্তকুমার চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বলিতে লাগিল,—"শালার এত বড় স্পর্দ্ধা

আমাকে কিনা গলাধাক্কা! বাবা বাবা! এর প্রতিকার আজই করা চাই!”

এই বলিতে বলিতে, টলিতে টলিতে, কৃতান্তকুমার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কাত্যায়নী পুত্রের অবস্থা দেখিয়া পতিকে কহিলেন,—“তুমি আরও দেখতে চাও। শেষ দেখার কি আরও বাকী আছে? আমার মনে হচ্ছে—কেন সূতিকাগৃহে নুণ খাওয়াইয়া ওকে মারি নাই! অমন ছেলের এখন মরণ হ'লেই বাঁচি!”

বেণীভূষণ বিরক্তি-সহকারে উত্তর দিলেন,—“তোমার সব-তাতেই বাড়াবাড়ি! কি হ'য়েছে, আগে শোন। তারপর গালিগালাজ কর'!”

এদিকে কৃতান্তকুমার হুঙ্কার ছাড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার স্বর ক্রমেই সপ্তমে চড়িল। সে দেবীপ্রসাদের উদ্দেশে অকথ্য গালাগালি দিতে লাগিল।

কাত্যায়নী কহিলেন,—“আরও শুনতে সাধ আছে? শোন—শোন; ভাল ক'রেই শোন!”

কৃতান্তকুমার আরও চীৎকার করিয়া কহিল,—“বাবা তুমি এখনও শুনলে না! তবে দেখাচ্ছি—”

এই বলিয়া কৃতান্ত কুমার পিতার শয়ন গৃহের দ্বারে আসিয়া সজোরে পদাঘাত করিল। দরজা ভেজান ছিল; আপনিই খুলিয়া গেল। বেণীভূষণ রুক্ষস্বরে কহিলেন,—“থাম! আর মাতলামি করিস্-নে? মুখটা সব রকমেই পোড়ালি—আমার!”

অভিমানে কৃতান্তকুমার জলিয়া উঠিল। পিতার মুখের উপরেই উত্তর দিল,—“কি বল্লে,—আমি মাতাল! তা হ'লে তুমি আমার কথা শুনবে না! আচ্ছা,—দেখা যাবে। আমি চ'ল্লাম। আমি কেমন মাতাল, তোমায় দেখাব—তবে!”

এই বলিয়া ক্রোধভরে গরগর করিতে করিতে, কৃতান্তকুমার আবার বাড়ী হইতে চলিয়া গেল।

তাহাতেও বেণীভূষণ উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"এই অবস্থায় যদি রাজবাড়ী গিয়ে মাতলামি আরম্ভ ক'রে দেয়, বিষম গণ্ডগোল বাধতে পারে।" তাঁহার আরও মনে হইল—"আমার উপর চটিয়া গিয়া, আমার গুপ্ত কথা সমস্ত যদি নেশার ঝোঁকে দেবীপ্রসাদের কাছে ব্যক্ত করে ফেলে, অনিষ্টের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।" সুতরাং সেই অবস্থায়ই তাঁহাকে বাড়ীর বাহির হইতে হইল! মনে করিলেন,—"কৌশলে রাত্রিটা তাহাকে কোথাও আটকাইয়া রাখিবেন, তার পর, যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিবেন।"

কাত্যায়নী পুত্রের অনুগমনে বেণীভূষণকে বাধা দিতে গেলেন। কিন্তু বেণীভূষণ কাহারও শুনিলেন না। মুখে প্রকাশ করিলেন,—"ছেলেটা ঐ অবস্থায় বাড়ীর বের হ'য়ে গেল, সেটা ভাল হ'ল কি? এক ছেলে; বিপদ-আপদ ঘটতে কতক্ষণ।" কিন্তু মনে মনে কহিলেন,—"নেশার ঝোঁকে বুদ্ধিভ্রষ্ট হ'য়ে সে যদি দেবীপ্রসাদকে কোনও কথা বলে বসে, আমার সর্ব্বনাশ হ'তে পারে।"

কাত্যায়নী, স্বামীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি যে যাইতে নিষেধ করিতেছিলেন, তাহার কারণ আর কিছুই নয়; তাহার কারণ—"যদি রাক-সাক হয়ে যায়; সেও বরং ভাল, এ তুষানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা—সর্ব্বস্বান্ত হওয়াও শ্রেয়ঃ।"

যাহা হউক, বেণীভূষণ নিষেধ শুনিলেন না। তিনি সেই রাত্রিতে পুত্রের অনুগমন করিলেন; কাত্যায়নী ঘরে বসিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; আর এক একবার ভগবানকে ডাকিলেন। এইরূপেই সে রাত্রি অতিবাহিত হইল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সঙ্গীতস্বরে।

নাটোর পরিত্যাগ করিয়া, রামকান্ত রায় এক্ষণে মুর্শিদাবাদের একখানি ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন।

গঙ্গার পশ্চিম পারে, আজিমগঞ্জের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে, বড়-নগরে নাটোরের যে প্রাসাদ ছিল, পূর্ব্বে যখন রামকান্ত রায় মুর্শিদা-বাদে আসিতেন, সেইখানেই বসবাস করিতেন। কিন্তু নাটোরের আধিপত্যলোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বড়নগরের আধিপত্যও লোপ পাইয়াছে; সুতরাং রামকান্তকে এখন সামান্য একখানি ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থিতি করিতে হইতেছে।

রামকান্ত রায়ের পিতৃব্য রঘুনন্দন রায় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর তুষ্টিসম্পাদন করিয়া, বড়নগর লাভ করিয়াছিলেন। উদয়নারায়ণ যখন রাজসাহীর রাজা ছিলেন, তিনি যখন স্বাধীনতা অবলম্বনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তিনি যখন দুর্গাদিনির্ম্মাণে অত্যধিক সৈন্য দল গঠনের চেষ্টা পাইতেছিলেন, সেই সময় উদয়নারায়ণের প্রতি মুর্শিদকুলির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নবাব মুর্শিদকুলির সহিত উদয়নারা-য়ণের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। যুদ্ধে নবাব-পক্ষের বহু সৈন্য নিহত হয়। নবাবের সেনাপতি গোলাম মহম্মদ প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু পরিশেষে, রঘুনন্দনের ষড়যন্ত্রে, মুণ্ডমালার প্রান্তরে নবাব-সৈন্যের হস্তে উদয়নারায়ণ বন্দী হন। উদয়নারায়ণের অদৃষ্টে যাহা ছিল, সেই যুদ্ধেই তাহা শেষ হইয়া যায়। কিন্তু পুরস্কার-স্বরূপ রঘুনন্দন বড়নগর এবং রাজসাহী প্রদেশ লাভ করেন। এখন নাটোরের রাজধানীর সঙ্গে সঙ্গে বড়নগরের রাজভবন

দেবীপ্রসাদের অধিকৃত। সুতরাং ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করা ভিন্ন, রাজা রামকান্তের আর গত্যন্তর কি আছে ?

মুর্শিদাবাদের যে বাটীতে রামকান্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছেন, তাহা দ্বিতল ; গঙ্গার উপরেই অবস্থিত। বাড়ীর অব্যবহিত পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া কলনাদিনী ভাগীরথী প্রবহমানা। পূর্ব্বপার্শ্বে মুর্শিদাবাদের রাজপথ। এই রাজপথ বা গঙ্গা-প্রবাহের অনুসরণে দক্ষিণাভিমুখে ক্রোশ পরিমাণ অগ্রসর হইলেই মুর্শিদাবাদের নবাব-বাটী। জগৎশেঠের ভবন—রামকান্ত রায়ের ভাড়াটিয়া বাটীর অনতিদূরেই অবস্থিত।

সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ। প্রতীচী-গগনে রক্তিমাভ খণ্ডমেঘসমূহ মন্থর গতিতে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। নিম্নে কলনাদিনী পুণ্যতোয়া ভাগীরথী,—জলোচ্ছ্বাসে তটভূমি পরিপ্লাবিত করিয়া, তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে সাগরসঙ্গমে ধাবমান হইয়াছেন। কচিৎ মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যরশ্মি জাহ্নবীর তরঙ্গায়িত জলপ্রবাহে পতিত হইয়া, চাকচিক্য সঞ্চার করিতেছে ; কচিৎ বায়ু-বিচালিত মেঘসমূহ রশ্মিপথ অবরুদ্ধ করায়, সেই রজত-শুভ্র জলধারার উপর আঁধারের ছায়া নিপতিত হইতেছে। দূরে, আকাশ-পথে উড্ডীয়মান বিহঙ্গমগণ দলবদ্ধ হইয়া, কুলায়াভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। নিম্নে—গঙ্গাবক্ষে—তরণীসমূহ উজান ও ভাটার পথে গতাগতি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একখানি বজরা হইতে সঙ্গীতধ্বনি শুনা যাইতেছে।

এই সময়ে রামকান্ত রায় সেই ভাড়াটীয়া বাটীর ছাদের উপর বসিয়া গঙ্গার শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ; আর একবার আপনাদের ভাবনা ভাবনায় বিভোর হইতেছিলেন। যতই ভাবিতেছিলেন, যতই আলোচনা করিতেছিলেন, ততই হৃদয় হতাশে অব-

মগ্ন হইতেছিল। এমন সময় উজানবাহী একখানি বজরা সেই বাড়ীর নিম্ন দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল,—তৎপ্রতি রামকান্তের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই বজরার মধ্য হইতে সুধাস্বরে সঙ্গীত লহরী উত্থিত হইতেছিল। গায়ক গাহিতেছিল,—

কেন হতাশে বিষাদ প্রাণ।
দুখ পরে সুখ, আঁধারে আলোক, বিধির বিধান।
অমানিশা পরে, পূর্ণ শশধরে
গগন-অঙ্গনে কত শোভা ধরে;
শশাঙ্ক-বিকাশে, কুমুদিনী হাসে,
নাচে উঠে প্রাণ, আশার লহরে;—
তবে তুমি কেন বিষাদিত হেন,
ধরহ ধৈরজ অভিমান তজ, ফিরে পাবে মান।"

গানের এক একটী কলি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, আর রামকান্তের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। রামকান্ত আপনা আপনিই বলেন,—"সত্যই তো! কেন আর হতাশে বিষাদ প্রাণ! হতাশ হইয়া কি করিব? চেষ্টা করিয়া দেখি! সুফল পাইব না কি?" কিন্তু পরক্ষণেই আবার যখন তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হয়—"ধরহ ধৈরজ, অভিমান তজ, ফিরে পাবে মান," তখনই তিনি বলিয়া উঠেন,—"আর কত ধৈর্য্য ধরিব? অভিমান তো অনেক দিনই জলাঞ্জলি দিয়াছি। এখনও কি ফিরে পাবার আশা আছে? কৈ! কোনও লক্ষণই তো দেখি না! একবারও তো মনে সে আশার উদয় হয় না!"

ভাবিয়া ভাবিয়া হতাশ হইতেছেন, এমন সময় আবার গানের সুর কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করিল,—"দুখ পরে সুখ, আঁধারে আলোক, বিধির বিধান।" রামকান্ত আপনা-আপনিই বলিতে লাগিলেন,—"সত্যই তো! বিধির বিধান—আঁধারের পর আলোক হয়, দুঃখের পর সুখ আসে। তবে কি আমার দুঃখের অবসান হবে?"

রামকান্ত সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন, আর যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে আশা-নৈরাশ্যের তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। সহসা ভবানী আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু রামকান্ত, গঙ্গার দিকে চাহিয়া, বজরার গান শুনিতে শুনিতে এতই উন্মনা হইয়াছিলেন যে, ভবানীর পদসঞ্চার পর্য্যন্ত তিনি অনুভব করিতে পারিলেন না। সুতরাং ভাবনার ঘোরে অতর্কিতে তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল,—"তবে কি আমার দুঃখের অবসান হবে।"

ভবানী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,—"অবশ্যই হবে।"

যেন প্রতিধ্বনি বলিল—"অবশ্যই হবে।" যেন জননী জাহ্নবীও কলনিনাদে অভয় দিয়া বলিলেন,—"অবশ্যই হইবে।"

রামকান্ত চমকিয়া উঠিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে অভয়দায়িনী ভবানী। তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া কহিলেন—"কেও ভবানী!"

ভবানী উৎসাহ-ব্যঞ্জক-স্বরে কহিলেন,—"আপনি হতাশ হইতেছেন কেন? দিন অবশ্যই আসিবে।"

রামকান্ত আবেগভরে উত্তর দিলেন,—"আর কবে দিন আসিবে? আজ এক বৎসর অতীত হ'ল, আমরা মুর্শিদাবাদে এসে বাসা ক'রে ব'সে আছি। কিন্তু আজও আমাদের কথা নবাবের কর্ণে পৌঁছিল কি না, সে বিষয়েও আমার সংশয় হয়। রাজ্য পাওয়া তো দূরের কথা!"

ভবানী।—"কেন—জগৎশেঠ আজ কি ব'ল্লেন?"

রামকান্ত।—"তিনি প্রত্যহ যা বলেন, আজও তাই বল্লেন! তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে আমার আজ মনে হ'য়েছে—তিনি শুধুই স্তোক-বাক্যে আমাদের ভুলিয়ে রেখেছেন! তুমি যা যা বল্‌তে ব'লেছিলে, আমি তাঁকে সব ব'লেছি। কিন্তু তাঁর দ্বারা যে বিশেষ কিছু আশা আছে, আমার তা কিছুতেই মনে হয় না।"

ভবানী।—"রায় মহাশয়ের কোন সন্ধান নিয়েছিলেন কি?"

রামকান্ত।—"সে সন্ধান তো প্রত্যহ নিচ্ছি। কিন্তু শুনছি—তিনি মুর্শিদাবাদে নাই। জগৎশেঠ আজ ব'ল্লেন—'দুই একদিনের মধ্যেই দয়ারাম রায়ের মুর্শিদাবাদ আসার কথা আছে।' কিন্তু ভবানী! কেউ কেউ বলে—তিনিই এই ষড়যন্ত্রের মূল। তাই মুর্শিদাবাদে এলেও তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে আমার কেমন বাধবাধ ঠেক্‌ছে।"

ভবানী।—"বিশেষ প্রমাণ তো কিছু পাওয়া যায় নাই! লোক-মুখে শুনেছেন বৈ ত নয়। একবার দেখা হলেও তো তাঁর মনের ভাবটা বোঝা যেতে পারে!"

রামকান্ত।—আচ্ছা, তুমি বলছ, তাঁর আসারও কথা আছে; তিনি আসুন; সে চেষ্টাও আমি করে দেখবো। তবে কি জান—"আবার তাঁর কাছে যেতে বড়ই অপমান বোধ হয়।"

ভবানী।—"অপমান বলে মনে না করলেই হল! তাঁর কাছে আবার মান-অপমান কি? তিনি হাতে করে আপনাকে মানুষ করেছেন—বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। বরং বিদায় দেওয়ায়, তিনিই অপমানিত হয়েছেন। আমি আপনাকে উপদেশ দিতে পারি না। জানি না—কিসে কি হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়—পালনকর্ত্তার অপমানের ফলে আমাদিগকে এরূপ অপমান ভোগ করতে হচ্ছে। আমার আরও মনে হয়—তাঁর সম্মান করলে, আমাদেরও সম্মানবৃদ্ধি হতে পারে!"

রামকান্ত।—"ভবানী! তুমি যখন এত করে বলছ, আমি তোমার কথাই এবার শুনবো। বারবার তোমার কথা শুনি নাই বলে, বারবার অপদস্থ হয়েছি। এবার আমি আর মান-অপমান কিছুই জ্ঞান করবো না! এবার তুমি যেমন বলবে, আমি সেই মতই কাজ করে যাব।"

ভবানী।—"আপনি অমন কথা বল্‌বেন না! আমার কথামত আপনি কাজ কর্‌বেন—সে কি বলেন? ইহাতে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়। আমি স্ত্রীলোক; আমি কি বুঝি যে, আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি? তবে আপনি দয়া করে আমায় জিজ্ঞাসা করেন; তাই আমার যা মনে আসে—আপনাকে বলে যাই! ভাল-মন্দ বিচারের ভার আপনার উপর।"

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল দেখিয়া, উভয়ে ছাদ হইতে নিম্নে অবতরণের জন্য সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছেন; এমন সময় একখানি পাল্কী, সেই বাড়ীর দরজা দিয়া, জিয়াগঞ্জের দিকে যাইতেছে, দেখিতে পাইলেন। পাল্কীখানি দেখিয়াই ভবানীর মনটা যেন কেমন কেমন করিয়া উঠিল। তিনি স্বামীকে কহিলেন,—"আমি যেন দেখিলাম, ঐ পাল্কীর মধ্যে রায়-মহাশয় আছেন, একবার সন্ধান করিলে হইত না?"

রামকান্ত উপর হইতে আপনার দ্বারবানকে ডাকিয়া পাল্কীর তথ্য লইতে কহিলেন। এদিকে আপনিও দ্রুত-পদবিক্ষেপে নিম্নে অবতরণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাৎকার।

সত্যই তিনি দয়ারাম। যিনি পাল্কী করিয়া যাইতেছিলেন, সত্যই তিনি দয়ারাম! দয়ারাম সেইদিনই মুর্শিদাবাদ আসিয়াছেন। নবাব-বাড়ী গিয়াছিলেন; সেখান হইতে ফিরিয়া আপনার বাসার দিকে চলিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ তখন বাঙ্গালার রাজধানী ছিল;

সুতরাং যিনিই একটু-আধটু ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁহা-কেই প্রায় মুর্শিদাবাদে একটা না একটা আড্ডা রাখিতে হইয়াছিল; প্রধান প্রধান ভূস্বামিবর্গ প্রায়ই মুর্শিদাবাদে সাময়িক বাসের জন্য বাড়ী-ঘর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অন্যান্য সকলেও, যাঁহার যেমন সামর্থ্য, তদনুরূপ বাসার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন।

সাময়িক বসবাসের জন্য, মুর্শিদাবাদে দয়ারাম রায়েরও একটী বাসা ছিল, রাজা রামজীবনের অনুগ্রহে তিনিও এখন একজন জমিদার-শ্রেণীভুক্ত। নাটোরে চাকরী করিবার সময় তাঁহার সেই জমিদারীর পত্তন হয়; রাজধানীর কাজ-কর্ম্ম দেখিতে দেখিতে তিনি আপনার কাজ-কর্ম্মেরও তত্ত্বাবধান করিতেন। তখন আসিলে বড়নগরের বাড়ীতেই তাঁহার বাসা হইত। কিন্তু এখন তো আর নাটোরের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই! বড়নগরের বাসাও এখন অন্যের অধিকৃত। সুতরাং নিজের একটী স্বতন্ত্র বাসা করা ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না।

যাহা হউক, দয়ারাম আপন বাসায় চলিয়াছেন; সহসা বাধা-প্রাপ্ত হইলেন। তিনিও শুনিয়াছিলেন, তাঁহার গমনাগমনের পথের পার্শ্বে রামকান্ত রায় বাসা করিয়া আছেন; নবাববাড়ী যাইবার সময় সে বিষয়ে সন্ধান লইবার তাঁহার অবসর হয় নাই। প্রত্যাগমনকালে সহসা রামকান্ত রায়ের দরওয়ান যখন তাঁহার পাল্কীর সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং বাধা প্রাপ্ত হইয়া যখন তাঁহার পাল্কীর বেহারারা দণ্ডায়মান হইল; দয়ারাম রায় বেহারাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে?"

বেহারাদিগের নিকট উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই শশব্যস্তে রামকান্ত রায় সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিলেন,—"দয়ারাম দাদা! আমি রামকান্ত।"

সহসা সেই অবস্থায় রামকান্তকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া, দয়ারাম অতিকষ্টে মনের বেগ সংবরণ করিলেন ; কিন্তু পাল্কী হইতে অবতরণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রামকান্ত বিষাদ-বিজড়িত-কণ্ঠে কহিলেন,—"দাদা! আজ আমাদের বাড়ীতে আসতে হবে।"

এই বলিয়া, হাত ধরিয়া তিনি দয়ারাম রায়কে বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইতে চাহিলেন।

দয়ারাম প্রথমে মনে করিয়াছিলেন,—আপত্তি করিবেন। মনে করিয়াছিলেন, বলিবেন,—'আজ শরীর কিছু ক্লান্ত আছে। সবে আজ দেশ হইতে আসিয়াছি। কাল বরং দেখা করিব।' কিন্তু বলিবার সময় মুখে বাক্য সরিল না। অন্য অবস্থা হইলেও, কত মান-অপমানের ভাবনাও তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইতে পারিত। কিন্তু এ অবস্থায় দয়ারাম আর উক্তি করিতে পারিলেন না। স্নেহে ও অনুশোচনায়, তিনি মান-অপমানের সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। রামকান্ত আসিয়া, দাদা বলিয়া হস্তধারণ করায়, দয়ারাম রায় বিনা আপত্তিতেই রামকান্তের পশ্চাদনুসরণ করিলেন ; বলিলেন,—"ভাই, মুর্শিদাবাদে এসে অবধি তোমাদের কথাই আমি ভাবছিলাম। নবাব-বাড়ীতে জরুরী কাজ ছিল, তাই সহরে পৌঁছে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি-নি। এ বেলা যদি বাসা হতে না পেতাম, কাল নিশ্চয়ই এসে দেখা ক'রতাম। তা ভাই! তোমার শরীর ভাল আছে তো? আমার মা ভবানী ভাল আছেন তো? এ দিকের তদ্বিরের কিছু ক'রতে পেরেছ কি?"

রামকান্ত উত্তর দিলেন,—"শারীরিক সকলেই ভাল আছি। অপরাপর বিষয়ের কথা—বাড়ীর মধ্যে চলুন—একে একে সব বলবো এখন।"

যেন কখনও কোনরূপ মনান্তর হয় নাই, যেন কত আত্মীয়-অন্তরঙ্গের ন্যায়, উভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সারল্যের স্নিগ্ধ আলোকে অবিশ্বাসের অন্ধকার এমনই ভাবে তিরোহিত হয়! যে রামকান্ত যে দয়ারামকে আপন চিরশত্রু বলিয়া—উন্নতির পথের কণ্টক মনে করিয়া—কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন; যে রামকান্ত আপনার বাজ্যচ্যুতির মূলে দয়ারামের কর্তৃত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; সেই রামকান্তের আহ্বানে, সেই দয়ারাম রায়, সেই রামকান্তের ভবনে প্রবেশ করিলেন,—শত্রু বলিয়া মনে হইল না, অপমানিত হইবার আশঙ্কা হইল না,—রামকান্তের সরলতাপূর্ণ মুখ দেখিয়া—তাঁহার বিষাদ-খিন্ন বদন নিরীক্ষণ করিয়া—দয়ারাম সব ভুলিয়া গেলেন।

দয়ারাম রায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, রামকান্ত দয়ারামকে এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। প্রথমেই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"দয়ারাম দাদা! আর কত দিন আমাদের এমন ভাবে এই কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখ্‌বেন?"

দয়ারাম রামকান্তকে আলিঙ্গন করিয়া, সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন,—"ভাই! উতলা হচ্ছ কেন? এ সব ভগবানের পরীক্ষা ব'লে জেন? আমি তো তোমাকে সকল কথাই খুলে ব'লে এসেছিলাম। আমি তো তোমাদের এক কপর্দ্দকও নিয়ে আসি-নি! তবে কেন এমন হ'ল? ভগবানের পরীক্ষা ভিন্ন ইহাকে আর কি ব'লতে পারি।"

রামকান্ত।—"দাদা! সে পরীক্ষা কি এখনও শেষ হয়-নি? বিনা কারণে আপনাকে বিদায় দেওয়ায়, আমার যে অপরাধ হ'য়েছিল,—তার কি উচিত দণ্ড আজিও হয় নাই! ভগবান্ আর কতদিন আমায় এভাবে রাখবেন?"

দয়ারাম।—"যখন চেষ্টা হ'চ্ছে, তখন ফল একটা কিছু-না-কিছু হ'তে পারে।"

রামকান্ত।—"চেষ্টা তো এক বৎসর ধ'রে করছি। কৈ আশা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। বরং দিনদিনই হতাশ হ'য়ে পড়তে হ'চ্ছে। তা যা হো'ক দাদা। এবার যখন আপনার দেখা পেয়েছি, আপনাকে একবার চেষ্টা ক'রতে হবে!"

দয়ারাম।—"জগৎশেঠ প্রভৃতি যখন চেষ্টা ক'রছেন, তখন আর আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তির চেষ্টা ক'রতে যাওয়া উচিত কি? তাতে, হয় তো বিপরীত ফল ফলতে পারে।"

রামকান্ত।—"যে ফলই ফলুক; আপনাকে একবার চেষ্টা ক'রতেই হবে। তাতে যদি কৃতকার্য্য না হই, আমার আর কোনই ক্ষোভ থাকবে না! কিন্তু আপনি চেষ্টা না করলে, আমার ক্ষোভ ইহজীবনে মিটবে না।"

দয়ারাম।—"তুমি বলিতেছ বটে; কিন্তু কি চেষ্টা করিব? আমার কথা শুনিবেই বা কে?—নবাবই বা শুনিবেন কেন? নবাব-সরকারের অনেক কর্ম্মচারী, যে কারণেই হউক, এখন দেবীপ্রসাদের পক্ষ। সুতরাং আমার মনে হয় না যে, আমি সেখানে কোনও সুবিধা করিতে পারিব। জগৎশেঠের দ্বারা চেষ্টা করিতেছ, তাঁহার দ্বারাই চেষ্টা কর। বরং যদি তাঁহাকে কিছু বলিতে বল, তোমার পক্ষ হইয়া আমিও জগৎশেঠকে কিছু বলিতে পারি।"

দয়ারাম এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন; এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল,—"মা বলিতেছেন,—"যাহা করিতে হয় আপনাকে করিতে হইবে। আমরা আর কাহাকেও জানি না!" ভবানী অন্তরালে থাকিয়া, দয়ারাম ও রাম-কান্তের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। রামকান্তও সেই উদ্দেশে অপরে

না শুনে, অথচ ভবানী শুনিতে পান—এই অভিপ্রায়ে দয়ারামকে তদুপযোগী একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া বসাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পরিচারিকা ভবানীর উপদেশক্রমেই ঐ কথা বলিয়া গেল।

রামকান্ত দয়ারামকে আরও বিশেষভাবে ধরিয়া বসিলেন। ভবানীর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া কহিলেন,—"আপনাকে উপায় একটা ক'রতেই হবে। না ক'রলে আমি কিছুতেই শুনবো না। আপনি যা ব'লবেন, আমি তাই ক'রতে রাজী আছি।"

দয়ারাম বুঝিলেন—রামকান্তের চৈতন্যোদয় হইয়াছে। বুঝিলেন,—উদ্ধত যুবক ধনমদে মত্ত হইয়া যে অপকর্ম্ম করিয়া বসিয়াছিল, তজ্জন্য এখন অনুশোচনার তীব্র তুষানলে অহর্নিশি দগ্ধ হইতেছে। তাঁহার মনে হইল,—"সান্ত্বনা দিই। তাঁহার মনে হইল—"একবার বলি, চেষ্টা করিয়া দেখিব!" কিন্তু সে মনোবেগ তিনি রুদ্ধ করিলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন,—"করিতে পারিব কি না পারিব—কাল বিবেচনা করিয়া তোমায় বলিব। হঠাৎ আজ কিছুই বলিতে পারিতেছি না। দুই দিন মুর্শিদাবাদে না থাকিলেও কোন্ পথে যাইব—তাহা স্থির করিতে পারিব না। আজ তোমরা উতলা হইও না। যাহা যুক্তিযুক্ত হয়, কাল জানিতে পারিবে।"

রামকান্ত।—"ভাল—যে উপায় নির্দ্ধারণ করেন, কাল হউক, দু'দিন বাদে হউক, যবে ইচ্ছা জানাইবেন। তাহাতে আমার অণুমাত্র উদ্বেগ নাই। কিন্তু আমার উদ্বেগ দূর হয়—যদি আপনি বলিয়া যান—"আমি চেষ্টা করিব।" আপনার মুখে, 'আপনি চেষ্টা করিবেন',—এই কথা শুনিলেই আমাদের এখন সকল উদ্বেগ দূর হয়।

দয়ারাম।—"কি করতে পারি না-পারি—আগে বিবেচনা ক'রে

রামকান্ত।—"বিবেচনা করুন—আর যাই করুন, সে তো পরের কথা। আপনি চেষ্টা ক'রবেন। আমরা এখন আপনার উপরই নির্ভর ক'রে রইলাম।"

দয়ারাম।—"এত বড় গুরুতর কাজ; কি হবে না-হবে—কিছুই বলা যায় না। সুতরাং না ভেবে চিন্তে কি বল্‌তে পারি?"

পরিচারিকা আবার আসিয়া বলিল,—মা বলিতেছেন,—"আপনি চেষ্টা করিবেন বলুন, আর না-বলুন, আমরা আপনারই উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম।"

রামকান্ত বলিলেন,—"আপনাকে এ কাজ ক'রতেই হবে;—ফল হউক বা না হউক। আমাদের আপনি যা ক'র্‌তে ব'লবেন, আমরা তাতেই প্রস্তুত। আপনি নিশ্চয় জানবেন,—রামকান্ত আপনার উপদেশ আর কখনও অবহেলা করবে না।"

ইহার পর দয়ারামকে সন্ধ্যাহ্নিক করার জন্য অনুরোধ করা হইল। ভবানী বলিয়া পাঠাইলেন,—"আজ এইখানেই আহারাদি করিতে হইবে।"

দয়ারাম হাসিয়া পরিচারিকাকে কহিলেন,—"মাকে বল্‌গে, যেখানেই থাকি, দয়ারাম আপনাদেরই খেয়ে মানুষ। এর জন্য আর অনুরোধ কেন? আজ আমার শরীরটা কিছু খারাপ আছে, রাতে কিছু খাব না ব'লেই মনে ক'রেছি। তা কাল এসে মায়ের পায়ের প্রসাদ খেয়ে যাব। আমায় আর এজন্যে বেশী কিছু বল্‌তে হবে না।"

ইহার পর, দয়ারাম বিদায় লইয়া বাসায় চলিলেন। রামকান্ত পাল্কীর কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া, তাঁহাকে পাল্কীতে উঠাইয়া দিয়া গেলেন। দয়ারাম পুনঃপুনঃ রামকান্তকে নীচে নামিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু রামকান্ত কোনক্রমেই তাহা শুনিলেন না।

বিদায়ের সময় দয়ারাম রামকান্তের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। অনেকদিন পরে আবার দুই-ভাইয়ে কোলাকুলি হইল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষা।

দয়ারাম বাড়ী রওনা হইলেন। রামকান্তের সম্মুখে তিনি যে গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, পাল্কীতে উঠিয়াই তাঁহার সে গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ হইল। নানারূপ চিন্তার তরঙ্গে তাঁহার

বলিয়াছিল—বলিয়াছিল। আমি বা কেন অভিমান করিয়া চলিয়া আসিলাম? যাহা হউক—রামকান্ত বালক বৈ ত নয়? তাহার সঙ্গে রাগ করিয়া চলিয়া আসা আমার পক্ষে ভাল হয় নাই। হয় লোকের পরামর্শে এ [illegible] কুকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া, রামকান্তকে পরিত্যাগ করা কি ভাল হইয়াছিল? যাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি, তার প্রতি কেন আমি দুর্ব্যবহার ক'রলাম?"

আবার পরক্ষণেই মনে হইল,—দুর্ব্যবহার আমিই বা কি করি-য়াছি? রামকান্তই তো আমায় প্রকারান্তরে তাড়াইয়া দিয়াছিল; সে ক্ষেত্রে গায়-পড়া হইয়া থাকা—কখনই উচিত ছিল না। যাহা হইয়াছে, তাহাতেই লোকে টিট্‌কারী দিয়াছে। সে অবস্থায় তার পরও আমি সেখানে থাকলে, আমার পরিণাম কি শোচনীয় হইত। যারা আমার পায়ের ধুলাকণার যোগ্য ছিল না, তারাও আমার মাথায়

উঠবার চেষ্টা ক'রেছিল। সেখানে কি আর থাকা আমার উচিত ছিল?—কখনই না, কখনই না!"

"না থাকি—যাতে রামকান্ত রাজ্যভ্রষ্ট না হয়; তার চেষ্টা ক'রলাম না কেন? এমন ক'রে তাকে পথে বসাবার মূলীভূত হ'লাম কেন? আমি অবশ্য তার বিরুদ্ধে নবাব-সরকারে কোন কথাই বলি নাই; সে সম্বন্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, তার কোন দিকেই আমি সাহায্য করি নাই। কিন্তু উদাসীন ছিলাম তো! তাই কি আমার পক্ষে উচিত হয়েছে? যাদের অন্ন খেয়ে মানুষ; যার পিতৃপুরুষ আমার পুরুষানুক্রমে ভাত-ভিতির ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গিয়েছেন; তার সর্ব্বনাশ হচ্ছে দেখে, আমি কি ক'রে নিশ্চিন্ত ছিলাম? আমার অভিমান কি এতই বড়! আমার প্রতিপালক প্রভুর বংশ উৎসন্ন যায়—এ দেখেও আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম!"

"নিশ্চিন্ত না থেকেই বা ক'রতাম কি? হয় তো' তাতে আরও কুফল ফ'ল্‌তো। উদ্ধত রামকান্ত এই কষ্ট পেয়েছে বলে, এখন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কিন্তু যদি এ কষ্ট না পেত, সে কি কখনও রাজ্য রাখতে পারতো? দুই দিনে রাজ্য উড়ে যেত! নবাবের হাতে না যাক্—দেবীপ্রসাদের হাতে না যাক—দুই দিনেই রাজ্য আপনা-আপনিই ছারখার হয়ে যেত! সে হিসাবে ভাল ক'রেছি—কি মন্দ ক'রেছি! রামকান্ত কখনও দুঃখের মুখ দেখে নাই। পিতৃসম্পত্তি পেয়ে অবধি সে যেন ধরাকে শরা জ্ঞান ক'রেছিল।—রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ায়, তার এক পরীক্ষাও হ'য়ে গেল। এবার যদি রামকান্ত রাজ্য-লাভ ক'রতে পারে, ঠেকে শিখেছে—নিশ্চয়ই সমঝে চ'লবে;—নিশ্চয়ই সুশাসন-সুপালনে প্রজামাত্রের আশীর্ব্বাদভাজন হবে! এ পরীক্ষা ভালই হ'য়েছে।"

"পরীক্ষা হয়েছেই বা কিসে বুঝলাম! রামকান্ত ব'লছে বটে—

আমি যা ব'লবো, তাই সে শুনবে। কিন্তু তাই বা কি ক'রে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি? এ বিষয়ে অগ্রসর হ'বার আগে—সেটাও তো আমার একবার দেখা প্রয়োজন! চঞ্চল-চিত্ত যুবক আমার সঙ্গে চাতুরী ক'রবে না, তাই বা কি ক'রে ব'ল্‌তে পারি? সে কি সত্য সত্যই আমার উপর নির্ভর ক'রেছে? ভাল—সেই পরীক্ষাই আগে নেয়া-যাক্‌। যদি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, যদি সত্য সত্যই সে আমার উপর নির্ভর ক'রে থাকে, আমি প্রাণ দিয়ে তাকে রক্ষা ক'রবো;—যাতে রামকান্ত আবার রাজ্যপ্রাপ্ত হয়, তৎপক্ষে আমি স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা ক'রবো। দেখি—রামকান্ত এ পরীক্ষায় কি পরিচয় দেয়। রামকান্ত, আবার তোমার পরীক্ষা! বিষম পরীক্ষার উপর আমার হাতে আবার তোমার নূতন পরীক্ষা।"

"পরীক্ষা বটে—যদি আবার রাজ্য পায়! কিন্তু সে আশা কোথায়? নবাব আলিবর্দ্দীকে কে বুঝাইবে? যে রামকান্তকে তিনি একবার রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন, আবার তাহাকে রাজ্য দিতে সম্মত হইবেন কি? জানি না—কি হবে! জানি না—অদৃষ্টে কি আছে! রামকান্ত সত্য সত্যই যদি পরীক্ষা-পারাবারে উত্তীর্ণ হয়, সত্য সত্যই সে যদি আমার উপর নির্ভর-পরায়ণ হ'য়ে থাকে, সত্য সত্যই সে যদি আমি যা ক'র্‌তে ব'ল্‌ব,—এমন কি আমার কথায় প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হয়; আমি কি পার্‌বো না? রামকান্তের রাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রে দিতে পার্‌বো না? অবশ্যই পার্‌বো। দয়ারাম পার্‌বে না—এমন কাজ কি আছে—কি থাক্‌তে পারে? রাম-কান্তকে পৈতৃক সিংহাসনে বসান—সে তো তুচ্ছ কথা!

"তবে চাই টাকা! নবাব-দরবারের টিকটিকিটি পর্য্যন্ত হাঁ করে আছে! তাদের উপরপূর্ত্তি না ক'র্‌তে পার্‌লে, কার্য্যোদ্ধার হবে কি? সেই টাকাই বা এখন কোথায় পাই? অল্প স্বল্প টাকা হ'লে

কোন রকমে না হয় যোগাড় করতে পার্‌তেম! কিন্তু এ তো কম টাকার কাজ নয়? টাকার উপায়ই বা কি হবে?"

পাল্কী বাসার দুয়ারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। পাল্কী আসিবা-মাত্র ভৃত্যগণ আলো লইয়া দাড়াইল। পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া দয়ারাম রায় আনমনে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পুনঃ-পুনই তাঁহার মনে হইতে লাগিল—"পরীক্ষা—পরীক্ষা! রামকান্তকে একবার আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

নবম পরিচ্ছেদ।

চরমে।

"কি অত্যাচার! কি অত্যাচার! এ, গাঁয়ে কি আর বাস ক'রতে আছে?"

নবীন দাস, মধুমণ্ডলের নিকট আক্ষেপ করিয়া কহিল,—"কালই আমি খদ্দের দেখ্‌ছি। এই ভাদ্দর মাস, এই মাসেই আমি বাড়ি ছেড়ে যাব।"

মধু মণ্ডল উত্তর দিল,—"তোর তো যা হ'ক হাত-পা খোলস আছে, তুই মনে ক'র্‌লেই যা ইচ্ছে ক'র্‌তে পারিস্। কিন্তু আমার আত্মীয়-কুটুম্ব সবই এই গাঁয়ে! আমি কাকে ফেলে কাকে নিয়ে যাবো। যা করে তুলেছে, তাতে টেঁকা তো দায়ই হয়েছে—সত্যি; কিন্তু যাই কোথায়? ডেঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর; যাই কোথায়?"

এই সময় গগন সর্দ্দার আসিয়া তাহাদের কথায় যোগদান করিল, "শুনেছ—মোড়লের পো, শুনেছেন দাস মশায়,—হরিদাসের ছেলে

গোরুটাকে আজ নায়েবের নগদি এসে ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে গিয়েছে! সে সেদিন আমার সামনে খাজনা দিয়ে এসেছিলো, আজ কিনা সুমুন্দির-পো বলে, খাজনা পায়-নি। সুমুন্দিরা সাত চোরে রাজ্যটাকে মস্করি-বাটা ক'রে খেলে। আমরা প্রাণে ম'লাম!"

নিধিরাম শশব্যস্তে সেই পথ দিয়া ছুটিতেছিল। তাহাকে সেই ভাবে ছুটিতে দেখিয়া, নবীন দাস ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"নিধে! তুই অমন উল্কোমুখী হ'য়ে ছুটেছিস কোথায়?"

নিধিরাম ছুটিতে ছুটিতে বলিল,—"আর দাদা, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে— ঘরে আগুন লাগিয়েছে! ঐ দেখ—ঘরখানা ধূ ধূ ক'রে জ্বল্‌ছে। আয় তোরা ছুটে আয়! আমায় রক্ষে কর্; —আমায় রক্ষে কর্।

সকলে তাকাইয়া দেখিল—সত্যসত্যই নিধিরামের ঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। বাঁশের ঘর, খড়ের ছাউনি। অগ্নিদেব লক লক শিখা বিস্তার করিয়া উঠিয়াছেন! সহকারী পবনদেব আপনিই আসিয়া যোগ দিয়াছেন। আগুন উড়িয়া উড়িয়া চলিয়াছে। বাঁশগুলা ফট্‌ফট্ ফুটিতেছে। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্র। উত্তাপে আগুনের নিকট সহসা কেহই ঘেঁসিতেই পারিতেছে না।

দেখিতে দেখিতে একখানি ঘর ভূমিসাৎ হইল। সেই ঘরের আগুন ছিট্‌কাইয়া গিয়া, অপর একখানি ঘরের দাওয়ার চালে পতিত হইল। নবীন দাস, মধু মণ্ডল প্রভৃতি সকলেই ছুটিয়া গিয়া আগুন নিবাইবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল। পাড়াপড়সির ঘরের ভিতর ঢুকিয়া, তাহাদের সবের জলের কলসী লইয়াই তাহারা আগুন নিবাইতে চেষ্টা পাইল।

এইবার যে ঘরখানায় আগুন ধরিল, সেখানা গোয়াল-ঘর। সেই ঘরে একটা গাই-গরু, আর তার ছোট একটা বাছুরটা বাঁধা ছিল। নিধিরাম কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ঘরের দিকে ছুটিয়া

গেল; বলিতে লাগিল,—“ওগো, ঐ ঘরে আমার শুকী গাই আর কোঁয়ালে বাছুরটা আছে; তোমরা বাঁচাও। আমার ঘর যায় যাক্, আমার সব যায় যাক্, কিন্তু ভিটেয় যেন এ সর্ব্বনাশ না হয়!” এই বলিয়া, ব্যাকুল হইয়া, সে আগুনের মধ্যেই প্রবেশ করিতে গেল।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। যমদূতের ন্যায় দেবীপ্রসাদের পাইকগণ ঘরের চারিধার ঘেরিয়া দাঁড়াইল। নায়েব ভৈরব বিশ্বাসের কড়া হুকুম,—“খবরদার! কেউ যেন ঘরের কানাচে না যেতে পারে।” যাহারা জল লইয়া আগুন নিবাইতে গেল, পাইকেরা তাহাদের কাহাকেও ঘরের দিকে ঘেঁসিতে দিল না।

নিধিরাম আছাড়ি পিছাড়ি খাইতে লাগিল। নবীন দাস ও মধু-মণ্ডল আকুলি ব্যাকুলি করিতে লাগিল। সে পাষাণভেদী আর্ত্ত-নাদে হয় ত যমের নিকটেও নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত; কিন্তু ভৈরব বিশ্বাসের কড়া হুকুম কিছুতেই রদ হইল না।

ঘর পুড়িল। চক্ষের সমক্ষে—হিন্দুর চক্ষের সমক্ষে—ঘরের মধ্যে দড়ি-বাঁধা গোরু ও বাছুর হাম্বা হাম্বা করিতে লাগিল; কিন্তু ভৈরব বিশ্বাসের পাষাণ-প্রাণ কিছুতেই বিচলিত হইল না। লোকে যতই কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল, ভৈরব বিশ্বাস ততই সকলকে শাসাইয়া বলিতে লাগিল,—“রাজা দেবীপ্রসাদের হুকুম! তিনি হুকুম দিয়াছেন,—“জরু গরু—যা থাকে, সব পুড়িয়ে মারতে হবে। ভৈরব বিশ্বাস আরও বুঝাইল, সে নিমকের চাকর; কোন ক্রমেই সে মনিবের হুকুম উপেক্ষা করিতে পারে না।”

বজ্র! তুমি এখনও ভৈরব বিশ্বাসের মস্তকের উপর পতিত হইলে না? যম! তুমি এখনও দেবীপ্রসাদের মুণ্ডচ্ছেদ করিলে না? ধর্ম্ম! তুমি এখনও গো-ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য উপায় বিধান করিলে না?

সে ব্যাপার যে দেখিল, সে ঘটনা যে শুনিল, সে-ই আক্ষেপে অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

কেতু ঘোষ ক্ষোভে রোষে অগ্নি সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল,—"যদি ভৈরব বিশ্বাসের মুণ্ড নিয়ে সোনাডাঙ্গার মাঠে ভাটা খেলাতে না পারি তো, আমার বাপের নাম হীরু ঘোষ নয়। আমি দেখবো—কেমন ও সুমুন্দি!"

এই বলিয়া কেতু ঘোষ গোয়াল-ঘরের আগুনের দিকে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু ভৈরবের আদেশে দুই তিন জন পাইক গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, তার পর, কাছারীতে লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে পিঠ-মোরা করিয়া বাঁধিতে লাগিল।

এই অবসরে গগন সর্দ্দার একখানা দা হাতে করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। বলিতে লাগিল,—"যে সুমুন্দি আমার দিকে এগুবে, তার মুণ্ডুটা কেটে দু'খানা ক'রে ফেলবো।"

গগন সর্দ্দারের রোষাভাসে সাহস করিয়া কেহ তাহার সামনে ঘেঁসিতে পারিল না। দূর হইতে পাইকেরা তাহার দিকে লাঠি চালাইতে লাগিল। কিন্তু দুই এক ঘা লাঠি খাইয়াও গগন সর্দ্দার জলন্ত গোয়াল-ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

সে গোয়াল ঘরে ঢুকিয়াই, গরুর গলার দড়ি কাটিয়া দিল। বাছুরটাকে কোলে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার গায়ে আগুনের হল্কা লাগিল; কোথাও কোথাও ফোস্কা হইল। কিন্তু সে কোন দিকেই দৃক্‌পাত করিল না। এদিকে দড়ি কাটা পাইয়া গোরুটা হাম্বা হাম্বা করিয়া ছুটিতে লাগিল; ছুটিতে ছুটিতে এক একবার বাছুরটার দিকে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল।

এই সময় ভৈরব বিশ্বাস পুনরায় পাইকদিগকে হুকুম দিলেন,—"বাঁধ,—ঐ গগনা শালাকে।"

গগন সর্দ্দার উন্মত্তের ন্যায় দা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল,—"আয়না কোন্ শালা মারবি। দু-দশটা মাথা-না-নিয়ে, আমি আর নড়ছি না।

ইত্যবসরে পাইকগণ গগনসর্দ্দারের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলিল। দূর হইতে তাহার উপর লাঠী চালাইতে লাগিল। ভৈরব বিশ্বাস চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"কাছে না ঘেস্তে পারিস্, লাঠির চোটে শালার মগজ বের করে দে।"

গগন সর্দ্দার মারা যায়, শুনিয়া গগন সর্দ্দারের ভাই শ্রীরাম সর্দ্দার আর তাহার পুত্র দিগম্বর সর্দ্দার ছুটিতে ছুটিতে আসিল। অর্দ্ধপ্রজ্বলিত অর্দ্ধদগ্ধ বংশাগ্রভাগ ধরিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া, গগনের সাহায্যার্থ পশ্চাৎ-দিক্ হইতে ধাবমান হইল। তাহাদের সাহস ও উৎসাহ দেখিয়া, নবীন দাস, মধু মণ্ডল, নিধিরাম প্রভৃতি গ্রামস্থ সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা যতই বলিতে লাগিল—"মার শালাদের, মার শালাদের"; লোকে ততই উন্মত্তপ্রায় হইল, যে যাহা সম্মুখে পাইল, তাহা লইয়াই সকলে গগন সর্দ্দারকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইল।

ঘোর দাঙ্গা বাধিয়া উঠিল। দুই তিন জন খুন হইল। পাঁচ সাত জন আহত হইয়া রক্তাক্তদেহে পড়িয়া রহিল। একজন ভৈরব বিশ্বাসকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। কিন্তু ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া ভৈরব বিশ্বাস পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছিল; বেগতিক বুঝিয়া ঘোড়ার উপর চড়িয়া সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। একব্যক্তি পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল, ভৈরব বিশ্বাস পলাইতেছে দেখিয়া, আপন হাতের লাঠি গাছটা ছুড়িয়া মারিল। লাঠি গাছটা ঘুরিতে ঘুরিতে বোঁ করিয়া ভৈরব বিশ্বাসের মাথায় লাগিল। লাগিল বটে; কিন্তু আঘাত তত গুরুতর হইল না, ঝোঁক সামলাইয়া লইয়া ভৈরব বিশ্বাস ঘোড়া ছুটাইয়া কাছারীর দিকে চলিয়া গেল।

এদিকে সেনাপতি পথ-প্রদর্শন করিলেন, দিশা পাইকের দল

যে যে দিকে সুবিধা পাইল, হতাহতের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ছুটিয়া পলাইল।

ভৈরব বিশ্বাস রাজধানীতে পৌঁছিয়া রাষ্ট্র করিল,—সোণাডাঙ্গা গ্রামে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত। দেবীপ্রসাদ হুকুম দিলেন,—"আজই সৈন্যদল পাঠাইয়া সোণাডাঙ্গা দগ্ধ করিয়া দাও।"

দশম পরিচ্ছেদ।

কামিনীমণি।

একখানি ঘর পুড়িবে বলিয়া ভৈরব বিশ্বাস আগুন লাগাইয়াছিল; কিন্তু সে আগুনে গ্রামকে গ্রাম ভস্মীভূত হইয়া গেল। নির্দ্দোষ-দোষীর বিচার হইল না, কে অনুগত, কে অবাধ্য—নির্ণয় করিবার অবসর হইল না, এই ভাবে লোকের যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া গেল।

একদিকে এই ব্যাপার; অন্যদিকে দেবীপ্রসাদের বিলাস-ব্যসন। যেদিন হইতে দেবীপ্রসাদ রাজপাট অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সেই দিন হইতেই মদ্য-মাংস ও বারবিলাসিনীগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেই দিন হইতেই দেবসেবা প্রভৃতির ব্যয় কমাইয়া দিয়া দেবীপ্রসাদ নানারূপ অপব্যয়ের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছেন। কেবল কি তাই? সেই দিন হইতেই দেবীপ্রসাদ কুলের কুল-কামিনীগণের প্রতিও সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন! সেই দিন হইতে দেবীপ্রসাদ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্রাপহরণেও সঙ্কোচ-বোধ করিতেছেন না।

যে দিন সোণাডাঙ্গার সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, সেই দিনই সন্ধ্যার

পর, কামিনীমণিকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আগুন লইয়া লোক ব্যস্ত ছিল, কোন্ সময়ে কে তাহাকে কোথায় লইয়া গেল,—কিছুই ঠিক হইল না। সন্ধ্যার সময় তাহার মা পাড়ায় পাড়ায় কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফুকারিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"ওগো! তোমরা দেখিয়াছ কি—আমার কামিনী কোথায় গেল? ক'দিন থেকে আমি তাকে চোখে চোখে রেখে আস্‌ছি; মা আমার ভয়ে জড়সড় হ'য়ে আমার আঁচলটী ধ'রে আছে! কিন্তু ঘরখানায় আগুন লাগায়, আমি ভাবা-চ্যাগা খেয়ে দাসেদের ডাক্‌তে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি—আমার কামিনী আর ঘরে নেই। কে তারে লুটে নিয়ে গিয়েছে!"

এই বলিতে বলিতে, পাগলিনীর স্থায় থাকমণি নাটোরের দিকে ছুটিয়াছে। নাটোর হইতে তাহাদের গ্রাম—দুই ক্রোশ ব্যবধান। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এমনইভাবে আলুথালু হইয়া সে ছুটিয়াছে। কে যেন তাহাকে বলিয়াছে—"এই পথ দিয়ে তোর মেয়েকে নিয়ে তিন জন লোক নাটোরের দিকে ছুটে গিয়েছে।" সত্য-মিথ্যা—থাকমণি এখনও ঠিক করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার মনে বিশ্বাস হইয়াছে—রাজধানীতে যেরূপ ব্যভিচার চলিয়াছে, তাহাতে মেয়েটাকে সেইখানেই লইয়া যাওয়া সম্ভবপর। বিশেষতঃ তিন দিন পূর্ব্বে ছলনা করিয়া, তাহার নিকট হইতে তাহার কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য নাটোর হইতে একটা স্ত্রীলোক আসিয়াছিল! তাই তাহার বিশ্বাস, কামিনীমণিকে সেইখানেই লইয়া গিয়াছে।

কামিনীমণি সদ্গোপের মেয়ে। বালবিধবা। বয়ঃক্রম ষোড়শ উত্তীর্ণপ্রায়। পল্লীগ্রামে সে রূপসী বলিয়া পরিচিতা! দুই বৎসর হইল তাহার পিতা ভগবান্ দাসের মৃত্যু হইয়াছে; পিতার মৃত্যুর পর বৎসরই সে বিধবা হয়, জাতিতে সদ্গোপ বটে; কিন্তু তাহার

আচরণ—ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ন্যায়। যেমন করিয়া ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য করে, কামিনীমণি সেই ভাবেই দিনযাপন করিয়া থাকে। চাষার ঘরে তেমন নিষ্ঠা ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহার কার্য্যে ও সৌন্দর্য্যে চারিদিকে ঢিটি ঢিটি পড়িয়া গিয়াছে। সেই ভয়েই থাকমণি সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত। পক্ষপুটে শাবককে আবৃত করিয়া রাখার ন্যায় থাকমণি, কন্যা কামিনীমণিকে এতদিন আগুলিয়া রাখিয়াছিল। আজ কি সর্ব্বনাশ! আজ তাহার অঞ্চল ছিন্ন করিয়া তাহার কামিনীকে কে হরণ করিয়া লইয়া গেল!

থাকমণির চীৎকারে গ্রাম কাঁপিয়া উঠিয়াছে; যে পথ দিয়া সে চেঁচাইতে চেঁচাইতে রাজধানীর দিকে চলিয়াছে, সে পথ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া, তাহার আকুলি ব্যাকুলি দেখিয়া, পথের পথিকেরা পর্য্যন্ত—যাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহারা পর্য্যন্ত—ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

থাকমণি যখন নাটোর পৌঁছিল, তাহার সঙ্গে অন্যূন চল্লিশ পঞ্চাশ জন স্ত্রী-পুরুষ জমিয়া গিয়াছে। সে যখন সহরে প্রবেশ করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, তখনও শত শত লোক তাহার সঙ্গে জমিয়া গেল। কেহ বা রঙ্গ দেখিবার জন্য, কেহ বা কুৎসা শুনিবার জন্য, কেহ বা দেবীপ্রসাদের প্রতি টিটকারী দিবার জন্য, কেহ বা অত্যাচারীর পরিণাম দেখিবার জন্য—নানা জন থাকমণির সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। সহরটা যেন তোলপাড় হইয়া উঠিল! একটা স্ত্রীলোক এতটা করিয়া তুলিতে পারে,—যে দেখিল, সেই বিস্মিত হইল!

থাকমণি উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! মান-সম্ভ্রম বা প্রাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না; সে এখন মরিয়া হইয়াছে! তাহার প্রতিজ্ঞা—সে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিবে।

সে এক একবার চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—"এই কি রাজার

অধর্ম্ম! এ রাজ্য রসাতলে যাক্—এ রাজ্য রসাতলে যাক্।" সে এক একবার অভিসম্পাত দিতেছে,—"আমার প্রাণে এই কষ্ট যে দিল, তার মাথায় বাজ পড়ুক!" সে এক একবার আকাশের পানে চাহিয়া বলিতেছে,—"হে ভগবান্! তুমি যদি সত্য হও! আর আমি যদি সত্য হই, তার সর্ব্বনাশ এখনি হোক্।"

এত সিপাহী শান্ত্রী আছে, এত লোক জন জমিয়াছে, কিন্তু কেহই থাকমণিকে থামাইতে পারিতেছে না। সে যে কেন এমন চীৎকার করিতেছে, অনেকে তাহাও বুঝিতে পারিতেছে না। অথচ, রাজার নিন্দা, রাজবংশের উচ্ছেদ-কামনা!—কি জানি কেন, অনেকের প্রাণে তাহাতে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে।

কিন্তু থাকমণি কোথায় চলিয়াছে? যে রক্ষক, সে-ই ভক্ষক।—থাকমণি কাহার কাছে প্রতীকার পাইবে; সেদিকে থাকমণির ভ্রূক্ষেপ নাই; সে বলিতেছে, "যে রাজার রাজ্যে এমন অত্যাচার, সে রাজার সর্ব্বনাশ হোক্!"

থাকমণি যখন এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে রাজবাড়ীর দিকে চলিয়াছে, অনেকেই তখন তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"হাঁ গা বাছা! তোমার কি হয়েছে গা? তুমি অমন কচ্চ কেন গা?"

কিন্তু থাকমণি কাহাকেও উত্তর দিল না। সে কেবলই চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"সর্ব্বনাশ হোক্, সর্ব্বনাশ হোক্।"

থাকমণি যখন রাজবাড়ীর ফটকের মধ্যে ঢুকিবার উপক্রম করিতেছে, সেই সময়েও একটী ব্রাহ্মণ থাকমণির মত "সর্ব্বনাশ হোক্, সর্ব্বনাশ হোক্" বলিতে বলিতে রাজবাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন।

একি! ব্রাহ্মণ আবার কেন থাকমণির কথারই প্রতিধ্বনি করেন?

পথের লোক যাহারা থাকমণির কথায় চমকিয়া উঠিয়াছিল, ব্রাহ্মণের ঐ ভাব দেখিয়া তাহারা যেন আরও চমকিত হইল। এক জন জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর মশায়! আপনার আবার কি সর্ব্বনাশ হ'ল ?"

ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"আমার আবার কি সর্ব্বনাশ হইল—শুনিবে ? সর্ব্বস্ব গ্রাস ক'রেও বেটাদের পেট পোরে না, তাই আমার ব্রহ্মোত্তর-টুক্ পর্য্যন্ত গ্রাস কর্‌তে ব'সেছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা। চমকিয়া উঠিলেন ; কহিলেন,—নাটোর রাজ্যে ব্রহ্মোত্তরগ্রাস!—সত্যি ব'লছেন নাকি ?"

ব্রাহ্মণ।—"সত্যি নয় কি, মিথ্যে ব'লছি আমি ? আমার সামান্য একটুক্ ব্রহ্মোত্তর ছিল ; মা ভবানী ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠার সময় সেইটুকু আমায় দান ক'রে গিয়াছিলেন। হায় হায়! তিনিও গেলেন ; আর পাজী বেটারা, নচ্ছার বেটারা, আমার—"

প্রশ্নকর্ত্তা বাধা দিয়া কহিলেন,—"ঠাকুর, কাকে গালাগালি পাড়ছেন ? আপনি কি রাজা দেবীপ্রসাদের কাছে কোন দরবার ক'রেছিলেন ? তিনি কি আপনাকে ব'লেছেন—আপনার ব্রহ্মোত্তর ফেরত দেবেন না ?"

ব্রাহ্মণ।—তাঁর কাছে কি নায়েব বেটা আমায় পৌঁছুতে দিলে! আমি তিন দিন ধ'রে রাজবাটীতে ধন্না দিয়ে প'ড়ে আছি, কিন্তু নায়েব বেটা আমায় কোনও মতে রাজার কাছে ঘেঁস্‌তে দিলে না। শেষ, আজ ব'ল্‌লে কি না—যাওনা ঠাকুর, পাগলামি ক'রো না ; যে জমি একবার সরকারভুক্ত করা হ'য়েছে, সে জমি আর ফেরত পাওয়া যায় কি ?"

"তাতে আপনি কি ব'ললেন ?"

"আমি কত মিনতি ক'র্‌লাম, কত আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লাম, হাতে পায়ে জড়িয়ে ধ'র্‌লাম ; শেষ ব'ললাম, আমি জমি পাই না পাই, আমার

প্রার্থনাটা একবার রাজার কাছে জানাতে দেন! কিন্তু বেটা তাও কি শুন্‌লে!"

এই সময় পিছন হইতে একজন টিপ্পনী কাটিয়া কহিল,—"রাজার গড়াপেটা না থাক্‌লে কি আর নায়েব কিছু ক'র্‌তে পারে? সে কর্ম্মচারী বৈ তো নয়?"

ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া উত্তর দিলেন,—"তিনি যিনিই হউন, ঐ দেবতা যদি সত্য হন, তার সর্ব্বনাশ হ'তেই হবে। আমার ব্রহ্মোত্তর বেশী দিন তাকে ভোগ ক'র্‌তে হবে না। আমি সারাদিন উপবাস ক'রে তার দরজায় প'ড়ে রইলাম; সে একবার ফিরেও চাইলে না। ভগবান! তুমিই এর বিচার ক'রো—তুমিই এর বিচার ক'রো।"

ফটকের সম্মুখে এইরূপ গোলমাল হইতেছে শুনিয়া, ফটকের বরকন্দাজ আসিয়া স্বভাবোচিত মধুর-স্বরে কহিল,—"আরে কাহে বক্‌বক্ করতেহেঁ? ভাগ যাও, ভাগ যাও!"

কিন্তু কেহই ভাগিল না! এক দিকে ব্রাহ্মণ চীৎকার করিতে লাগিল; অন্য দিকে, থাকমণি চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। দ্বারবান তাহাতে অধিকতর রুষ্ট হইয়া, বলিতে লাগিল,—"নেহি ভাগ-নেসে, ডাণ্ডা চালায়গা:—সিধা কর্ দেগা।"

ডাণ্ডার কথা শুনিয়া, দর্শকবৃন্দ আপনা-আপনিই অন্তর্হিত হইল! নিরুপায় বুঝিয়া, ব্রাহ্মণও স্থানত্যাগ করিলেন। থাকমণি রাজবাড়ীর মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিল বটে; কিন্তু তাহার সে চেষ্টা বৃথা হইল। স্ত্রীলোক বলিয়া দ্বারবানেরা তাহার গাত্র স্পর্শ করিল না বটে; কিন্তু কোনক্রমেই তাহাকে ফটকের মধ্যে ঢুকিতে দিল না।

সারারাত্রি ফটকের ধারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া থাক-মণিও যে কোথায় চলিয়া গেল, পরদিন কেহই আর তাহার সন্ধান পাইল না।

তদবধি আজি পর্য্যন্ত বহু গবেষণা করিয়াও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কেহই কামিনীমণির বা থাকমণির কোনও সন্ধান করিতে পারেন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিষম ভাবনা।

দিনের পর দিন চলিয়া গেল; উপায় কিছুই হইল না। রামকান্ত দয়ারামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, কতই আশার মোহে মুগ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন সে আশাও যে নির্ম্মূলপ্রায়। তিন দিনের দিন দয়ারাম রায় সংবাদ পাঠাইয়াছেন,—"রাজ্য পাইতে হইলে, আপাততঃ অন্তত লক্ষ টাকার প্রয়োজন। যদি কোন প্রকারে টাকার যোগাড় করিয়া দিতে পার, আমি চেষ্টা পাইতে পারি; তদ্ভিন্ন, বৃথা আশা—বৃথা চেষ্টা।"

সে অবস্থায়, রামকান্ত রায় লক্ষ টাকা কোথায় পাইবেন? শ্বশুর আত্মারাম চৌধুরীর যাহা কিছু ছিল, তাহা তিনি পূর্ব্বেই দিয়াছেন। পাকুড়িয়ার ঠাকুর মহাশয়গণ, কখনই যথাসাধ্য সাহায্যের ত্রুটি করেন নাই। সুতরাং আর আশা কোথায়? দয়ারাম যে ভাবে টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, টাকা না পাইলে, তিনি যে কোনও কাজে অগ্রসর হইবেন, কিছুতেই তাহা মনে হয় না।

কিন্তু টাকার উপায় কি? রামকান্ত হতাশ হইয়া তাই ভবানীকে বলিতেছেন,—"ভবানী! আর আশা নাই! তুমি রায় মহাশয়কে আজিও চিনিতে পার নাই! আমাদের অবস্থা তিনি সম্পূর্ণ অবগত; অথচ, আমাদের উপর এই চাপ।"

ভবানী আগ্রহান্বিত হইয়া কহিলেন,—"কেন? কি হ'য়েছে? তিনি কি ব'লে পাঠিয়েছেন যে, আপনি ব'লছেন—আর আশা নেই?"

রামকান্ত।—"আর ভবানী! সে কথা আর শুনে ফল কি? আমাদের চেষ্টার অসাধ্য—আমাদের ভাবনার অসাধ্য। রায় মহাশয়কে তুমি এখনও চিনিতে পার নাই।"

ভবানী।—"কি হ'য়েছে বলুন না?"

রামকান্ত।—"ব'লবো আর কি, ছাই মাথা-মুণ্ডু! আর কোন আশাই নাই।"

ভবানী।—"আপনি অল্পেই বিচলিত হন; আশা না থাকে, সে পরের কথা; কিন্তু তিনি কি ব'লেছেন—শুনতে বাধা আছে কি?"

রামকান্ত।—"শুনবে, তবে শোন। তিনি ব'লেছেন কি—চাই টাকা।—লক্ষ টাকা না পেলে, তিনি কোনও চেষ্টা করিতেই পারবেন না। কেমন শুনলে?"

ভবানী গম্ভীরভাবে নীরবে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। রামকান্ত পুনরায় কহিলেন,—"মুখের দিকে চেয়ে রইলে যে! আরও কিছু শুনবার আশা আছে নাকি?"

ভবানী বলিলেন,—"আরও কিছু ব'লেছেন নাকি?"

রামকান্ত।—"আরও ব'লেছেন, টাকা দিলেই যে রাজ্য ফিরে পাওয়া যাবে, সে বিষয়েও নিশ্চয়তা নাই। তিনি চেষ্টা ক'রবেন মাত্র। টাকা না পেলে, তিনি সে চেষ্টাও ক'রবেন না।"

ভবানী।—"আপনি তাঁকে কোনও উত্তর দিয়েছেন কি?"

রামকান্ত।—"উত্তর আর কি দিব? টাকা থাকতো, উত্তর দিতাম। টাকা নাই, কাজেই নিরুত্তর থাকতে হ'য়েছে। আমাদের এই দুর্দ্দিন; আমরা লক্ষ টাকা কোথায় পাবো?"

ভবানী।—"কতদিনের মধ্যে টাকা দিতে হবে?"

রামকান্ত।—"যত শীঘ্র হয়! তিনি ব'লেছেন—সাত দিনের মধ্যে দেওয়াই চাই। বল দেখি ভবানী! কোনও উপায় আছে কি?"

ভবানী।—"টাকার জন্য কোন চেষ্টা করা হবে না?"

রামকান্ত।—"চেষ্টা আর কি ক'র্‌বো? আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে, শরীর খারাপ হওয়ায়, চন্দনারায়ণ ঠাকুর দেশে গিয়েছেন। তিনি এখানে থাক্‌লেও—অত টাকা না হোক্—কতক টাকার যোগাড় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।" পরক্ষণেই আবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"তিনি থেকেই বা কি ক'র্‌তেন? টাকা কি জান ভবানী—অবস্থার সাথী। তাঁর এখন সে অবস্থা নয় যে, তাঁকেও কেউ ধার দেয়। সুতরাং আর কিসের আশা?"

রামকান্ত একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শেষ-বাক্যের সহিত দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল।

ভবানী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একটা কথা ব'লতে চাই—যদি রাগ না করেন?"

রামকান্ত বিস্ময়-সহকারে উত্তর দিলেন,—"কেন ভবানী!—ও কথা ব'লছ কেন? তোমার কথায় আমি রাগ কর্‌বো? কি বলতে চাও, নিঃসঙ্কোচে বল।"

ভবানী।—"বলি—বল্‌ছি কি—আমার গায়ের এই গহনা গুলার দাম লক্ষ টাকা হয় না কি?"

রামকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন,—"এ এ! ভবানী! তুমি কি ব'লছ? এমন রাজ্যে আমার আবশ্যক নাই। আমি ভিক্ষে ক'রে খাব—সেও বরং ভাল। তবু তোমার গা থেকে গহনা খুলে নিতে পারবো না। এই যে দেনায় ডুবে আছি; আমার স্বপ্নেও কখনও মনে হয় নি যে, তোমার গায়ে গহনা আছে। কেন তুমি এমন অমঙ্গলের কথা কও?"

ভবানী।—"আপনি উতলা হচ্ছেন কেন? আমি যা বলি—একবার শুনুন।"

রামকান্ত।—"আর যা বল—বল; ওকথা আর আমায় ব'ল না। আমার দারুণ সন্দেহ, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মাঝখান হ'তে তুমি কেন গহনার কথা মুখে আনৃছ? একে ডুবেছি, গহনাগুলি কেন আর তার সঙ্গে যায়?"

ভবানী।—"আপনি যা ব'লছেন, তা অন্যায় বলেন নি। কিন্তু আশায় মানুষ বেঁচে থাকে,—আশায় মানুষ চেষ্টা ক'রে দেখে। আমরা যেরূপ ধীরে ধীরে দেনায় জড়িত হয়ে পড়ছি, কোন্ দিন আপনা-আপনি সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে। গহনা তো দূরের কথা, এতই গিয়েছে, আর গহনা ক'খানার মায়া ক'রে কি হবে? যদি হবার হয়, আমার মনে নিচ্ছে, এতেই হবে;—নিশ্চেষ্ট হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নয়।"

রামকান্ত।—"এত চেষ্টাতেও নিশ্চিন্ত হয়ে আছি—ব'লছ। আজ এক বৎসরের বেশী হ'তে চ'ললো, এই মুর্শিদাবাদ এসেই রোজ রোজ এত চেষ্টা ক'রছি; তবু কি চেষ্টার শেষ হবে না। তুমি যাই বল, আর যাই কর, তোমার গা থেকে গহনা খুলে নিতে আমি কোনরূপেই পারবো না। তুমি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।"

ভবানী।—"আজ আপনি আমায় এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ ক'রতে ব'লছেন বটে, কিন্তু অদৃষ্টে কি আছে, কে ব'লতে পারে? যে দিন আমরা নাটোর পরিত্যাগ ক'রে আসতে বাধ্য হই, সেই দিনই যদি গহনাগুলো খুলে দিয়ে আসতে হতো! বিপক্ষ পক্ষ যদি জিদ ক'রে ব'লতো—গহনাগুলো খুলে না দিলে ছাড়বো না! মনে করুন না কেন—রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সব চলে গিয়েছে; যদি যাবার হয় কিছুতেই আমরা রাখতে পারবো না। যদি আমাদের হয়, আপনি

নিশ্চয় জানিবেন, আমাদের গহনা আমাদের কাছেই ফিরে আসবে।”

রামকান্ত।—“দয়ারাম রায় যে প্রতারণা ক'র্‌বে না, কিসে বুঝলে? দয়ারাম রায় যে পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ নেবে না, তাই বা কেমন ক'রে জান্‌লে?”

ভবানী।—“সেটা আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি। রায় মহাশয়ের যদি উচ্চ মন না হ'তো, তিনি যদি সঙ্কীর্ণমনা হ'তেন, তা হ'লে তাঁর এত সম্ভ্রম-গৌরব কখনই হ'ত না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তিনি প্রতারণার লোক নন। আমার গহনা বিক্রয়ের অর্থ নিয়ে তিনি কখনও আত্মসাৎ ক'র্‌তে পার্‌বেন না।”

রামকান্ত।—“যাই বল, যতই বোঝাও, আমার মন প্রবোধ মানে না। ভবানী! তোমায় কিছু দিতে পারি-নে—সেই ক্ষোভেই আমার প্রাণ অবসন্ন; ইহার উপর তুমি কেমন ক'রে ও কথা বল! আমি কোন্ প্রাণে তোমার গায়ের গহনাগুলি খুলে নেব?”

ভবানী।—“আপনি তো আর একেবারেই নিচ্ছেন-না! রাজ্য-লাভ হ'লে, আমার গহনা আবার আমায় তৈয়ার ক'রে দিলেই তো হবে। তখন, আপনি ইচ্ছে ক'র্‌লে এর চেয়ে ঢের বেশী গহনা দিতে পার্‌বেন। সুতরাং আমি মিনতি করি—এ বিষয়ে আপনি আর অন্য মত ক'রবেন না।”

রামকান্ত মনে মনে বলিলেন,—“ভবানী! এতদিন তোমার কোনও কথা শুনি-নি। শুনি-নি ব'লেই কি শেষে তার এই প্রতি-শোধ নিতে ব'সেছ? তোমার কোনও অস্ত্রে ফল ফলেনি ব'লে কি শেষে এই শক্তিশেল পরিত্যাগ কর্‌বার ইচ্ছে ক'রেছ? ভাল—যা-মনে আছে তোমার তাই কর। তোমার কথা শুনিনি ব'লে

লাঞ্ছনার পরিসীমা নাই। যদি প্রথম দিন থেকে তোমার পরামর্শ অনুসারে কাজ ক'রে চ'লতাম, তা হ'লে বোধ হয় আমার এ অবস্থা কখনই হ'ত না। তোমার কথা অবহেলা ক'রে অবধি আমায় এই যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হচ্ছে। যাক্—যা হবার হয়েছে; আমি আর তোমার কথায় অবহেলা ক'রছি না!"

প্রকাশ্যে রামকান্ত কহিলেন,—"ভবানী! তোমার যা ভাল লাগে, তুমি তাই কর। আমায় আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না।"

সেদিন এই পর্য্যন্ত হইয়াই স্থগিত রহিল। ভবানী মনে মনে স্থির করিলেন,—পরদিন প্রাতঃকালে স্বামীকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার দ্বারাই গহনাগুলি রায়-মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সতী।

যেদিন প্রাতঃকালে রামকান্ত রায় দয়ারামের নিকট গহনা লইয়া যাইবেন—স্থির করিয়াছিলেন, সেইদিন সহরে এক হুলস্থূল ব্যাপার বাধিয়া গেল। সুতরাং সেদিন আর গহনা পাঠান হইল না। সেই দিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই রামকান্ত দেখিতে পাইলেন,—পিপড়ার সারের ন্যায় পিলপিল করিয়া রাজপথ দিয়া জন-স্রোত চলিয়াছে।

সহসা এত লোক কেন যাইতেছে, কোথায় যাইতেছে? সকলেই বা এক দিকে যায় কেন?

মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী। রাজধানীতে সামান্য ঘটনাতেই একটা হৈ-চৈ বাধিয়া যায়। এ ব্যাপারে হৈ-চৈ না হইবে কেন? রামকান্ত পূর্ব্ব হইতেই সেই জনস্রোতের কারণ অবগত ছিলেন। এখন শুনিলেন,—"দয়ারাম রায়ও সেই জন-স্রোতে মিশিয়া গিয়াছেন।" জনস্রোত কাশীমবাজার-অভিমুখে ধাবমান কেন? এত লোক সহসা কাশীমবাজারের দিকেই বা চলিয়াছে কেন? তবে কি ইংরেজের সহিত নবাবের আবার কোনরূপ মনোমালিন্য উপস্থিত? অথবা, সেখানে ইংরেজেরা কোনও অদ্ভুত আশ্চর্য্য প্রদর্শনী খুলিয়াছে?

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কাশীমবাজারে ইংরেজের বাণিজ্য প্রবলবেগে চলিয়াছে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার হ্যামিণ্টন, আপনার নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈষণার পরিচয় দিয়া, বাদসাহ ফেরোকসিয়ারের নিকট হইতে বঙ্গদেশে ইংরেজজাতির বাণিজ্যসংক্রান্ত যে সুবিধা-সর্ত্ত লাভ করিয়াছিলেন; ইংরেজের দূতরূপে দিল্লী গমন করিয়া, ফেরোকসিয়ারের কঠিন পীড়ার চিকিৎসায়, সম্রাট পুরস্কার প্রদানে অগ্রসর হইলে, নিজের জন্য সে পুরস্কার না লইয়া, হ্যামিণ্টন ভারতবর্ষে ইংরেজজাতির বাণিজ্যপ্রসার-বৃদ্ধির যে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; তাহার ফল এখন ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। আজি সপ্তবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে ডাক্তার হ্যামিণ্টন, ইংরেজজাতির সৌভাগ্যতরুর যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সহায়তা-প্রাপ্তিরূপ জলসিঞ্চনে সে বীজ এখন মুকুলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নবাব আলিবর্দ্দী যখন মহারাষ্ট্রগণের আক্রমণে আত্মরক্ষায় উদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন; তাঁহার সম্মতি পাইয়া ইংরেজগণও এই সময়ে কলিকাতার চতুর্দ্দিকে খাল খনন করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বেষ্টন

করিয়া যে মহারাষ্ট্রখাদ খনিত হয়, তাহাও এই সময়ের ঘটনা। কাশীম-বাজারেও ইংরেজ-বণিক্‌গণ কুঠী স্থাপন করিয়া, এই সময়ে আপনাদের আধিপত্য-ভিত্তির দৃঢ়তা-সম্পাদন করিতেছিলেন। সুতরাং কাশীম-বাজারের প্রতি এ সময়ে সকলেরই দৃষ্টি স্বতঃসঞ্চালিত হইয়াছিল।

আজ আবার এমন কি ঘটনা ঘটিল?—যাহার জন্য কাতারে কাতারে কাশীমবাজারের দিকে লোক ছুটিতেছে।

মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রায় সকলেই আজ কাশীম-বাজারের দিকে অগ্রসর। নবাবের প্রতিনিধিগণ সেখানে উপস্থিত। ইংরেজ বণিক্‌গণ কৌতূহলাবিষ্ট। ফতেচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়রায়াণ, আলমচাঁদ—সকলেই সেখানে গমন করিয়াছেন। ইংরেজদিগের কাশীমবাজারস্থ কুঠীর কার্য্যাধ্যক্ষ সার ফ্রান্সিস রাসেল, মিঃ হলওয়েল, সৈনিক ড্যানিয়েল—কে সেখানে নাই? দয়ারাম রায়ও সেখানে গিয়াছেন। রামকান্ত রায়েরও সেখানে যাইতে কৌতূহল হইল। ভবানীও তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলেন। তাঁহাদের বাসা হইতে কাশীমবাজার—দুই মাইল ব্যবধানের মধ্যে। একখানি বজরার বন্দোবস্ত করিয়া সস্ত্রীক রামকান্ত রায়ও কাশীমবাজারে গমন করিলেন।

কি হইয়াছে—সেখানে?—কি ঘটিয়াছে—কাশীমবাজারে?—যাহা দেখিবার জন্য এত লোক গঙ্গার ধারে ধারে দণ্ডায়মান। গাছের উপরে লোক; নৌকার উপরে লোক; বজরার উপরে লোক; জাহাজের উপরে লোক। পাল্কীর ভিতরে লোক; গাড়ীর ভিতরে লোক; চড়ার উপরে—পরপারে লোক;—গঙ্গার ধারে কেন আজি এই লোক-সমুদ্র তরঙ্গায়িত?

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কাশীমবাজারের ঘাটে এই ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দিন প্রত্যূষে ৫টার সময় রামচন্দ্র পাণ্ডে

নামক জনৈক-মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের লোকান্তর ঘটে। ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষ। তাঁহার স্ত্রীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর। ব্রাহ্মণ, দুই কন্যা এক পুত্র সন্তান রাখিয়া যেদিন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তাঁহার সতী সাধ্বী পুণ্যবতী স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করিতে কৃত-সংকল্প হন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব সেই যুবতী ব্রাহ্মণ-বিধবাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। চিতা-প্রবেশের যন্ত্রণার বিষয়, পিতৃহীন শিশু-সন্তানগণের পরিণামের বিষয়—তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝাইবার চেষ্টা পান। কিন্তু সতী কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইতে সম্মত হন না। কাশীমবাজারে রামচন্দ্র পণ্ডিতের যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি ও মান-সম্ভ্রম ছিল। সুতরাং তাৎকালিক প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ সকলেই তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে নিরস্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইলেন। ইংরেজকুঠির অধ্যক্ষ ফ্রান্সিস রাসেলের পত্নী, সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, সতীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; মহারাষ্ট্র-মহিলাকে আপন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; জীবন্তে দগ্ধ হওয়ার ভীষণতা জ্বলন্ত ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন; তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার শিশু-সন্তান তিনটীর কি অবস্থা হইবে, তাহাও বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইলেন না! কিন্তু সতী তাঁহার কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না; বলিলেন,—"আপনার প্রাণ যখন সত্যসত্যই করুণায় আর্দ্র হইয়াছে; তখন আপনি আমার শিশু সন্তান কয়টীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। সেই আমার সান্ত্বনা।"

পিতা মাতা আত্মীয়-স্বজন আসিয়াও সতীকে কতরূপে বুঝাইলেন। পুত্রকন্যাগণ সম্মুখে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। কে তাহাদের আহার দিবে, কে তাহাদিগকে শুশ্রূষা করিবে,—সকলেই করুণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্র মহিলা সকলের কথাতেই

কিন্তু উত্তর দিলেন,—"যিনি জীবণদাতা, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা আছেন। আপনারা বৃথা কেন ভাবিতেছেন?"

সতী কাহারও অনুরোধ শুনিলেন না। তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিলেন;—"আপনারা বাধা দিবেন না; আমি নিশ্চয় সহমরণে যাইব। বাধা দিলেও আমায় কেহ রক্ষা করিতে পারিবেন না; আমার মৃত্যু আমারই হাতে। কতক্ষণ কে আমাকে আট্‌কাইয়া রাখিবে?"

আজ সতী সহমরণে যাইবেন। মুর্শিদাবাদের এক প্রান্ত হইতে, অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত—"সতী সহমরণে যাইবেন!" কাশীম-বাজারের গঙ্গার ধারে আজ তাহারই আয়োজন হইতেছে। মানুষ জীবন্তে কেমন করিয়া জলন্ত অনলে প্রবেশ করিবে;—তাহাই দেখি-বার জন্য কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বেলা এক প্রহরের সময় রামচন্দ্র পণ্ডিতের শব-দেহ ঘাটের ধারে সংবাহিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতা পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিত হইয়া, সতী গঙ্গার ধারে উপস্থিত হন।

একদিকে নবাবের কর্ম্মচারীগণ, অন্যদিকে ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষ-গণ,—সকলেই লক্ষ্য করিতেছিলেন,—যেন কোন ক্রমে সতীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে চিতারোহণ করিতে দেওয়া না হয়। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ উৎকট পরীক্ষারও ব্যবস্থা চলিতেছিল।

প্রথম সংশয়-প্রশ্ন উঠিল'—সতী যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবেন কি না! অমনি প্রস্তাব হইল,—আপনি যদি জলন্ত অনলে একটী অঙ্গুলি দগ্ধ করিতে পারেন, কোনরূপ বিচলিত না হন, বুঝিব—আপনি সমর্থ হইবেন!

তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্জলিত হইল। লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল,—সতী হাসি-হাসি মুখে সেই জলন্ত অনলে অঙ্গুলি প্রদান

করিলেন। অঙ্গুলি পুড়িয়া জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ প্রতীয়মান হইল ; কিন্তু সতীর বদনমণ্ডলে অণুমাত্র যন্ত্রণার চিহ্ন অনুভূত হইল না।

কিন্তু তাহাতেও পরীক্ষকগণের সংশয় দূরীভূত হইল না। পুনরায় নূতন পরীক্ষার ব্যবস্থা হইল। সতী এক হস্তে জ্বলন্ত অগ্নি গ্রহণ করিলেন, অপর হস্তে ঘৃত লইয়া সেই আগুনের উপর প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হাতের উপর আগুন জ্বলিতে লাগিল।

এইরূপ নানা পরীক্ষার পর, দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, নবাবের অনুমতি-পত্র আসিল। সতীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। তিনি একে একে আত্মীয়-স্বজন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন পিতা-মাতার চরণধূলি মস্তকে লইলেন। পুত্র-কন্যাগণের প্রতি স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইলেন। তারপর, আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া, একখানি বস্ত্রের মধ্যে স্থাপন করিলেন।

ইতিমধ্যে চিতার উপর বংশখণ্ডে ও বৃক্ষপল্লবে একটী কুঞ্জ প্রস্তুত হইল। তাহার চারিধার শুষ্ক কাষ্ঠ ও বংশ প্রভৃতিতে আবৃত রহিল। সতীর প্রবেশের জন্য দক্ষিণদিকে অল্পপরিসর একটী পথ প্রস্তুত হইল। চারিজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চিতাপার্শ্বে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রপূত করিয়া প্রথমে চিতায় অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। তারপর চিতা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক, ব্রাহ্মণগণের উপদেশ-মত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, সতী এক একটী ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র সেই চিতানলে প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণের পশ্চাতে পশ্চাতে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সতী তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। অবশেষে হস্তের ও পদের অঙ্গুরীয় উন্মোচনপূর্ব্বক অলঙ্কারগুলির সঙ্গে বস্ত্রমধ্যে রক্ষা করিয়া, সতী সেই চিতাকুঞ্জের পথের সম্মুখে

দণ্ডায়মান হইলেন। এইবার আত্মীয়-স্বজন পুত্র কন্যাগণের নিকট তিনি শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইবার তাঁহার হস্তে ঘৃতাসক্ত সলিতা আনিয়া দিলেন। তখন, অগ্নিতে সেই সলিতা ধরাইয়া লইয়া, সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, সতী চিতাকুণ্ড-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রথমে সতী স্বামীর চরণযুগলে প্রণত হইলেন। পরিশেষে একান্তে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে আপনি জ্বলন্ত সলিতা লইয়া চিতার চারিদিকে ধরাইয়া দিতে লাগিলেন। চিতার প্রত্যেক পত্র-পুষ্প, প্রত্যেক কাষ্ঠ, প্রত্যেক বংশখণ্ড ঘৃতে অভিষিক্ত ছিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার উপর ধুনার প্রক্ষেপ পড়িতেছিল। সুতরাং নিমেষমধ্যে চিতানল লকলক্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

সকলে দেখিলেন।—হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান সকলে দেখিলেন—কি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে সতী চিতার মধ্যে স্বামিপদ-যুগল বক্ষে ধারণ করিয়া হাস্যমুখে বসিয়া আছেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! যে দেখিল, সে-ই বিস্মিত হইল! যে শুনিল, সে-ই চমকিত হইল। হলওয়েল ও ডেনিয়েল প্রমুখ ইংরেজগণও সে দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শত শত কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল।

দেখিতে দেখিতে সব ফুরাইল। পতিপার্শ্বে সতী স্বর্গে গমন করিলেন। সতীর চিতাভস্ম লইয়া লোকে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল।

সস্ত্রীক রামকান্ত রায়, বজরায় বসিয়া বসিয়া, এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন। অশ্রুজলে উভয়েরই বক্ষস্থল পরিপ্লাবিত হইল। ভবানী কহিলেন,—"পুণ্যবতী সতীর সার্থক মানব-জন্ম!" এই বলিয়া, চিতাভস্ম গ্রহণ করিয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলেন।

এই দিন অপরাহ্নে বজরায় করিয়া তাঁহারা যখন গৃহে ফিরিলেন; দেখিলেন,—মহাত্মা রঘুনাথ তর্কবাগীশ আসিয়া তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ভবানীর দীক্ষা-গুরু; অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও সাধক বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সহমরণে।

কাশীমবাজারের গঙ্গার ঘাটে মহারাষ্ট্র-মহিলার সহমরণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া, সেই পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিতে করিতে ভবানী পুনঃপুনঃ স্বামীকে কহিতে লাগিলেন,—"মহারাষ্ট্র-মহিলা যথার্থই সতী! এই সতী-শিরোমণির দৃষ্টান্ত যাহারা অনুসরণ করিতে পারে, তাহারাই ধন্য।"

এই চিন্তা, এই আলোচনা, বজরায় সমস্ত ক্ষণ চলিয়াছিল। বাসায় আসিয়াও, সেই আলোচনা চলিতে লাগিল। বিশেষতঃ ভবানীর দীক্ষাগুরু রঘুনাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, আলোচনা আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল।

মহারাষ্ট্র-মহিলার মহীয়সী স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, ভবানী গুরুদেবের চরণে প্রণত হইলেন। সহমরণের সেই কীর্ত্তি-কাহিনী স্মরণ করিতে করিতে রামকান্ত আসিয়াও তর্কবাগীশ মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই মস্তকে আশীর্ব্বাদের পুষ্প-বর্ষণ হইল।

প্রণাম করিয়া ভবানী অন্তরালে গমন করিলে, রামকান্ত রায়, তর্কবাগীশ মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া, বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে কহিলেন, —"আজ কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই প্রত্যক্ষ করিলাম! মহারাষ্ট্র-মহিলা যথার্থই সতী-শিরোমণি!"

এই বলিয়া রামকান্ত রায় একে একে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। অবশেষে কহিলেন,—"হিন্দু-বিধবার পক্ষে সহমরণই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম?"

তর্কবাগীশ মহাশয়, অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"হিন্দু-বিধবার পক্ষে সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য দুই-ই বিহিত আছে!"

রামকান্ত জিজ্ঞাসিলেন,—"সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য—এতদুভয়ের মধ্যে প্রশস্ত কোন্ পথ?"

তর্কবাগীশ মহাশয় কহিলেন,—"প্রশস্ত কোন পথ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। আমার মনে হয়, অবস্থা অনুসারে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারই শ্রেয়ঃ।"

রামকান্ত।—"সংহিতাকারগণের এ বিষয়ে কি মত?"

তর্কবাগীশ মহাশয় কহিতে লাগিলেন,—"সকল সংহিতায় এ বিষয়ের সুমীমাংসা নাই। মনুসংহিতায় সহমরণের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই না। মহর্ষি মনু কেবল ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়ই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,—

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥"

অর্থাৎ,—'অপুত্রক হইলেও সাধ্বী বিধবা স্ত্রীগণ ব্রহ্মচর্য্য বলে ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গে গমন করেন।" বিষ্ণু-সংহিতায়, পরাশর সংহিতায়, দক্ষ-সংহিতায়—এই বচনটী কোথাও অবিকল অথবা কোথাও

বা সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে দৃষ্ট হয়। অপিচ, পরাশর-সংহিতায় আছে,—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটি চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে॥"

অর্থাৎ "স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করেন। আর স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, তিনি সার্দ্ধত্রিকোটী কাল স্বর্গ ভোগ করেন। ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্ত হইতে বলপূর্ব্বক সর্পকে বাহির করিয়া আনে, সহমৃতা নারী তেমনি মৃত পতীকে উদ্ধার করিয়া, আনন্দ উপভোগ করেন।" দক্ষসংহিতায় এই একই উক্তি দৃষ্ট হয়। ব্যাসসংহিতাও উভয় পথকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উশনঃ-সংহিতারও ঐ মত। তবে কোন্ পথ প্রশস্ত—তাঁহারাও বিশেষ করিয়া নির্দ্ধারণ করেন নাই। মনুর ও পরাশরের বচন-পরম্পরা হইতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে দুই ব্যবস্থাই আছে।"

রামকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বিষয়ে পুরাণাদি শাস্ত্রের কি মত?"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"পুরাণাদি শাস্ত্রে উভয় পথই "প্রশস্ত" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।"

রামকান্ত কহিলেন,—"আমি কোনও কোনও পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি, সত্য-ত্রেতাদি যুগে সহমরণের প্রথা প্রচলিত ছিল না। মনুস্মৃতি সেই জন্যই উহার উল্লেখ করেন নাই। দ্বাপরযুগে সহমরণ-

প্রথার প্রচলন হয়, এবং পরাশর তাহার পোষকতা করিয়া যান। এইজন্য রামায়ণে সূর্য্যবংশের কোন বিধবার সহমরণ-সংবাদ প্রাপ্ত হইনি।"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"এ সকল কথা প্রকৃত শাস্ত্রদর্শীর উক্তি বলিয়া মানিতে পারি না। মনুসংহিতায় একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই যে, সত্য-ত্রেতা-যুগে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল না, তাহা বলা যায় না। রামায়ণে সহমরণের উল্লেখ নাই, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? রামায়ণে বহু সতীর সহমরণের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। দশরথের মৃত্যুর পর কৌশল্যা দেবী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনিও সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অযোধ্যাকাণ্ডে তাহা স্পষ্ট লিখিত আছে। লঙ্কাকাণ্ডে দেখিতে পাই,—অশোকবনে রামচন্দ্রের মায়ামুণ্ড দর্শনে সীতা দেবীও আক্ষেপ করিয়া অনুগমনের কথা কহিয়াছিলেন। উত্তরাকাণ্ডে বেদবতী বলিয়াছেন,—তাঁহার জননী পতির অনুগমন করিয়াছেন।"

রামকান্ত।—"প্রসিদ্ধ বংশের কোনও মহিলা সহমরণে গমন করিয়াছিলেন কি?"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"শ্রীকৃষ্ণের আটজন প্রধানা মহিষী ছিলেন; তাঁহারা আটজনেই সহমরণে গমন করেন। পাণ্ডুরাজার পরলোক-প্রাপ্তিতে মাদ্রী সহগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ কংসের পত্নী—"

তর্কবাগীশ মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না-হইতেই রামকান্ত কহিলেন,—"দ্বাপরে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা তো আমি পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু দ্বাপরের পূর্ব্বে কোনও প্রসিদ্ধ-বংশের কেহ সহমরণে গিয়াছিলেন কি?"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। দ্বাপর যুগের কথা বলিতে গেলে, বুঝিতে হয়, কত দ্বাপর আসিয়াছে—কত দ্বাপর চলিয়া গিয়াছে। এক এক মন্বন্তরেই একসপ্ততি দ্বাপরযুগ এবং তদনুরূপ সত্যত্রেতাদি যুগ পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া থাকে। সুতরাং এক এক মন্বন্তরের একাধিক সত্যযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপর যুগের সহমরণ, পরবর্ত্তী সত্যযুগের পূর্ব্ব ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারি না কি?"

রামকান্ত। "তাহা হউক। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কালে কখনও এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল কি?"

তর্কবাগীশ মহাশয়।"—সর্ব্বপ্রথম যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর, সেই মন্বন্তরেই শাস্ত্রে সহমরণের প্রমাণ পাওয়া যায়! স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর রাজচক্রবর্ত্তী যে পৃথুর নামানুসারে পৃথ্বী বা পৃথিবী নামের উৎপত্তি, তাহারই মহিষী সাধ্বী অর্চ্চি সহমৃতা হইয়াছিলেন।"

রামকান্ত।—"পুরাকালে সূর্য্যবংশে কেহ সহমৃতা হইয়াছিলেন কি?"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"সকল কথা আমার স্মরণ হয় না। এ বৃদ্ধ বয়সে সকল কথা মনে করিয়াও রাখিতে পারি না। তবে একটী কথা আমার মনে পড়িতেছে। পৃথ্বীপতি সগর রাজার জননী সহমৃতা হইবার জন্য চিতা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন বলিয়াই চিতানলে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহাকে বাধা দেওয়া হইয়াছিল।"

রামকান্ত।—"যাহাই হউক, মনু ও পরাশরোক্ত বচনের আপনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমার মনে হয়,—ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কেননা ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ-সংক্রান্ত শ্লোক কয়েকটীর ব্যাখ্যায় আমি বুঝিতে পারিলাম, মনু বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মচর্য্য-বলে ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গলাভ হয়।" আর পরাশর বলিয়াছেন,—"যিনি সহমৃতা হন, তিনি সার্দ্ধ ত্রিকোটি বৎসর স্বর্গভোগ করেন।" ইহাতে আমি এই বুঝিতেছি—"ব্রহ্মচর্য্যে ব্রহ্মচারীর ন্যায় অনন্তকাল স্বর্গবাস; আর সহমরণে স্বর্গবাসের সীমা নির্দ্ধারিত।"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা কি বুঝিব? কূট অর্থ সিদ্ধ করিবার পক্ষে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে।"

রামকান্ত।—"সে কথা আমি স্বীকার করি। তবে সাধারণতঃ যে সকল প্রসঙ্গের আলোচনা হয়, মনোমধ্যে যাহার আন্দোলন হওয়া সম্ভবপর, সেই কথাই আমি বলিতেছি; আচ্ছা! সহমরণে কতকটা আত্মনাশের পাপ বর্ত্তিতে পারে না কি? আর সেই জন্যই ঋষিগণ সহমরণের স্বর্গবাসের কাল-পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই কি?"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"ও সকল কথা মনে করিতে নাই। মনে করা উচিত,—সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য—দুই-ই প্রশস্ত।"

রামকান্ত।—"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু মনে যাহা উদয় হয়, তর্ক-বিতর্কে যে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহার নিরসন জন্যই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। ব্রহ্মচর্য্য প্রশস্ত পথ বলিয়া মনে হওয়ার আরও একটা কারণ আছে। যদি শারীরিক ক্লেশ স্বীকারের দিক্ দিয়াও দেখা যায়, তাহাতেও ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা অধিকতর নহে কি? সহমরণে দেহ পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়; পার্থিব জ্বালা-যন্ত্রণা ফুরাইয়া যায়। কিন্তু সে হিসাবে ব্রহ্মচর্য্য তুষানল। ব্রহ্মচর্য্যে আজীবন যন্ত্রণা-ভোগ করিতে হয়।"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"যন্ত্রণা প্রভৃতির বিষয়েও বহু তর্ক-বিতর্ক আছে। এ সকল জটিল প্রশ্নে চিত্ত আন্দোলিত না করিয়া, গুরুজনের বাক্যের অনুসরণই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়

রমিকান্ত।—"সে কথা আমি অস্বীকার করিতেছি না। তবে যে আপনাকে বিরক্ত করিতেছি, তাহার কারণ—সংশয়-নিরসন ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। এ বিষয়ে আমার আর একটী মাত্র বক্তব্য আছে। যদি অনুমতি করেন, জিজ্ঞাসা করি!"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"আচ্ছা বল।"

রামাকান্ত।—"ব্রহ্মচর্য্যে জগতের হিতসাধন হয়। বিধবা যদি ঐশ্বর্য্যশালিনী হন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য-হেতু তাঁহার ঐশ্বর্য্যের—অর্থের সদ্ব্যবহারে জগতের বহু উপকার হইতে পারে। এ সংসারে পুণ্যবতী ব্রহ্মচারিণী বিধবাদিগের দ্বারা কত সদনুষ্ঠানই হইয়া থাকে, তাহার কি ইয়ত্তা করা যায়? তার পর, বিধবা যদি পুত্র-কন্যাবতী হন, আর সেই পুত্র কন্যা যদি অপোগণ্ড শিশু হয়, তাহাদিগকে সংসারে ভাসাইয়া দিয়া স্বামীর সহগমন করিলে, জননীর সন্তান-পালন-ধর্ম্মে বিঘ্ন ঘটে না কি? সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে আরও দেখিতে পাই,—সহমরণে বরং কামনার প্রভাব, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান।"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"এ সম্বন্ধে তোমার মস্তিষ্ক বিশেষরূপ চঞ্চল হইয়াছে দেখিতেছি। তোমার প্রতিকথার উপরই তর্ক-বিতর্ক চলে। কিন্তু সেরূপ তর্কে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিতে পারে। সুতরাং জানিয়া রাখিও "শাস্ত্রের মতে—ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ দুই-ই শ্রেয়ঃ।"

রামকান্ত।—"তবে সংশয়স্থলে আপনার কি উপদেশ?"

তর্কবাগীশ মহাশয় কহিলেন,—"সে ক্ষেত্রে স্বামীর আদেশই সতীর শিরোধার্য্য। পতি যদি সহমৃতা হইতে নিষেধ করেন, ব্রহ্মচর্য্য উপদেশ দেন, সতীর তাহাই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ। অথবা পতি

আর বলিতে হইল না। রামকান্ত আপনা-আপনিই বলিলেন,—"আমি বুঝিয়াছি—আপনার অভিপ্রায়। আমার সকল সংশয় দূর হইয়াছে।"

ভবানী অন্তরালে বসিয়া সকল কথাই শুনিতেছিলেন। গুরুদেবের শেষ বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। পতিই সতীর দেবতা; দেবতার আদেশ প্রতিপালন ভিন্ন সতীর আর অন্য গতি কি থাকিতে পারে?

এদিকে কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া, তর্কবাগীশ মহাশয় ও রামকান্ত রায় উভয়েই আসন পরিত্যাগ করিলেন। উভয়েই সন্ধ্যা-বন্দনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আয়োজন।

দয়ারামের নিকট রামকান্ত রায় টাকা পাঠাইতে পারেন নাই; কিন্তু ভবানীর গহনাগুলি পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আর বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—"নগদ টাকার যোগাড় হইল না। সুতরাং গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থে কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

গহনাগুলি গ্রহণ করিবার সময়, দয়ারাম কোনই দ্বিরুক্তি করেন নাই। একবার মাত্র বলিয়াছিলেন,—"টাকা হইলেই ভাল হইত; এ আবার কার কাছে বিক্রয় করিতে যাইব?" যাহা হউক, তিনি গহনাগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গহনাগুলি পাইবার পর, দয়ারাম এখন বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন! তিনি ভাবিতেছেন,—রামকান্ত আমাকে বিশ্বাস করিয়া

পারিয়াছে কিনা? আমি সন্দেহ করিতেছিলাম, কিন্তু পরীক্ষার চরম হইয়া গিয়াছে। মা-ভবানী আমার উপর বড় চাল চালিয়াছেন। গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া দিয়া, আমার মত পাষাণ-হৃদয়কেও এইবার তিনি চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন। তা যাই হোক্, আমিও মাকে দেখাইব,—আমি তাঁর কেমন সন্তান।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দয়ারাম রায় রামকান্তের রাজ্যোদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় কি? ভাবিয়া অনেকক্ষণ-কুল-কিনারা পাইলেন না।

পরিশেষে দুটী উপায় স্থির হইল। এক উপায়—নবাবের কর্ম্মচারিবর্গকে হস্তগত করা। অন্য উপায়—নাটোর রাজ্যের প্রজাগণের সহানুভূতি লাভ।

শেষোক্ত বিষয়ে, তাঁহার মনে হইল,—"রামরূপকে পাইলে, এ সময়ে অনেকটা কাজ হইতে পারিত।"

তিনি পূর্ব্বেই সন্ধান লইয়াছিলেন,—রাজা রামকান্তের রাজস্ব লুট হওয়ার দিন আহত হইয়া সে যখন পলাশডাঙ্গার কাছারীতে অবস্থিতি করিতেছিল; রামকান্ত সেই সময়ে যথাসামর্থ্য অর্থাদি প্রদান করিয়া তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আপনার রাজ্যচ্যুতিতে রামরূপের শুশ্রূষার ত্রুটি হইবে অথচ, দেশে পাঠাইলে পরিজনবর্গের পরিচর্য্যায় তাহার জীবন—লাভের সম্ভাবনা আছে,—এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়াই রামকান্ত রায় রামরূপকে তাহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট প্রেরণ করেন।" তার পর দয়ারাম আরও সন্ধান পাইয়াছিলেন,—"রামরূপ এখন সারিয়া উঠিয়াছে।" রামরূপ—তাঁহার একান্ত-বিশ্বস্ত ও অনুগত। সুতরাং রামকান্তের রাজ্যোদ্ধার বিষয়ে কথাবার্ত্তার সূচনা হওয়ার পরই, দয়ারাম রায় দেশ হইতে তাহাকে আনাইয়া লইয়াছিলেন। রামকান্তকে সে

সংবাদ তিনি কিছুই প্রদান করেন নাই; প্রদান করিবার আবশ্যকতাও অনুভূত হয় নাই। পরন্তু যে দুই একদিন রামরূপ মুর্শিদাবাদে ছিলেন, রামকান্তের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দয়ারাম তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—যদি দিন পাও; আবার দেখা করিও।'

আজ দয়ারাম রায় রামকান্তের রাজ্যোদ্ধার-সম্বন্ধে রামরূপের সহিত পরামর্শ করিতেছেন।

দয়ারাম বলিলেন,—'নাটোরের অনেক প্রজাই বিদ্রোহী হ'য়েছে। সুতরাং এই উপযুক্ত অবসর। এদিকে জানিতে পারিলাম—বেণী-ভূষণের সহিত দেবীপ্রসাদের মনান্তর ঘটিয়াছে! সেও এক সুযোগ বটে। এই সময় যদি কিছু করা যায়।'

রামরূপ।—"আমিও তাই মনে করি।"

দয়ারাম।—"বিশ্বাসী লোকজন পাওয়া যাবে তো।"

রামরূপ।—"আজ্ঞে, পুরোণো লোকজন সব ঠিক হ'য়ে আছে। তারা অক্ষণে যদি টের পায়, আমরা রামকান্ত রায়কে রাজা দেওয়ার জন্য চেষ্টা ক'রছি; আহ্লাদসহকারে সকলেই আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবে।"

দয়ারাম।—"দেবীপ্রসাদের প্রতি লোকে হাড়ে হাড়ে চটিয়া আছে। যদিও তার নিজের তত দোষ নেই, যদিও সে আমলাবর্গের ও পারিষদগণের ক্রীড়াপুত্তলিরূপে কার্য্য করিতেছে; কিন্তু লোকের বিশ্বাস অন্যরূপ। সুতরাং দেবীপ্রসাদকে রাজ্যভ্রষ্ট ক'রবার জন্য অনেকেরই মনের আকাঙ্ক্ষা।"

রামরূপ।—"আমিও তার অনেক পরিচয় পেয়ে এসেছি' লোকগুলোকে হাত ক'রতে বোধ হয় বেশী কষ্টও পেতে হ'বে না।"

দয়ারাম।—"কতকগুলো লোক কিন্তু টাকা না হ'লে বশ হবে না। মনে কর, যদি বেণীভূষণকেই বশ করার প্রয়োজন হয়। সে পিশাচ কি কখন সহজে রাজী হবে? সে হাঁ ক'রে আছে—কতক্ষণে দেবীপ্রসাদের রাজ্যটা গ্রাস ক'রবে। আমার মনে হয়, তাকেই রাজ্যটা দেওয়ান হবে,—এ বলিলেও হয়য়তা সে বশীভূত হ'তে পারে।"

রামরূপ।—"আবশ্যক হ'লে সে চেষ্টাও করিতে হবে। তবে টাকাটাই সে যেন বেশী বোঝে ব'লে মনে হয়।"

দয়ারাম। "তা তো বটেই। যা হোক, যাতে কাজ উদ্ধার হয়, করিতে হবে। আমি যে টাকা দিচ্ছি; সেই টাকা নিয়ে, উপযুক্ত লোকজনের যোগাড় ক'রে তুমি শীঘ্রই নাটোরে রওয়ানা হও। আমার সঙ্গে যদি দেখা করার প্রয়োজন হয়, আমার দীঘাপাতিয়ার বাড়ীতেই দেখা হ'বে। কিন্তু আমি যে সেখানে থাকবো, সে কথা কোনক্রমেই যেন প্রকাশ না হয়।"

রামরূপ।—"আপনি কি সব সময়ই সেখানে থাকবেন?"

দয়ারাম।—"তা হলে কি করে চলবে। "সেদিক্‌ও দেখতে হবে; আবার এদিকে নবাব বাড়ীতেও তদ্বির করতে হবে। আমি মাঝে মাঝে সেখানে থাক্‌বো, মাঝে মাঝে এখানে আসবো; কিন্তু কাকে-বকে তা টের পাবে না। কেবল একমাত্র তুমি সময়ে সময়ে সে খবর জানতে পারবে।"

রামরূপ।—"আচ্ছা, তাই হবে! এখন কি কি আমায় করতে হবে, তাই বলুন।"

দয়ারাম একে একে উপায়সমূহ বিবৃত করিলেন। কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইলে, কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। শেষ বলিলেন,—"আমি অনেক কথাই বলিলাম;

কিন্তু কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের ভার তোমার উপর। যখন যে পথে চলিলে সুবিধা হইবে, তখন সেই মত কাজ করিবে। এবিষয়ে তোমার সকল কার্য্যই আমার অনুমোদিত। তবে মনে রেখ, যে প্রকারে হউক, রামকান্তের রাজ্য রামকান্তকে পুনঃ প্রদান করিতে হইবেই হইবে।"

এই বলিয়া, দয়ারাম রায়, রামরূপের হস্তে টাকার তোড়া প্রদান করিলেন। বলিয়া দিলেন,—"যত টাকারই প্রয়োজন হউক, টাকার ভাবনা ভাবিতে হইবে না। আমি সর্ব্বদাই টাকা লইয়া প্রস্তুত থাকিব।"

যথানির্দ্দিষ্ট দিনে রামরূপ নাটোর রওনা হইলেন। নাটোর-রাজধানীতে পূর্ব্বেই গৃহ-বিবাদের দাবানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল। এইবার প্রবল বায়ু-সঞ্চালনে সে অনল দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দরবার।

নবাব আলিবর্দ্দীর দরবার বসিয়াছে। মুর্শিদাবাদের দরবার-ভবনের শোভা উছলিয়া উঠিয়াছে। সুন্দর হর্ম্ম্য, সুন্দরসাজসজ্জা,—দরবারের সকলই সুন্দর। যাঁহারা দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাও সুন্দর; তাঁহাদের বেশভূষায়ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে! যেন সৌন্দর্য্যরাশি কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। নিম্নে মর্ম্মর প্রস্তর-গাত্রে কারুখচিত পুষ্পস্তবক বিছান রহিয়াছে। পার্শ্বে প্রাচীর গাত্রে

শ্বেত কৃষ্ণ প্রস্তরমধ্যে রত্নের ফুল, রত্নের পাতা, রত্নের লতা শোভা পাইতেছে। মধ্যস্থলে চারিটী শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত স্তম্ভ;—যেন পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থিত শতদলের ভিতর হইতে পরাগ-কেশর উত্থিত হইয়াছে। স্তম্ভচতুষ্টয়ের মধ্যস্থলে নবাবের রত্নসিংহাসন, মণি-মুক্তা-সংযোগে ঝক্ ঝক্ জ্বলিতেছে। মস্তকোপরি স্বর্ণখচিত নীলাভ চন্দ্রাতপ। পার্শ্বে প্রাচীর-গাত্রে—একদিকে নবাব মুর্শিদকুলির, অন্য দিকে সুজাউদ্দীনের তৈল-চিত্র। সম্মুখে দুই পার্শ্বে সুবর্ণ-খচিত ফ্রেম-সমন্বিত দুইখানি প্রকাণ্ড দর্পণ।

নবাব আলিবর্দ্দী মধ্যস্থলে সিংহাসনে বসিয়া আছেন। মুক্তা-হীরক-মণ্ডিত পরিচ্ছদ; মস্তকে দীপ্তিমান হীরক-খণ্ড-শোভিত উষ্ণীষ,—যেন নক্ষত্রখচিত গগনে চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমান। পার্শ্বে দুইজন সশস্ত্র শরীররক্ষী চিত্রপুত্তলিবৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এদিকে—সম্মুখে বামে ও দক্ষিণে শ্রেণীবদ্ধরূপে পাত্র মিত্র সভাসদ্গণ সমাসীন। দক্ষিণ পার্শ্বে, সম্মুখের দিকে, দেওয়ান জানকীরাম, নায়েব-দেওয়ান চিন্ময়রায়, দেওয়ান আলমচাঁদ, ধনাধ্যক্ষ ফতেচাঁদ জগৎশেঠ, মহারাজ নন্দকুমার বসিয়া আছেন, আর বসিয়া আছেন—দয়ারাম রায়। এইরূপ বামপার্শ্বে সম্মুখের দিকে বসিয়া আছেন, নবাবভ্রাতা দেওয়ান হাজি আহম্মদ, নবাবের ভগ্নীপতি মীর মহম্মদ জাফর খাঁ, সেনাপতি আতাউল্লা, আর পূর্ণিয়ার ফৌজদার সৈয়দ আমেদ, আর আছেন—প্রধান বিচারপতি কাজী প্রভৃতি।

নবাব আলিবর্দ্দী আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে, পুষ্পকোমল গালিচার উপর, সুগন্ধি পুষ্পরাশি স্তবকে স্তবকে পুষ্পপাত্রে সজ্জিত রহিয়াছে। সেই পুষ্প-সৌরভে আর তামাকের সুগন্ধে—মধুর-কঠোর গন্ধামোদে গৃহ আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে।

নবাব আলিবর্দ্দী যখন দরবার গৃহে প্রবেশ করেন, সভাস্থ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া যথারীতি অভিবাদন-পূর্ব্বক তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। এখন সভারম্ভের পর যাঁহারা দরবারে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দূর হইতে কুর্ণিশ করিতে করিতে নবাবসন্নিধানে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতে হইতেছে।

অন্যান্য বিষয়-কর্ম্মের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে দেওয়ান জানকীরাম নাটোরাধিপতি দেবীপ্রসাদের একখানি আবেদন-পত্র পাঠ করিলেন। আবেদনের মর্ম্ম—

"দেশে অরাজকতা উপস্থিত। প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়াছে। প্রায়ই কেহ খাজনার টাকা দিতে চাহে না। আমাকে রাজা বলিয়াও কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না। পথে-ঘাটে বাহির হইবার উপায় নাই। শত্রুরা কেবলই টিটকারী দেয়। আমার কর্ম্মচারিবর্গও আমার অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি অতিকষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া আছি। আমি নবাবের একান্ত আশ্রিত ও অনুগত। আমার প্রার্থনা, নবাব সরকারের ফৌজ আসিয়া আমার সহায়তায় প্রবৃত্ত হয়। তাহা হইলে অচিরে সকল উপদ্রব দূর করিতে পারিব, খাজনার টাকাও যথারীতি আদায় হইবে।"

আলিবর্দ্দী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি করা কর্ত্তব্য ?"

দেওয়ান জানকীরাম উত্তর দিলেন,—"স্বয়ং দয়ারাম রায় এই সভায় উপস্থিত আছেন। নাটোররাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, অপরের পক্ষে সেরূপ সম্ভবপর নহে। অতএব আমার মতে এ বিষয়ে তাঁহারই যুক্তি আবশ্যক।"

এই সময় সুজা খাঁ কহিলেন,—"আমি কিছু বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করি। রাজা দেবীপ্রসাদ নবাবের যেরূপ অনুগত, তাহাতে তাঁহাকে সাহায্য করা বিশেষ প্রয়োজন।"

নবাব আলিবর্দ্দী বাধা দিয়া কহিলেন,—"সে বিচার অবশ্যই হইবে। আপাততঃ রায় মহাশয় কি বলেন, শুনা যাক্।"

দয়ারাম রায় ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন,—"আমি যতদূর সন্ধান পাইয়াছি, আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে যাহা বুঝিয়াছি, আমার মনে হয়,—দেবীপ্রসাদকে রাজ-সিংহাসনে রাখিতে গেলে, নানা বিদ্রোহ-বিপ্লব উপস্থিত হইবে—রক্ত-স্রোতে উত্তর-বঙ্গ ভাসমান হইবে। যদি প্রজাক্ষয়ে নবাব সাহেবের আপত্তি না থাকে, সেরূপ ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে পারেন।"

আলিবর্দ্দী মনে মনে ভাবিলেন;—"একে চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া আছে। পশ্চিমে বর্গি, দক্ষিণে ইংরেজ-ফরাসী ওলন্দাজ; —আমি উহা লইয়াই বিব্রত আছি। আবার এ নূতন উপসর্গ কেন ডাকিয়া আনিব?" তিনি প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসিলেন,—"নাটোররাজ্যে কেন এ প্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইল? সেখানকার প্রজারা চিরদিনই কি বিদ্রোহপরায়ণ?"

দয়ারাম।—"আজ্ঞে, তাহা হইবে কেন? আপনি নিশ্চয় জানিবেন,—রাজার উৎপীড়ন ভিন্ন প্রজা কখনই বিদ্রোহী হয় না। বিশেষতঃ, নাটোরের প্রজারা চিরদিনই শিষ্ট শান্ত বলিয়া পরিচিত। তাহারা যখন এমন ভাবে উত্তেজিত হইয়াছে, নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় কারণ আছে।"

আলিবর্দ্দী।—"আপনি কি কারণ মনে করেন?"

দয়ারাম।—"কারণ অত্যাচার। যে অত্যাচারে নবাব সরফরাজ খাঁ সিংহাসনচ্যুত; আমি শুনিয়াছি, নাটোরেও সেইরূপভাবে সেই-অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে।"

আলিবর্দ্দী।"এ ক্ষেত্রে আপনি কিরূপ পরামর্শ দেন?"

দয়ারাম। "এ ক্ষেত্রে রাজা দেবীপ্রসাদ রায় নাটোরে থাকিলে কোনও প্রকারেই শান্তির আশা করিতে পারি না।

এই সময় মহারাজ নন্দকুমার দুই এক কথা কহিবার জন্য নবাবের অনুমতি চাহিলেন; কহিলেন,—"দেবীপ্রসাদ রাজা রাম-জীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনিই একমাত্র বংশধর। তাঁহাকে রাজ্য হইতে অপসৃত করা যুক্তিসঙ্গত কি? বিশেষতঃ আমার যতদূর স্মরণ হয়, দেবীপ্রসাদকে সিংহাসনদানে এই দয়ারাম রায়ই উদ্যোগী ছিলেন। কেমন, দেওয়ান মহাশয় সত্য কি না?"

দেওয়ান রাজা জানকীরাম উত্তর দিলেন,—"ঠিক তা নয়; নবাব সরকার হইতে রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—'দেবীপ্রসাদ রায়—রামজীবন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না?' দয়ারাম তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—"দেবীপ্রসাদ রামজীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র।"

রায় মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে এই মাত্র সম্বন্ধ। ইহার অধিক ইহাঁকে আর কোনও বিষয়ে দায়ী করিতে পারা যায় না।'

আলিবর্দ্দী।—"ভাল, রায় মহাশয় এখন কি পরামর্শ দেন?'

দয়ারাম রায় ধীরে ধীরে কহিলেন,—"রাজা রামজীবন রায়ের এক পুত্র আছেন। প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহার অনুরক্ত। তিনি যদি নাটোর রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন, সকল বিদ্রোহ শান্ত হইয়া যায়।'

আলিবর্দ্দী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাজা রাম-জীবন রায়ের পুত্র আছেন? কে সে পুত্র? তিনি কোথায় আছেন?"

দয়ারাম।—"আজ্ঞে, তাঁহার নাম রামকান্ত রায়। তিনি এখন এই মুর্শিদাবাদ সহরেই অবস্থান করিতেছেন। ফতেচাঁদ জগৎশেঠ মহাশয়ও তাঁহাকে উত্তমরূপ জানেন।"

এই সময় সুজা খাঁ ও মহারাজ নন্দকুমার কিছু বলিতে যাইতে

ছিলেন; কিন্তু নবাব তাহাতে বাধা দিয়া জগৎশেঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন শেঠজী! আপনি রামকান্ত রায়কে চেনেন?"

জগৎশেঠ—"হাঁ হুজুর! আমি তাঁহাকে চিনি।"

এই রামকান্ত রায়কেই সিংহাসনচ্যুত করিয়া দেবীপ্রসাদকে যে নাটোররাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল, সুজা খাঁ ও নন্দকুমার সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার চেষ্টা পাইলেন।

এই সময় দেওয়ান জানকীরাম শীলমোহর করা একখানি লেফাফা আনিয়া নবাবের হস্তে প্রদান করিলেন। লেফাফাখানি হাতে পাইয়াই কি যেন পুরাতন স্মৃতি নবাবের মনে জাগিয়া উঠিল।

নবাব আর কোনও কথাই শুনিলেন না। নবাব হুকুম দিলেন, —"রাজা রামজীবন রায়ের পুত্র রামকান্ত রায় নাটোররাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। দেবীপ্রসাদকে অধিকারচ্যুত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে রামকান্ত রায়কে নাটোররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"

এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য সেইদিনই নাটোরে সৈন্যদল প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়া গেল। নবাব আলিবর্দ্দী দয়ারাম রায়কেও বলিয়া দিলেন,—"যাহাতে সুশৃঙ্খলায় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সে পক্ষে আপনিও একটু সহায়তা করিবেন।" দরবার ভঙ্গ হইল।

*　　　*　　　*　　　*

লেফাফায় কি ছিল? লেফাফা-খানি দেখিয়াই হঠাৎ নবাব এত বিচলিত হইয়া পড়িলেন কেন? ইহার ভিতর কি কোনও রহস্য আছে?

বলা বাহুল্য, ইহাও দয়ারাম রায়ের ফন্দি-কৌশল। অনেক যোগাড়যন্ত্র করিয়া, দয়ারাম রায় একদিন নিভৃতে নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেই দিন তিনি রাজা রামকান্তের ও রাণী ভবানীর চরিত্র ও শাসন-নীতির বিবিধ কথা তাঁহাকে ভাল

করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের হস্তে রাজ্যভার প্রত্যর্পিত হইলে, নবাবের কত উপকার হইবে, অৰ্দ্ধবঙ্গে অচলা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, নবাব নিজে কত শান্তিতে থাকিবেন,—সেই সূত্রে দয়ারাম রায় এই সকল কথা নবাবকে বুঝাইয়া বলেন। নবাব তখন দয়ারাম রায়কে সে কথার কোনও উত্তর দেন নাই। তবে দয়ারাম রায় বিদায় গ্রহণ করিলে, তাঁহার কথাগুলি একটু 'নোট' করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই 'নোট' ঐ লেফাফায় আবদ্ধ ছিল। যে দিন নাটোর-রাজ্যের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে, সেই দিন ঐ লেফাফাখানা নবাবের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে, দেওয়ানকে এইরূপ বলিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ দেওয়ান সেই লেফাফাখানা উপস্থিত করিবামাত্র, দয়ারাম রায়ের সেই সকল কথা নবাবের স্মৃতিপটে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। নবাব আর কোনও কথাই শুনিলেন না। তিনি রাজা রামকান্তের হস্তেই পুনরায় নাটোর-রাজ্যের ভারার্পণে আদেশ দিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আবর্ত্ত।

একদিকে নবাবের কঠোর আদেশ, অন্য দিকে গৃহ-বিচ্ছেদ। প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হইলেও, দেবীপ্রসাদ ও বেণীভূষণে যতদিন সদ্ভাব ছিল, তত দিন রাজ্যনাশের বিশেষ কোন আশঙ্কা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু এখন, দেবীপ্রসাদ ও বেণীভূষণে ঘোর মনান্তর উপস্থিত। বেণীভূষণ বুঝিয়াছেন,—দেবীপ্রসাদের রাজা

টলমল ; কখন আছে, কখন নাই। সুতরাং তিনি পাওনা টাকার কড়া তাগাদা আরম্ভ করিয়াছেন। একে দুঃসময় ; আদায়-পত্র বন্ধ ; তাহার উপর বেণীভূষণের বিষম তাগিদ। সুতরাং দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে আর আত্মীয় বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না। আত্মীয় জন কখন কি অসময়ে এরূপ বিরূপ হয় ?

দয়ারাম রায়ের নিকট টাকা-কড়ি লইয়া নাটোরে আসিয়া রামরূপ দেবীপ্রসাদের বিপক্ষে বিষম চক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। দেবী-প্রসাদের পক্ষের লোকদিগকেও তিনি বশীভূত করিয়া লইয়াছেন। নবাব-দরবারে দেবীপ্রসাদের আত্মরক্ষার জন্য আবেদনের তাহাও এক কারণ।

যাহা হউক, দেবীপ্রসাদের মনে বেণীভূষণের প্রতি যখন ঘোর অবিশ্বাসের সঞ্চার হয়, সেই সময়ে কৃতান্তকুমার তাঁহাকে শাসাইয়া বলে,—"রাজা তো আমাদের! আমাদের টাকা শোধ করিয়া তোমাকে আর রাজ্য ভোগ করিতে হইবে না। বাবা এইবার হাত গুটাইয়াছেন ; শীঘ্রই নবাবের নিকট হইতে পরওয়ানা আনিয়া রাজ্য কাড়িয়া লইবেন।"

ঘটনার সঙ্গে বাক্যের সামঞ্জস্য না থাকিলে, দেবীপ্রসাদ কৃতান্ত-কুমারের কথা উড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু দিন দিন বেণীভূষণ যেরূপ দুর্ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন, যখন-তখন যাহার-তাহার সম্মুখে যেরূপ টাকার তাগাদা করিয়া থাকেন, তাহাতে কৃতান্তকুমারের কথা কিরূপেই বা অবিশ্বাস করিতে পারেন ? বিশেষতঃ, হীরালাল আজ যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া তাঁহার পেটের প্রাণ চমকিয়া উঠিল।

হীরালাল বলিলেন,—"বেণী মৈত্র কি সহজ লোক! ঐ রামকান্ত রায়ের সর্ব্বনাশ ক'রেছে! এখন ঐ আবার আপনারও সর্ব্বনাশ ক'রতে ব'সেছে। আমি ওর নাড়ীনক্ষত্র সব জানি। ও কিনা

আমাকে শুধু ফাঁকি দিয়ে চ'লে [illegible] কিছু দেন আর না দেন—তাও আমি সইতাম! কিন্তু যখন শুনলাম—আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'চ্ছে; যার খেয়ে মানুষ, তাহাকেই ডুবুতে ব'সেছে;—আমি আর কোনমতেই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌লাম না। আপনাকে তাই সাবধান কর্‌তে এলাম, আপনি ওটাকে আর এক তিল বিশ্বাস ক'র্‌বেন না।"

দেবীপ্রসাদ।—"আপনি সত্য ব'ল্‌ছেন কি? বেণীমামা আমার শত্রু?"

হীরালাল।—"মিছে বলায় আমার লাভ? কর্ত্তব্য ব'লে মনে হ'ল, তাই আপনাকে ব'ল্‌তে এসেছি। আপনি বিশ্বাস করেন, ভালই; না করেন, হানি নাই।"

দেবীপ্রসাদ।—"না—না, আপনি অসন্তুষ্ট হ'বেন না। আমি সে কথা ব'ল্‌ছি না। আপনি যে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, তা আমি বরাবরই জানি। বেণী মামার সম্বন্ধে আপনি কি জান্‌তে পেরে-ছেন—বলুন দেখি!"

হীরালাল।—"ওর আমি কি না জানি? ও বামুন কার সর্ব্বনাশ না ক'রেছে? দ্বারিক বসুর ভিটামাটি উৎসন্ন দিলে—কে—বলুন দেখি? জীবনসান্ন্যালকে দেশত্যাগী ক'র্‌লে—কে বলুন দেখি? হিরু ঘোষকে পাগল ক'রে দিলে—কে বলুন দেখি? এদের সবারের সঙ্গেই বেণী মৈত্রের কেমন ভাব ছিল, মনে হয় কি? ছুঁচ হ'য়ে সেঁদিয়ে ফাল হ'য়ে বেরিয়ে আসা—বেণী মৈত্রের প্রকৃতিই এই। আমি তাই বলছি,—এখনও সাবধান। রামকান্ত রায়কেও ঐ মজিয়েছে।"

দেবীপ্রসাদ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রামকান্তকে বেণী মামা কি ক'রে মজালেন? তাঁর সঙ্গে তো ওঁর কোনও সম্বন্ধ ছিল না।"

হা হা করিয়া হাসিয়া, হীরালাল উত্তর দিল,—"তবেই আপনি রাজ্য চালিয়েছেন! এ খবরটাও আপনি রাখেন নি? সে কি কম ধড়িবাজ? তার এক দাঁতের খুঁকি যদি পেতেন, তা হ'লে কি আর রক্ষে থাকতো। তা না পেয়েছেন—না পেয়েছেন! তেমন বুদ্ধি যেন শত্রুরও না হয়!"

দেবীপ্রসাদ।—"রামকান্তের কাছে ওর তো কখনও যাতায়াত ছিল না। উনি তাকে মজিয়েছেন—এ কথা কেন বলেন?"

হীরালাল।—"তবে শুনবেন? দয়ারামকে তাড়ানর মূল—ঐ বেণীমিত্র, খাজনার টাকা লুঠ করানর মূল—ঐ বেণী মিত্র, রামকান্তের রাজ্যচ্যুতির মূল—ঐ বেণী মিত্র। আর রাগ করবেন না—আপনারও যদি কোনও অনিষ্ট হয়, তারও মূল জানবেন—ঐ বেণী মিত্র। ওটা কি কম? ও চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সাবধান হ'তে! মনে ক'রে দেখুন—আপনি কি ছিলেন, আর কি হয়েছেন।"

দেবীপ্রসাদ।—"কেন—কেন? এ কথা বলছেন কেন?"

হীরালাল।—"ভাবুন দেখি—আপনার কি নির্ম্মল চরিত্র ছিল? আর সেই চরিত্র আজ কেন কলঙ্কিত? আপনার এই সব সাঙ্গোপাঙ্গ কে জুটিয়ে দিয়েছিল? মনে হয় কি? আপনি কিছুতেই মদ খেতে রাজি হন না; আর ভুজঙ্গ আপনাকে জোর ক'রে মদ খাইয়েছিল? তার পর, ক্রমে ক্রমে আপনাকে এমন ক'রে তুলেছে যে, এখন মদ না হ'লে আপনার একদণ্ড চলে না।"

দেবীপ্রসাদ।—"এতে বেণীমামার দোষ কি?"

হীরালাল।—"বেণী মিত্রের দোষ কি? সব তারই ষড়যন্ত্র জানবেন! আপনাকে মদ্যপানাসক্ত বিকৃতমস্তিষ্ক ক'রে রাখতে পারলে, লুটেপুটে নেবার তার ষোল আনা সুবিধা হয়, তাই সে এই ব্যবস্থা ক'রেছিল।"

দেবীপ্রসাদ অধোমুখ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। একে একে পুরাতন স্মৃতি তাঁহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন,—সত্যই তো। হীরালাল যাহা বলিতেছে, একবর্ণও তো মিথ্যে ব'লে মনে হয় না। যাদের সর্ব্বনাশ করার কথা ব'ললে, সবই তো ঠিক! আমার এরূপ চরিত্র-দোষের মূল—সত্যই তো সেই! সেই তো আমায় ব'লেছিল—মদ অপবিত্র নয়, তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চমকার সেবার উপদেশ আছে। শরীররক্ষার জন্য অল্প অল্প মদ খেলে দোষ নেই—সে না বল্লে, আমি তো কখনই মদ ধরতাম না। আমার যা কিছু কুকর্ম্ম—সকলেরই মূলীভূত সেই।"

দেবীপ্রসাদ অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন দেখিয়া, হীরালাল পুনরায় কহিলেন,—"আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না? বিশ্বাস না হয়, নাই হোক্। আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়া যাই। আর একটী কথা আমার বলিবার আছে। আপনি সাবধানে থাকিবেন—বেণীভূষণ ষড়যন্ত্র ক'রেছে, তিন দিনের মধ্যে আপনাকে রাজধানী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, এই গদী অধিকার ক'রে ব'স্‌বে।"

দেবীপ্রসাদ।—"এ এ—বলেন কি? বলেন কি?"

হীরালাল।—"ব'ল্‌বো আর কি! যাহা বলিতেছি—বর্ণে বর্ণে মিলাইয়া লইবেন। আমি এখন চলিলাম। আমি এখানে আসিয়াছিলাম জানিতে পারিলে, সে আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করিতে পারে। সুতরাং আর অধিকক্ষণ বসিয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। নিতান্ত আপনার জন্য প্রাণ কাঁদে, নিতান্ত আপনার হিতাভিলাষী,—তাই এই বলিয়া চলিলাম।

এই বলিয়া, হীরালাল গাত্রোত্থান করিলেন। হীরালালকে ডাকিয়া বসাইবেন মনে হইলেও, মন বিকল হওয়ায়, দেবীপ্রসাদ কিছুই বলিতে পারিলেন না। হীরালাল চলিয়া গেল।

হীরালাল চলিয়া গেলে, দেবীপ্রসাদের মন প্রবল চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইল! একে একে সকল কথাই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সকল বিষয়েই বেণীভূষণের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইল। মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"হীরালাল বাবু যাহা বলিয়া গেলেন, তাহার একটী কথাও তো মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। দয়ারামের সহিত রামকান্তের মনোমালিন্যের মূল—বেণীমামাই বটে। সে কথা মিথ্যা নয়! তবে তিনি বলেন,—আমার জন্যই তিনি তাহাদের মিত্রতাবন্ধন ছিন্ন ক'রেছিলেন। রামকান্তের খাজনার টাকা লুটের ব্যাপারে তিনি যে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন, তাও তো কৈ তাঁহার কথাবার্ত্তায় কখনও বুঝিতে পারি নাই। বরং সন্ধানে জানিয়াছি,—আমার পাইক বরকন্দাজেরা সেদিন কেহই সহরে ছিল না! তাহাদের সাহায্যে এবং আবশ্যকানুরূপ লোকজন নিযুক্ত করিয়া তিনিই যে সেই টাকা লুঠ করান নাই, তাহাই বা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? কেবল হীরালাল বাবুর মুখে কেন, কাণাঘুষায় সর্ব্বত্রই তো ঐ কথা প্রকাশ। তারপর, আমার সম্বন্ধে হীরালাল বাবু যাহা বলিলেন, আমি তর্কের ছটায় উহা উড়াইয়া দিলাম বটে; কিন্তু ভাবিতে গেলে, তাহার এক বর্ণও তো মিথ্যা নয়! সত্যই তো—আমার চরিত্র কলুষিত করিবার মূল—সত্যই তো বেণী মামা! সাঙ্গোপাঙ্গ তিনিই তো জুটাইয়া দিয়াছিলেন। এখন বুঝিতেছি—সকলই তাঁর দুরভিসন্ধি। কৃতান্ত যে আমায় শাসাইয়া বলিয়া গিয়াছে,—রাজ্য আমার নয়,—রাজ্য এখন তাদের! সত্যই কি তাহারা সেই ষড়যন্ত্র করিয়াছে? কৃতান্ত যে অবস্থায় কথাগুলা বলিয়া গিয়াছে, তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়াও তো মনে হয় না।"

দেবীপ্রসাদ কোন প্রকারেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিলেন না। বেণীভূষণ যে তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য স্বতঃপরতঃ চেষ্টা-

স্থিত আছেন, সেই কথাই এখন কেবল তাঁহার মনে হইতে লাগিল।

অতঃপর কি প্রকারে বেণীভূষণের সহিত সম্বন্ধবন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন, দেবীপ্রসাদ তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন! হৃদয় বিষম আবর্ত্তে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিরোধ।

অসতের বিচিত্র চরিত্র। সে যখন তোমার জন্য অপরের অনিষ্ট-সাধন করে, তুমি মনে কর—তাহার ন্যায় সুহৃদ্ তোমার আর দ্বিতীয় নাই! তখন একদিনও তুমি ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাও না,—যে জন তোমার হইয়া আজি অন্যের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ নহে, পর দিন সেই আবার অন্যের পক্ষাবলম্বনে তোমারই অনিষ্ট-সাধন করিতে পারে। ইহাই তাহার প্রকৃতি!

যে মিথ্যাবাদী, সে যেমন তোমার হইয়া অপরের নিকট মিথ্যা কথা কহিতে পারে, সে তেমনই অপরের হইয়াও তোমার নিকট মিথ্যা কহিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। ইহাই তাহার প্রকৃতি।

সেইরূপ প্রকৃতির লোক আজি তোমার গলায় প্রেমের পুষ্পহার পরাইয়া কতই আদর জানাইল। সে আদরে তুমি গলিয়া গেলে। কালি আবার সে-ই যে তোমার হৃদয়ে শাণিত ছুরিকা প্রবেশ করাইতে পারে; কখনও তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

দেবীপ্রসাদ এ পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

বেণীভূষণের মোহজাল তাঁহাকে এতই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল যে, দেবীপ্রসাদ সেরূপ ভাবনার আবশ্যকতাও কখনও উপলব্ধি করেন নাই।

কিন্তু এখন হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ হইয়াছে। এখন আর ভাবিলে ফল কি?

যেদিন হীরালাল দেবীপ্রসাদকে সাবধান করিয়া গেলেন;—যেদিন বেণীভূষণ সম্বন্ধে দেবীপ্রসাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল; সেই দিনই বেণীভূষণ, দেবীপ্রসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রাপ্য টাকার তাগাদা করিলেন। বেণীভূষণ কহিলেন,—"আমি টাকা আর কোনও রকমেই রাখ্‌তে পার্‌ছি নে। আমি দুই তিন দিনের মধ্যে কাশী যাওয়া স্থির ক'রেছি। আমার পাওনা টাকা তোমায় আজই চুকিয়ে দিতে হবে।"

দেবীপ্রসাদ বিনীতস্বরে উত্তর দিলেন,—"মামা! এ বয়সে আপনি কাশীবাসী হবেন, তার চেয়ে আহ্লাদের বিষয় আমার আর কি আছে? আপনার টাকা আমি শীঘ্রই পরিশোধ করিব।"

বেণীভূষণ কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে কহিলেন,—"কড়ার অনেক খেলাপ হ'য়ে গিয়েছে। কড়ার আমি আর শুন্‌তে চাইনে। আজই আমার টাকা শোধ ক'রে দিতে হবে।"

দেবীপ্রসাদ অধিকতর নম্রস্বরে উত্তর দিলেন,—"মামা! আপনি তো অবস্থা সবই জানেন! নবাবের পরওয়ানা এসেছে, কিন্তু তারও অর্দ্ধেক টাকার এখনও যোগাড় হয় নাই; এ সময়ে আপনি যদি বিরূপ হন, আমার আর কোথায় দাঁড়াইবার স্থান আছে?"

বেণীভূষণ পূর্ব্বাপেক্ষা রুক্ষস্বরে কহিলেন,—"আমার যতদূর সাধ্য আমি ক'রে এসেছি। আর আমার সামর্থ্য নাই। তুমি পথের ভিখারী ছিলে; তোমাকে রাজ্যেশ্বর ক'রে তুলেছি। তুমি আর কি

চাও? যাই হোক্, শেষ বয়সে আমি কাশীবাসী হবার মনস্থ ক'রেছি; তাতে তুমি কেন আর প্রতিবাদী হও? আমার টাকা দাও!"

দেবীপ্রসাদ।—"আপনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা। এ সময় আপনি বিরূপ হ'বেন না। নবাবের টাকাটা দেওয়া হ'ক্; তার পর আপনার টাকাটা আগে দেওয়া হ'বে!"

বেণীভূষণ।—"সে সব স্তোকবাক্য আমি আর শুনতে চাইনে। ক'বে নবাবের টাকা দেবে বা না-দেবে—সে কথা জানারও আমার আর আবশ্যক নেই। সংসারে এখন আমি নির্লিপ্ত! তোমার কাছে পাওনা টাকাটা পেলেই আমি সস্ত্রীক কাশী চ'লে যাই।"

দেবীপ্রসাদ।—"তাই, তাই হবে। দিন কয়েক সবুর করুন। আমি সব বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে দেবো।"

বেণীভূষণ।—"আমার কোনও বন্দোবস্ত আর তোমায় কর্‌তে হবে না। এখন একমাত্র বন্দোবস্ত আমি এই চাই—আমার পাওনা টাকাগুলি তুমি আজই চুকিয়ে দাও।"

দেবীপ্রসাদ যতই মিনতি করেন,—যতই বুঝাইয়া বলেন—আর দিনকয়েক মাত্র অপেক্ষা করুন; বেণীভূষণ ততই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন, ততই জোর তাগাদা আরম্ভ করিয়া দেন। বেণীভূষণও টাকা না লইয়া উঠিতে চাহেন না; দেবীপ্রসাদও দিনকয়েক অপেক্ষা করিতে বলেন। এই ভাবে তর্ক-বিতর্কে প্রায় এক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া গেল।

অবশেষে দেবীপ্রসাদ কহিলেন,—"আমায় অবিশ্বাস কর্‌বার কারণ কি? আমার এই বিস্তৃত রাজ্য; রাজস্ব আদায় হ'লে আমার একদিনের আয়ে আপনার ঋণ শোধ হ'তে পারে। আপনি উতলা হ'চ্ছেন কেন? আপনি যদি একান্তই পরশু কাশী রওনা হ'তে মনস্থ ক'রে থাকেন, ভাল, আমি সেখানেই আপনার টাকা পাঠিয়ে দিব।"

বেণীভূষণ টিটকারী স্বরে কহিলেন,—"সে সাউথুরীতে আর কাজ নেই। আমি নিত্যি নিত্যি তাগাদা ক'রেই টাকা পাইনে। আমি চ'লে গেলে, তুমি যত পাঠিয়ে দেবে, তা মা গঙ্গাই জানেন!"

দেবীপ্রসাদ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্তর দিলেন,—"আপনি সে কি বলেন? আপনার টাকা—"

উত্তরের আর অপেক্ষা না করিয়াই বেণীভূষণ কহিলেন—"সে সব আমি শুনতে চাই নে। আমার টাকা আজই দিতে হবে। আমি আর তোমার স্তোকবাক্যে বিশ্বাস করি না!"

পুনঃপুন অনুরোধ করিয়াও ফল হইতেছে না দেখিয়া, দেবীপ্রসাদ এবার স্পষ্ট করিয়া কহিলেন,—"আমায় মাপ করবেন,—আমি নবাবের টাকা না দিয়ে, অন্য কাকেও এক পয়সা দেব না।"

বেণীভূষণ ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন,—"কি' দেবে না? তোমায় দিতেই হবে। আমি টাকা আজই আদায় করবো!"

দেবীপ্রসাদও সমস্বরে উত্তর দিলেন,—"আমি কিছুতেই দেব না!"

বেণীভূষণ চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"হাঁ দেবে না। তুমি জান,—এ রাজ্য আমারই। আমি ইচ্ছা ক'রলে, আজই রাজ্য কেড়ে নিতে পারি। আমি ইচ্ছা করলে, আজই তোমায় রাজবাড়ী থেকে দূর ক'রে দিতে পারি।"

বেণীভূষণের চীৎকার, আমলা ও ভৃত্যবর্গের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। দুই চারি জন মজলিসে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেবীপ্রসাদ ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"আপনি কি লোক, তা আর আমার জানতে বাকী নেই। আমি অনেক সহ্য ক'রে এসেছি। কিন্তু জানবেন—ধৈর্য্যের সীমা আছে। যান—আপনার যা ক্ষমতা থাকে, আপনি ক'রতে পারেন। আমি আপনার টাকা রাখি না!"

বেণীভূষণ বুঝিলেন,—অধিক বাড়াবাড়িতে অধিকতর অপমানের সম্ভাবনা আছে। তাই আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া, "আচ্ছা দেখা যাবে"—এই বলিতে বলিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এদিকে দেবীপ্রসাদও আমলাবর্গকে এবং বরকন্দাজদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, তাহারা যেন বেণীভূষণকে ও কৃতান্তকুমারকে রাজবাড়ীতে আর প্রবেশ করিতে না দেয়।

এখন দুইজনেরই দুইজনের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস! বেণীভূষণ মনে করিতেছেন,—দেবীপ্রসাদ প্রবঞ্চক; দেবীপ্রসাদ মনে করিতেছেন, বেণীভূষণ ঘোর প্রতারক।

এইরূপই ঘটিয়া থাকে। যাহারা কার্য্যসিদ্ধির জন্য অসদুপায় অবলম্বন করে, তাহাদের পরস্পরের সৌহার্দ-বন্ধনের পরিণাম-ফল এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

লোমহর্ষণ।

দেবীপ্রসাদের সহিত বিবাদ-সূত্রে বেণীভূষণ বলিয়াছিলেন,—তৃতীয় দিবসে তিনি কাশীধাম যাত্রা করিবেন।

আজ সেই তৃতীয় দিবস। বেণীভূষণের কাশী যাওয়ার কল্পনা সত্য কি মিথ্যা, বেণীভূষণ নিজেই তাহা বলিতে পারেন। দেবীপ্রসাদের নিকট টাকা আদায় না হওয়াতেই হউক, অথবা ঘটনাচক্রে পড়িয়াই হউক, তাঁহার কাশী যাওয়া ঘটিল না।

বেণীভূষণের কাশী যাওয়া ঘটিল না বটে; কিন্তু ঐ দিন বেণী-ভূষণের বাটীতে এক লোমহর্ষণ ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল।

ঐ দিন দ্বিপ্রহরে কৃতান্তকুমার মাতলামি করিতে করিতে দেবী-প্রসাদের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল। এমন সময় দ্বারবানগণ তাহাকে বাধা প্রদান করিল। কৃতান্তকুমার রোষান্বিত হইয়া, ইতর ভাষায় দেবীপ্রসাদের উপর গালি বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। উপর হইতে দেবীপ্রসাদ হুকুম দিলেন,—"জুতা মারিয়া দূর করিয়া দাও।"

কৃতান্তকুমারের পায়ে একজোড়া নাগরা জুতা ছিল; দেবীপ্রসাদ তাহাকে জুতা মারিতে হুকুম দিলেন শুনিয়া, আপন পায়ের জুতা খুলিয়া, কৃতান্তকুমার দেবীপ্রসাদের প্রতি নিক্ষেপ করিল। জুতা দেবীপ্রসাদের গায়ে লাগিল না,—বারান্দায় ঠেকিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

দেবীপ্রসাদ পুনরায় আদেশ করিলেন,—"পাজিটাকে জুতা মেরে দূর ক'রে দাও।"

প্রথম আদেশে ভৃত্যগণ ইতস্ততঃ করিয়াছিল। বেণীভূষণের পুত্র বলিয়া কৃতান্তকুমারের গায়ে হাত তুলিতে তাহাদের সাহস হয় নাই। দ্বিতীয় আদেশ পাইয়া, বিশেষতঃ দেবীপ্রসাদের প্রতি কৃতান্তকুমারকে জুতা ছুড়িতে দেখিয়া, কৃতান্তকুমারেরই জুতাপাটি কুড়াইয়া লইয়া, সিপাহি হনুমান সিং, কৃতান্তকুমারের উপর দুই চারি ঘা জুতা বসাইয়া দিল। অবশেষে তিন চারি জনে কৃতান্তকুমারকে গলাধাক্কা দিতে দিতে বাটীর বাহির করিয়া দিয়া আসিল।

আর একদিন কৃতান্তকুমার দেবীপ্রসাদের নিকট অপমানিত হইয়াছিল; আর সেদিন আপনার পিতার নিকট গিয়া মনোবেদনা জানাইয়া, প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু বেণীভূষণ পুত্রের

অনুযোগে কর্ণপাত করেন নাই। আজ এইরূপে অপমানিত হইয়া, কৃতান্তকুমারের সেই কথা পুনঃপুন মনে পড়িতে লাগিল।

তাহার অনুযোগে পিতার ঔদাসীন্তের কথা যতই তাহার মনে পড়িতে লাগিল; ততই কৃতান্তকুমারের হৃদয়ে বেণীভূষণের প্রতি রোষানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কৃতান্তকুমারের মনে হইল,—"সেই বৃদ্ধই সকল অনিষ্টের মূল। সেই বৃদ্ধই দেবীপ্রসাদকে অত স্পর্দ্ধাবান্ করিয়া তুলিয়াছে। সেই বৃদ্ধই আমাকে এতটা খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে।"

ভাবিতে ভাবিতে তাহার যত ক্রোধ সমস্তই পিতার প্রতি প্রধাবিত হইতে লাগিল। দেবীপ্রসাদ অপমান করিয়াছে; সে অপমানের কথা কৃতান্তকুমার ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল। তাহার রোষ-বহ্নি বেণীভূষণের প্রতিই নিপতিত হইল। কৃতান্তকুমার মনে মনে বলিতে লাগিল,—"বুড়া বর্ত্তমান থাকিতে আমার আর কোনও আশা নাই। সম্পত্তির এক পয়সা আমি ভোগ করিতে পাই না। সম্পত্তি যদি আমার হাতে থাক্‌তো, আমি দেবীপ্রসাদকে উড়িয়ে দিয়ে সিংহাসন অধিকার ক'রে ব'সতাম। কিন্তু বাবা বেটাই যত গোল বাধিয়ে রেখেছে। পড়ে একবার আমার হাতে বিষয়-সম্পত্তি, আমি দেখি—কেমন দেবীপ্রসাদ।"

এইরূপ চিন্তার পরই কৃতান্তকুমার স্থির করিল,—"দেখি, আজই বা বাবা কি করে। আজ তারই একদিন, কি আমারই একদিন।"

কৃতান্তকুমার উন্মত্তের ন্যায় পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইল।

দেবীপ্রসাদের সহিত মনোমালিন্য নিবন্ধন বেণীভূষণের মন কয়েকদিন হইতেই বড়ই চঞ্চল ছিল; সংসারের কোন কর্ম্মই তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। কি করিয়া টাকার যোগাড় করিবেন,

কি করিয়া দেবীপ্রসাদের হস্ত হইতে নাটোর-রাজ্য কাড়িয়া লইবেন, অহর্নিশ সেই চিন্তাতেই বেণীভূষণ নিমগ্ন ছিলেন। অপরাহ্ণে বৈঠকখানায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়া সেই ভাবনাই ভাবিতেছিলেন; সহসা কৃতান্তকুমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

চক্ষু রক্তবর্ণ; পদদ্বয় পাদুকাশূন্য; ক্রোধে অধরোষ্ঠ কম্পমান। কৃতান্তকুমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, —"কি ক'রবে, এখনও স্পষ্ট ক'রে বল। আজ তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন!"

বেণীভূষণ অন্যমনা ছিলেন; পুত্রের বিকট চীৎকারে চাহিয়া দেখিলেন। কৃতান্ত পুনরপি কহিল,—"এখনও চুপ ক'রে রইলে যে। জান—তুমিই সকল অনিষ্টের মূলাধার!"

বেণীভূষণ আর অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি ঈষৎ বিরক্তির স্বরে কহিলেন,—"কি মাতলামি কচ্ছিস্। যা—এখন শুগে যা।"

কৃতান্তকুমারের ক্রোধবহ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি প্রক্ষিপ্ত হইল। কৃতান্তকুমার দ্বিগুণতর উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল,—"আমি মাতাল? আচ্ছা—দেখাচ্ছি।"

এই বলিতে বলিতে কৃতান্তকুমার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এক ভাবনার উপর অন্য ভাবনা আসিয়া বেণীভূষণের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল! বেণীভূষণ ভাবিতে লাগিলেন,—"আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি—"

ইতিমধ্যে বাটীর মধ্য হইতে কৃতান্তকুমার কৃতান্তের ন্যায় বাহির হইল। তাহার হস্তে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা!

বেণীভূষণের কথা শেষ হইতে না হইতেই কৃতান্তকুমার পিতার বক্ষস্থলে ছুরিকা বসাইয়া দিল

"বাবা গো—মলাম—খুন ক'র্‌লে!"

বেণীভূষণের আর্ত্তনাদে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল।

তারপর, পিতার বক্ষ হইতে ছুরিকাখানি উত্তোলন করিয়া, দৃঢ় মুষ্টিতে তাহা ধারণপূর্ব্বক, কৃতান্তকুমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল!

কাত্যায়নী, পুত্রবধূর কেশবিন্যাসে ব্যস্ত ছিলেন; স্বামীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া, আলুথালুভাবে বহির্ব্বাটীতে উপনীত হইলেন। চাকর চাকরাণীরাও যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল।

কি সর্ব্বনাশ!—কি সর্ব্বনাশ! কৃতান্ত কি সর্ব্বনাশ করিল।

কাত্যায়নী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রবধূ কাঁদিতে লাগিল। দাস-দাসী সকলেই হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু তখনও বেণীভূষণের প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। সুতরাং অল্পক্ষণ মধ্যেই বিলাপের নিবৃত্তি ঘটিল। বেণীভূষণের শুশ্রূষার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইলেন। কেহ জল লইয়া আসিল; কেহ কাপড় ভিজাইয়া তাঁহার বক্ষস্থলে বাঁধিয়া দিতে গেল; কেহ বাতাস দিতে লাগিল; কেহ কবিরাজ ডাকিতে ছুটিল।

বেণীভূষণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। তীরবেগে ক্ষতস্থান হইতে শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। রক্তস্রোত কোনক্রমেই প্রতিনিবৃত্ত হয় না দেখিয়া, সকলেই প্রমাদ গণিলেন। যাহা হউক, রীতিমত শুশ্রূষার ত্রুটি হইল না।

অল্পক্ষণ মধ্যেই রাজ-বৈদ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একবার বেণীভূষণের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন; ধীর স্থির ভাবে তাঁহার হস্ত উত্তোলন করিয়া নাড়ী ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন; রক্তবন্ধের জন্য নানাবিধ মুষ্টিযোগের আয়োজন করিতে কহিলেন। সকলেই রাজবৈদ্যের মুখপানে চাহিয়া রহিল। অনেকেই

বুঝিল,—যেন রাজবৈদ্যের মুখমণ্ডলে নৈরাশ্যের প্রগাঢ় ছায়াপাত হইয়াছে !

কাত্যায়নী কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করাইলেন,—"রোগীর অবস্থা কিরূপ বুঝিতেছেন ? আশঙ্কার কোন কারণ নাই তো ?"

রাজবৈদ্য মস্তক নাড়িয়া ইঙ্গিতে উত্তর দিলেন। সে ইঙ্গিতে কেহ বুঝিল,—আশঙ্কার কারণ সম্পূর্ণ বিদ্যমান ; কেহ বুঝিল,—আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই ; কেহ বা সে ইঙ্গিতে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

কবিরাজ মহাশয় আগন্তুকগণকে রোগীর পার্শ্বে জটলা করিতে নিষেধ করিলেন। রোগীকে তুলসী-পাতার রসে মাড়িয়া মৃগমদচূর্ণ সেবন করাইলেন। রক্তবন্ধের জন্য প্রলেপের ব্যবস্থা হইল।

কিছুক্ষণ পরে রক্ত বন্ধ হইলে বেণীভূষণ একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন। রোগীর সঞ্চার ভাব উপলব্ধি করিয়া, রাজবৈদ্য রোগীকে একটু গরম দুধ খাওয়াইতে বলিলেন, আর বলিলেন, "মিত্র মহাশয় যাহাতে একটু নিদ্রা যাইতে পারেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। যদি কোন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত না হয়, তবেই মঙ্গল। আপনারা গোলমাল করিবেন না। কাল প্রাতে আমি আবার আসিয়া দেখিয়া যাইব।"

বহির্বাটীতেই বেণীভূষণের অবস্থানের ব্যবস্থা হইল। কাত্যায়নী ও পুত্রবধূ উভয়েই পার্শ্বে বসিয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। দাসদাসী পাড়া-প্রতিবাসী আত্মীয়-স্বজন, সাধ্যমতে কেহই তদ্বিরের ত্রুটি করিল না

কবিরাজ মহাশয় চলিয়া যাইবার সময় পুনর্ব্বার বলিয়া গেলেন,—"খুব সাবধানে থাকিবেন। সারারাত্রি রোগীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। নূতন কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে, আমায় সংবাদ দিবেন।

রোগীর কোনরূপ যন্ত্রণা বোধ হইলে, এই ছোট বড় দুইটী বটিকা দিয়া যাইতেছি, প্রথমে ছোট বটিকাটী মধু দিয়া মাড়িয়া সেবন করাইবেন; তাহাতেও যদি ফললাভ না হয়, তাহার এক দণ্ড পরে, বড় বটিকাটী তুলসীপাতা ও আদার রস দিয়া মাড়িয়া রোগীকে সেবন করাইবেন।

রাজবৈদ্য বিদায় গ্রহণ করিলে, তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে, বেণী-ভূষণের পরিচর্য্যা চলিতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

চক্র-পরিবর্ত্তন।

কৃতান্তকুমারকে দেবীপ্রসাদের ভৃত্যগণ অপমান করিয়া রাজবাটী হইতে বাহির করিয়া দিবার অল্পক্ষণ পরেই, নবাব আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে দেবীপ্রসাদকে রাজ্যচ্যুত করিবার আদেশ লইয়া, আলিবর্দ্দীর অন্যতম সেনানায়ক মহবৎ খাঁ নাটোর-রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এত সত্বর এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইবে,—দেবীপ্রসাদ তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই! যেন বিনামেঘে বজ্রপাত হইল!

সেনাপতি মহবৎ খাঁ আসিয়া প্রথমেই রাজধানী অবরোধ করিয়া বসিলেন। পরিশেষে রাজ-সিপাহীদিগকে অস্ত্রত্যাগে বাধ্য করিলেন। দেবীপ্রসাদকে সিংহাসনচ্যুত করাইয়া, তিনি রামকান্ত রায়কে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আসিয়াছেন,—সহরের চারিদিকে সেই সংবাদ রাষ্ট্র হইল। রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে, সিপাহিদিগের ভিতরে, যাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল, তাহারা

পরিত্রাণ পাইল! কিন্তু যাহারা বশ্যতা স্বীকারে কোনরূপ দ্বিধাভাব প্রকাশ করিতে গেল, মহবৎ খাঁ তাহাদিগকে বন্দী করিলেন; রাজ-বাটী হইতে বা নগর হইতে কেহ কোনও দ্রব্য স্থানান্তরিত করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষরূপে প্রহরীর বন্দোবস্ত হইল।

রামকান্ত রায়ের বিরুদ্ধাচারী বলিয়া যাহাদের প্রতি সন্দেহ ছিল, একে একে তাহাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করা হইল। মনোহর রায়, বিশ্বেশ্বর গুহ, হীরালাল বন্দী হইলেন। বেণীভূষণের ঘরবাড়ী ঘেরাও করিয়া, তাহাকেও বন্দী করিবার জন্য লোক ছুটিল। কিন্তু বেণীভূষণের তখন মুমূর্ষু অবস্থা! হুকুম ছিল—'বেণীভূষণকে যে অবস্থায় পাইবে, সেই অবস্থায়ই বাঁধিয়া আনিবে!' কিন্তু কার্য্য-কালে তাহা আর ঘটিল না।

বেণীভূষণের বাটী ঘিরিয়া ফেলিয়া একজন অশ্বারোহী সৈন্য রাজ-বাটীতে আসিয়া বেণীভূষণের অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিল। দয়ারাম রায় তখন দীঘাপাতিয়ার বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি মুমূর্ষু বেণীভূষণের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে নিষেধ করিলেন। অধিকন্তু বলিয়া দিলেন,—"তাহার যেরূপ শুশ্রূষা চলি-তেছে, তাহাই চলিতে থাকুক; তৎপক্ষে যেন কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে।" কৃতান্তকুমার পিতার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া যখন রাজপথে ধাবমান হইতেছিল, সেই সময়ই সে গ্রেপ্তার হইল।

দেবীপ্রসাদ সেদিন নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। 'রামকান্ত রায় রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া অপরাধীদিগের সম্বন্ধে যেরূপ বিচার-ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই বিহিত হইবে,'—নবাবের আদেশ ছিল। সুতরাং বন্দীভাবে সকলকেই সেই প্রতীক্ষায় থাকিতে হইল।

সংসার-নাট্যশালার যেন আবার এক দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল। অদৃষ্ট-চক্রনেমির এক নূতন পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গেল।

রাণী ভবানী।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বস্মৃতি

ভাগ্যবলে রামকান্ত রায় স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

যে কৌশলে, যে অবস্থায়, রঘুনন্দন কর্ত্তৃক নাটোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, আবার সেই পুরাতন স্মৃতি মনে পড়িতে লাগিল।

কি অবস্থায় পড়িয়া কি করিয়া রঘুনন্দন নাটোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, বিচিত্র সে ইতিকথা। যতদিন বাঙ্গালা থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে, ততদিন সে স্মৃতি সমুজ্জ্বল রহিবে; দিনে দিনে, জনে জনে, সে কাহিনী কীর্ত্তন করিবে।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে সমাসীন। নবাবী-রক্ষায় তাঁহার দক্ষিণহস্তরূপে দণ্ডায়মান হইয়া, রঘুনন্দন নাটোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

রঘুনন্দনের পিতা কামদেব, পুটিয়ার রাজা নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে সামান্ত তহশীলদারের কার্য্য করিতেন। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে প্রায়ই লস্করপুর-পরগণার বারুইহাটী গ্রামে থাকিতে হইত। কামদেব—বারুইহাটীর তহশীলদার ছিলেন।

রঘুনন্দন—কামদেবের মধ্যম পুত্র। তৎকালোপযোগী লেখা-পড়া শিক্ষা করিয়া, তিনিও পুটিয়ার রাজসংসারে চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। দেবপূজার পুষ্প আহরণ—তাঁহার কার্য্য ছিল।

চাকরীর সময়েই রঘুনন্দনের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন। প্রবাদ এই,—শ্রান্ত-ক্লান্ত রঘুনন্দন একদিন পুষ্পোদ্যানে নিদ্রা যাইতে-ছিলেন, তাঁহার বদনমণ্ডলে সূর্য্যের প্রখর কিরণ-জাল পতিত হইতেছিল; আর একটী বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার মস্তকে ছায়া বিস্তার করিয়াছিল

অভাবনীয় ঘটনা মাত্রকেই লোকে ভবিষ্য শুভাশুভের পরিচায়ক বলিয়া মনে করে। সর্পকর্তৃক ফণা-বিস্তারে সূর্য্য-রশ্মি-নিবারণ—ভবিষ্য-রাজচিহ্ন বলিয়া উক্ত হইল।

"রঘুনন্দন পুষ্পবৃক্ষের তলদেশে নিদ্রা যাইতেছিল; সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাহার মুখমণ্ডল-পতিত সূর্য্যরশ্মি নিবারণ করিতে-ছিল; শ্যামাচরণ দেখিয়া আসিয়াছে; রঘুনন্দন শীঘ্রই রাজচক্রবর্ত্তী হইবে;"—অবিলম্বে পুটিয়ার প্রত্যেক নর-নারীর মুখে এই সংবাদই প্রচার হইতে লাগিল। এত আন্দোলন—এত তোলপাড়। রাজা দর্পনারায়ণের কর্ণেও সে সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিল না। দর্প-নারায়ণ—তখন পুটিয়ার অধীশ্বর। তিনি শুনিয়াছিলেন,—ফণা-বিস্তারে সর্পকর্তৃক নিদ্রিত ব্যক্তিকে ছায়াদান—তাহার ভবিষ্য সুখৈ-শ্বর্য্যের পরিচায়ক। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া রাজা দর্পনারায়ণ রঘুনন্দনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রঘুনন্দন রাজসমীপে উপনীত

হইলে, দর্পনারায়ণ তাঁহাকে কহিলেন—“যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি! কিন্তু তোমায় একটা কথা বলিতে চাহি। রঘুনন্দন, তুমি প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবে কি?—‘আমার বংশধরগণের বা আমার জমিদারীর কোন অনিষ্ট করিবে না?”

রাজা দর্পনারায়ণের মুখে সহসা এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন চমকিয়া উঠিলেন। দর্পনারায়ণের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রাজা দর্পনারায়ণের তিনি সামান্য চাকর মাত্র। তাঁহার দ্বারা রাজার কি অনিষ্ট হওয়া সম্ভবপর? রাজা তাঁহাকে এমন কথা কেন বলিতেছেন?—রঘুনন্দন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

রঘুনন্দনকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া, রাজা দর্পনারায়ণ পুনরপি কহিলেন,—“রঘুনন্দন! তোমার ললাটে রাজচক্রবর্ত্তীর চিহ্ন বিদ্যমান। তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হইবে। তাই বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবে কি?—‘রাজচক্রবর্ত্তী হইলে, আমার বংশধরদিগের কখনও কোনও অনিষ্ট করিবে না?”

রঘুনন্দন যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেবপূজার পুষ্প আহরণ যাহার জীবিকা, সে রাজচক্রবর্ত্তী হইবে! রঘুনন্দনের বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। রঘুনন্দন জানিতেন,—সে ভাগ্য লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই! তাই তাঁহার প্রভুর নিকট প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইতেও বিলম্ব ঘটিল না। তিনি নিঃসঙ্কোচে রাজার নিকট অঙ্গীকার করিলেন,—“আমার দ্বারা পুটিয়ার রাজবংশের কখনও কোনও অনিষ্ট হইবে না,—আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি!” এইখানে রঘুনন্দনের জীবন-নাট্যের প্রথমাঙ্ক শেষ হইল।

ইহার পরই রঘুনন্দনের প্রতি রাজা দর্পনারায়ণের শুভদৃষ্টি পতিত হইল। রাজা দর্পনারায়ণ রঘুনন্দনের প্রতিভার ও বুদ্ধিমত্তার

কিছু কিছু পরিচয় পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে রঘুনন্দনকে আপনার মোক্তার বা উকীল নিযুক্ত করিয়া ঢাকায় নবাব-দরবারে প্রেরণ করিলেন। তখনও পর্য্যন্ত ঢাকা সহরেই বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। মোক্তার বা উকীল না থাকিলে, জমিদারের রাজ্য-রক্ষা সুকঠিন। তাই রাজা দর্পনারায়ণ রঘুনন্দনকে আপন মোক্তার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

এই সময়ে দিল্লীর গৌরবরবি অস্তমিতপ্রায়। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কুশাসনে, দেশের সর্ব্বত্র বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত। দক্ষিণে মহারাষ্ট্র-শৌর্য্য, এবং পশ্চিমে রাজপুতপ্রতাপ গর্ব্বোন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান। সর্ব্বত্রই রাজস্বসংগ্রহ-বিষয়ে বিষম ব্যাঘাত জন্মিতেছে। বঙ্গদেশেও সে বিশৃঙ্খলার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা-প্রভাবে, অল্পদিন মধ্যেই রঘুনন্দন নবাবের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইলেন। মুসলমানদিগের আইন-কানুনে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। এই হইতেই রঘুনন্দনের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল। নবাব-মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাকে 'নায়েব-কাননগো'র পদে নিযুক্ত করিলেন। সুবার ভূ-সম্পত্তি রেজেষ্টারী করা, পরগণা ও মৌজার সীমা সহরদ্দ বজায় রাখা, রাজস্ব ও ভূ-সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থা-নির্দ্ধারণ প্রভৃতিই নায়েব-কাননগোর কার্য্য ছিল। প্রধানতঃ দেশের ভূস্বামিবর্গই কাননগো বা নায়েব-কাননগো-পদের অধিকারী হইতেন; এবং তাঁহাদের সাহায্য-কলে রাজার রাজস্ব সংগৃহীত হইত। রঘুনন্দন বিশেষ দক্ষতার সহিত নায়েব-কাননগোর কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। নবাব এবং অপরাপর উচ্চ কর্ম্মচারিগণ ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইলেন। রাজা দর্পনারায়ণও রঘুনন্দনের গুণে মুগ্ধ রহিলেন।

একটী ঘটনায় রঘুনন্দনের কৃতিত্ব উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তখন বাদসাহের নিকট নবাবদিগের 'নিকাশ' দিবার প্রথা ছিল না। রাজস্ব-প্রেরণের তালিকা ভিন্ন অন্য কোনও নিকাশী দলীল বাদশাহ-দরবারে প্রেরিত হইত না। অথচ "হিসাব ঠিক হইয়াছে" বলিয়া, সেই রাজস্ব-তালিকায় কাননগোদিগকে দস্তখত ও সহিমোহর করিতে হইত।

এই সময়ে মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-ওশ্বান বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার বা প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহার অধীনে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজা দর্পনারায়ণ এবং রাজা জয়নারায়ণ প্রভৃতি কাননগোর পদ অধিকার করিয়াছিলেন। কাননগো-গণ সুবাদারের অধীনে পরিচালিত হইতেন। সুবাদারই তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিতেন এবং সম্রাটের অনুমোদন হইলেই তাঁহারা নিয়োগ-পত্র পাইতেন। দেওয়ানের রাজস্ব-প্রেরণের হিসাবে তাঁহারা স্বাক্ষর করিলেই সেই হিসাব সম্রাট্-সমীপে প্রেরিত হইত। কাননগো-গণ স্বাক্ষর না করিলে, সম্রাট্ হিসাব মঞ্জুর করিতেন না।

এই সময়ে (১৭০৩-০৪ খৃষ্টাব্দে) আজিম-ওশ্বানের সহিত মুর্শিদকুলি খাঁর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। আজিম-ওশ্বান সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পৌত্র; বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার বা শাসনকর্ত্তা। আর মুর্শিদকুলি খাঁ আজিম-ওশ্বানের অধীনে বাঙ্গালার দেওয়ান—সামান্য ক্রীতদাস হইতে দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত। উভয়ের মনোমালিন্য-সূত্রে আজিম-ওশ্বান; কাননগোদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন,—তাঁহারা যেন মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব-তালিকায় দস্তখত ও সহিমোহর না করেন। কাননগোগণ সুবাদারকেই প্রধান বলিয়া জানিতেন; সুতরাং তাঁহার ইঙ্গিতেই চালিত হইলেন।

হিসাব-পত্রে কোনও 'কাননগো'র দস্তখত না পাওয়ায় মুর্শিদকুলি খাঁ প্রমাদ গণিলেন!

দেওয়ানী পাইয়া, মুর্শিদকুলি খাঁ সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার দেওয়ানীতে আওরঙ্গজেব প্রতিবৎসর বর্দ্ধিতহারে রাজস্ব পাইতেন; তাই মুর্শিদকুলি খাঁকে ব্রাহ্মণ-সন্তান জানিয়াও তাঁহার প্রতি সম্মান-বর্ষণে ত্রুটি করিতেন না।

অর্থবিষয়ে কর্ত্তৃত্বাধিপত্য, আবার বাদশাহ-দরবারে সম্মান-প্রতিপত্তি—মুর্শিদকুলি খাঁর ঐশ্বর্য্য দর্শনে, আজিমের হৃদয়ে ঈর্ষানল জলিয়া উঠিল; এদিকে সাহজাদার কার্য্যে সময় সময় দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ প্রতিবাদ করিতেন। আজিমের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল! তখন আজিম আপন স্বেচ্ছাচারের কণ্টকস্বরূপ মুর্শিদকুলি খাঁকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সুযোগ পাইতে বড় বিলম্ব ঘটিল না। সেই সময় আবদুল ওয়াহেদ নামক জনৈক রেসালদারের অধীনে কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত 'নগদী' সৈন্য আসিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হইল। 'নগদী' সৈন্য নগদ টাকায় রাজকোষ হইতে বেতন পাইত; সুতরাং তাহারা জমিদারদিগের আশ্রিত পূর্ব্বতন সৈন্যগণের প্রতি অযথা ঘৃণা প্রদর্শনে ত্রুটি করিত না। আজিম ওশ্বান এই আবদুল ওয়াহেদকেই আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রধান সহায়স্বরূপ গ্রহণ করিলেন।

একদিন আবদুল ওয়াহেদকে আপনার পরামর্শসভায় ডাকাইয়া আজিম ওশ্বান নিজ কু-অভিসন্ধির বিষয় স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিলেন; বলিলেন,—"যদি দেওয়ান মুর্শিদকুলিকে নিহত করিতে পার, প্রচুর পুরস্কার পাইবে।" সামান্য রেসালদার ওয়াহেদ, সম্রাট-পৌত্রের প্রচুর পারিতোষিকের লোভ সংবরণ করিতে পারিবে

কেন? সহজেই সে আজিমের প্রস্তাবে সম্মত হইল। পরামর্শ স্থির হইল,—মুর্শিদকুলি খাঁ যখন রাস্তায় বাহির হইবেন, তখন কোনও অছিলায় গোলযোগ বাধাইয়া, তাঁহাকে সেইখানেই নিহত করিবে। ওয়াহেদ সেইমতই আপন সৈন্যদলকে আদেশ করিল।

মুর্শিদকুলি খাঁ প্রকাশ্যভাবে সম্রাট্-পৌত্রের প্রতি কোনরূপ অবিশ্বাসের ভাব প্রদর্শন করেন নাই। তবে তিনি জানিতেন,—আজিম ওশ্বান তাঁহার প্রতি একদিনের জন্যও সন্তুষ্ট নহেন; তাই মুর্শিদকুলি খাঁ যখনই রাজ্য-দর্শনে বহির্গত হইতেন, তখনই তাঁহার সহিত একদল সশস্ত্র প্রহরী লইতেন, নিজেও পরিচ্ছদাভ্যন্তরে বর্ম্ম পরিধান করিতেন।

আজিমের ষড়যন্ত্রের বিষয় তিনি কিছুই অবগত ছিলেন না। আজিম ওশ্বান সম্রাটের প্রতিনিধি, সুতরাং তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান-প্রদর্শনেও মুর্শিদকুলি খাঁ কদাচ পরাঙ্মুখ ছিলেন না। একদিন প্রত্যূষে মুর্শিদকুলি খাঁ দরবারে যাইতেছেন; ওয়াহেদ সদলে পথিমধ্যে তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। বেতন চাহিল; গোলযোগ উপস্থিত করিল! মুর্শিদকুলি খাঁ তৎক্ষণাৎ পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া আপনার অনুচরবর্গকে পথ পরিষ্কার করিতে আদেশ দিলেন; উভয় দলে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল! মুর্শিদকুলি খাঁ স্বয়ং তরবারি-হস্তে ওয়াহেদকে পরাস্ত করিলেন। নগদী সৈন্য পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিল।

মুর্শিদকুলি খাঁর মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল, এই ষড়যন্ত্রের মূল আজিম ওশ্বান। তখন তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে তরবারি ধরিয়া দরবারে উপনীত হইলেন। সেদিন আর আজিম ওশ্বানের প্রতি সম্মানসূচক সম্ভাষণ করিলেন না; সগর্ব্বে কহিলেন,—"বুঝিয়াছি,—আপনার পথের কণ্টক আমাকে অপসারিত করিতে না পারিলে, আপনার পাপলিপ্সা চরিতার্থ হইবে না; তাই দলিত পন্নগের ন্যায় আপনি

গুপ্তভাবে আমাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন! কিন্তু আপনার সে আশা বৃথা। আমার প্রাণবধে যদি আপনি কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন; জানিবেন,—আমারও প্রতিজ্ঞা, এই প্রাণ-বিনিময়ে আপনারও প্রাণ মূল্যস্বরূপ গৃহীত হইবে। যদি আমার প্রাণসংহার আপনার একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়; আসুন, সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।"

মুর্শিদকুলি খাঁর এবংবিধ বীরোচিত ব্যবহারে আজিম ওশ্বান হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তিনি নানা প্রকারে আপনার দোষক্ষালনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওয়াহেদকে ডাকাইয়া কত শাসন করি-লেন,—কত ভয় দেখাইলেন। কিন্তু কিছুতেই মুর্শিদকুলি খাঁর ক্রোধশান্তি হইল না। তখন তিনি আপন দস্তখতী 'চিঠি' দিয়া ওয়াহেদের বাকী বেতন পরিশোধ করিয়া দরবারগৃহ ত্যাগ করি-লেন। সম্রাটের সেরেস্তা হইতে সৈন্যদিগের নাম কাটিয়া দেওয়া হইল।

আপনার দেওয়ান-খানায় উপস্থিত হইয়া মুর্শিদকুলি খাঁ অমাত্য-গণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলেই একবাক্যে আজিম ওশ্বানের নিন্দাবাদ করিলেন। বিদ্রোহিগণের আচরণ সরকারী কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ হইল। বন্দোবস্ত হইল,—রাজস্ব-তালিকার সহিত এই বিবরণও বাদসাহ সকাশে প্রেরিত হইবে।

আজিম ওশ্বানের সহিত মনোমালিন্য দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু ঢাকায় তখন আজিম ওশ্বানের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। সুতরাং তখন ঢাকায় অবস্থান আর নিরাপদ্ নহে মনে করিয়া মুর্শিদকুলি খাঁ অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজা দর্পনারায়ণ, রঘুনন্দন প্রভৃতি সকলেই সেই পরামর্শসভায় উপস্থিত ছিলেন। দর্পনারায়ণ প্রধান নায়েব কানন-গো হইলেও, রঘুনন্দনই দেওয়ানের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন! এক্ষণে

প্রধানতঃ রঘুনন্দনের পরামর্শে, অপরাপর কর্ম্মচারিগণের অনুমোদনে দেওয়ানখানা স্থানান্তরিত করিবার জন্য মুর্শিদকুলি খাঁ ব্যগ্র হইলেন। কয়েক দিন বিশেষ তর্ক-বিতর্ক চলিল। অবশেষে দেওয়ানী মসনদ ঢাকা হইতে উঠাইয়া আনাই সাব্যস্ত হইল। তখন সকলেই এক-বাক্যে বলিলেন,—"চুনাখালি পরগণার মুখসুদাবাদ—দেওয়ানখানা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান।" তদনুসারে আজিম-ওশ্বানের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই, মুর্শিদকুলি খাঁ, ঢাকায় প্রতিনিধি মাত্র রাখিয়া সদলে মুখসুদাবাদে চলিয়া আসিলেন। মুখসুদাবাদে দেওয়ানখানা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। রঘুনন্দনের ক্ষমতা আর একটু বৃদ্ধি পাইল; এদিকে আজিম ওশ্বান আপনাকে বিশেষ অপমানিত মনে করিয়া, প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়েই সরকারী "সওয়ানী নেগারে" কাগজ-পত্র বাদসাহ-দরবারে উপনীত হইল। মুর্শিদকুলি খাঁর প্রতি আজিম ওশ্বানের দুর্ব্যবহারে এবং বাঙ্গালার বিদ্রোহে আওরঙ্গজেব বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। আজিমকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। আজিম-ওশ্বানের প্রতি এক হুকুমনামা জারি হইল,—"অনতিবিলম্বে তুমি ঢাকা পরি-ত্যাগ করিয়া বিহারে চলিয়া আসিবে।" বাদসাহের হুকুম; আজিম ওশ্বান অমান্য করিতে পারিলেন না। পুত্র ফেরোকসেরকে ঢাকায় রাখিয়া, আপনি আজিম ওশ্বান সপরিবারে পাটনায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ-বহ্নিতে ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হইল। আজিম-ওশ্বান দ্বিতীয় সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে, মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজী দাক্ষিণাত্যে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিলেন। সে আগুনের দাবদাহে সমগ্র দাক্ষিণাত্য দাউ দাউ জ্বলিতেছিল। বিংশ বৎসরের চেষ্টায়ও আওরঙ্গজেব সে

আগুন নিবাইতে পারেন নাই। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, দাক্ষিণাত্য-সমরের ব্যয়-সঙ্কুলনার্থ আওরঙ্গজেবের অর্থের আবশ্যক হইল। দিল্লীর রাজকোষে অর্থ নাই; অগত্যা তিনি বাঙ্গালার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁর নিকট অর্থ চাহিয়া পাঠাইলেন।

বৎসরের শেষভাগে হিসাব-পত্র প্রস্তুত করিয়া মুর্শিদকুলি খাঁ দাক্ষিণাত্যে বাদসাহ-সকাশে গমন করিবেন। সেই কাগজ-পত্রে কাননগোর দস্তখত আবশ্যক; নহিলে, বাদসাহ-দরবারে রাজস্ব-সংক্রান্ত হিসাব পেশ হইবে না। কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁ কাহারও দস্তখত পাইলেন না। আজিম-ওশ্বান প্রতিহিংসার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন; সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় কাননগোদ্বয়—রাজা দর্পনারায়ণ ও জয়নারায়ণকে রাজস্ব-নিকাশ-পত্রে দস্তখত করিতে নিষেধ করিলেন। কাননগোদ্বয় উভয়-সঙ্কট গণিলেন।

রাজস্ব-হিসাব-পত্রে দস্তখত করিলে, সম্রাটের পৌত্র বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আজিম-ওশ্বানের কোপানলে পড়িতে হইবে, আবার কাগজ-পত্রে দস্তখত না করিলে, দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ অসন্তুষ্ট হইবেন! কোন্ পথ অবলম্বন শ্রেয়ঃ,—তাঁহারা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সাব্যস্ত হইল—তাঁহারা কেহই, কাগজাৎ তকশীস্, ওয়াশীল বাকী, খারিজা দাখিল প্রভৃতি কোন হিসাবেই দস্তখত করিবেন না।

কাননগোদ্বয় কাগজে দস্তখত করিলেন না; তাঁহাদের বিনা দস্তখতে হিসাব-নিকাশ পেশ হইবে না;—এই চিন্তায় মুর্শিদকুলি খাঁ চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। দিল্লীর রাজকোষ অর্থশূন্য; বাদসাহের অর্থের অনাটন; সম্রাট্ পুনঃপুনঃ তাগিদ পাঠাইতেছেন। সময়ে রাজস্ব দাখিল না করিলে, দেওয়ানী

থাকিবে না;—মুর্শিদকুলি খাঁর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গত্যন্তর না দেখিয়া, তিনি রঘুনন্দনের শরণাপন্ন হইলেন;—বলিলেন,—"বড় বিপদ্। এ যাত্রায় আপনি রক্ষা না করিলে, আমার সর্ব্বনাশ হয়! আজিমের প্ররোচনায় কাননগোদ্বয় কেহই দস্তখত করিলেন না। বাদসাহের অর্থের অনটন। এ সময় রাজস্ব প্রদান না করিলে, আমার দেওয়ানী থাকিবে না। যদি কোনও উপায় থাকে, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া আমায় এ যাত্রা রক্ষা করুন।"

"আজিমের প্ররোচনা"—এই কথা শুনিয়া রঘুনন্দনের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। অনেক ভাবনাই মনে উদয় হইল। কিন্তু সকল চিন্তা দূরে রাখিয়া, ভবিষ্য মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় না ভাবিয়া, তিনি সহি করাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। রঘুনন্দন অনেক চেষ্টা করিয়াও দর্পনারায়ণ ও জয়নারায়ণকে সম্মত করাইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু একজন নিম্নতম কাননগোর নাম-স্বাক্ষর পাইলেন। মুর্শিদকুলি খাঁকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"ইহাতেই আপনার কার্য্যোদ্ধার হইবে। আপনার চিন্তার কারণ আদৌ নাই।" মুর্শিদকুলি খাঁ, এই কার্য্যে রঘুনন্দনের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন।

সেই একজনের দস্তখতী হিসাব লইয়াই, বহু অর্থ উপঢৌকন সমভিব্যাহারে, মুর্শিদকুলি খাঁ দাক্ষিণাত্যে উপনীত হইলেন। বাঙ্গালায় রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছে; বাঙ্গালার দেওয়ান বহু অর্থ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন; এতাধিক অর্থ বাদসাহ আর কখনও বাঙ্গালার কোষাগার হইতে প্রাপ্ত হন নাই;—আওরঙ্গজেব তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। সেই অনটনের সময়, কে দস্তখত করিয়াছে বা কে না করিয়াছে—সে কথা আর আমলে আসিল না। কাগজ পেশ হইল। বাদসাহ অর্থ গ্রহণ করিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ সম্মান-ভূষণে ভূষিত হইলেন

তাঁহাকে সম্রাট্—পরিচ্ছদ, পতাকা ও দামামা প্রভৃতি প্রদানে, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ও সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন! ইহার পরই মুর্শিদকুলি খাঁ আপন নামানুসারে রাজধানীর নাম 'মুর্শিদাবাদ' রাখিলেন। তথায় প্রাসাদ এবং টাকশাল নির্ম্মিত হইল। এই ঘটনায় আজিম-ওশ্বান বিরক্ত হইলেন বটে; কিন্তু তাহাতে মুর্শিদকুলি খাঁর কোনই অনিষ্ট হইল না।

বাঙ্গালার জমিদারগণের ক্ষমতা তখন অসীম ছিল; জমিদার-গণ ইচ্ছা করিলে, তখন অনায়াসেই নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিতেন। তাই মুর্শিদকুলি খাঁ রাজা দর্পনারায়ণকে প্রকাশ্যে কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। বিশেষতঃ কাননগো নিয়োগ করিবার বা কাননগোদিগকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা, দেওয়ানের কিছুই ছিল না; দেওয়ান কেবল নির্ব্বাচন করিতেন মাত্র। সুতরাং মুর্শিদকুলি খাঁ প্রতিহিংসা-বহ্নি অন্তরেই পোষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে খাজনাখানার প্রধান কর্ম্মচারী পেস্কার ভূপতি রায়ের মৃত্যু হইল। রাজা দর্পনারায়ণ সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন! সেই পদোন্নতিই রাজা দর্পনারায়ণের পতনের কারণ হইল। দর্পনারায়ণ জানিতেন,—সুযোগ পাইলে মুর্শিদকুলি খাঁ প্রতিশোধ লইবে। সুতরাং অতি সাবধানে আপনার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। দর্প-নারায়ণ যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, সে পদ বহু সম্মানের। নবাব দুর্ব্বল বা রাজ্যশাসনে অপারগ হইলে, খাজনাখানার প্রধান কর্ম্ম-চারীই সর্ব্বেসর্ব্বা! প্রকারান্তরে, তাঁহার পরামর্শ অনুসারে, তাঁহাধ আজ্ঞাধীনেই, নবাব পরিচালিত হইতেন। কিন্তু সেই সম্মানের পদ,—রাজা দর্পনারায়ণকে অধিকদিন ভোগ করিতে হইল না। একদিন নিকাশ গ্রহণের অছিলায় মুর্শিদকুলি খাঁ রাজা দর্প-

নারায়ণকে কারারুদ্ধ করিলেন। সেই কারাগারেই দর্পনারায়ণের মৃত্যু হয়।

ইহার পরই রঘুনন্দন নবাবের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাকে রায়রায়ান্ উপাধি প্রদান করিলেন। রঘুনন্দনের কৃতিত্বের উজ্জ্বল আলোকে দিক্ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল।

অতঃপর যখন মুর্শিদকুলি খাঁ নূতন রাজস্ব-বন্দোবস্ত আরম্ভ করিলেন; রঘুনন্দন তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন। সমগ্র বঙ্গদেশ তখন তেরটী চাকলা বা বিভাগে এবং এক হাজার ছয় শত আটটী পরগণা বা উপবিভাগে বিভক্ত হইল। মুর্শিদকুলি খাঁ আপন জামাতা সৈয়দ রেজা খাঁর উপর রাজস্বসংগ্রহের সমুদয় ভার অর্পণ করিলেন। তখন বঙ্গদেশের বৰ্দ্ধিত রাজস্ব ১ কোটী ৪২ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৮৬ টাকা নির্দ্ধারিত হইল; আর সেই টাকা আদায়ে রেজা খাঁর অত্যাচার বাঙ্গালার জমিদারগণের পক্ষে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল। তখন, রাজস্ব প্রদান করিতে না পারায়, কোনও জমিদারের প্রাণদণ্ড হয়, কোনও জমিদার বন্দী হন, কাহারও প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড বিহিত হয়। "বৈকুণ্ঠের" সৃষ্টি সেই সময়েই।

সেই সময় হইতেই রঘুনন্দন জমিদারী ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। রাজস্ব অনাদায়ের জন্য অনেক জমিদারের সম্পত্তি বিক্রয় হইতে থাকে; নূতন জমিদারের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামজীবনের নামে রঘুনন্দন তখন জমিদারী ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন।

এক দিকে, জমিদারগণের প্রতি উৎপীড়ন; অন্যদিকে, নূতন জমিদার-সৃষ্টি। ইহাই নাটোর রাজ্যের মূল ভিত্তি। রঘুনন্দন নবাবকে বুঝাইলেন,—রামজীবনের ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই. তাঁহাকে জমিদারী প্রদান করিলে, রাজস্ব আদায়ে কোনই

বেগ পাইতে হইবে না। রঘুনন্দনের বাক্যে নবাব সহজেই আস্থা স্থাপন করিলেন। ফলে নাটোর-রাজ্যের সৃষ্টি হইল। রামজীবনও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া, নিয়মানুযায়ী রাজকর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় দিল্লীর বাদশাহ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট রহিলেন। তখন গ্রামের পর গ্রাম, জেলার পর জেলা, পরগণার পর পরগণা, বিভাগের পর বিভাগ, নাটোর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আসিল।

মুর্শিদকুলি খাঁর পর সুজাউদ্দীন বাঙ্গালার মস্‌নদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পরে সরফরাজ খাঁ নবাব হইয়াছিলেন। এই তিন নবাবের অধিকার সময়েই শনৈঃশনৈঃ নাটোর রাজ্যের উন্নতি সাধিত হইতেছিল। নবাব আলিবর্দ্দীর শাসন-সময়ে রাজা রামকান্ত রায় যখন নাটোর-রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, তখন অর্দ্ধবঙ্গ নাটোর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজ্যলাভে।

শুভক্ষণে রাজা রামকান্ত রায় রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। সহরে আনন্দের কলকল্লোল উত্থিত হইল। অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিল,—"বনবাসের পর রাম-সীতা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। সকলেই আশা করিতে লাগিল,—নাটোর-রাজ্যে আবার সুখ-শান্তি উছলিয়া উঠিবে।"

লোকের আশাও নিষ্ফল হইল না। দয়ারাম রায়ের পরামর্শ

অনুসারে ভবানীর মাতুল-পুত্র সুবিজ্ঞ চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। রামরূপপ্রমুখ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

এদিকে নানা বিষয়ে ভবানীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া, রাজা রামকান্ত রায় প্রায় প্রতি কার্য্যেই ভবানীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে ভবানীর প্রতিভার পরিচয় আপনা-আপনিই প্রচারিত হইয়া পড়িল।

একদিন রামকান্ত রায় ভবানীর নিকট রাজ্যের সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিয়া, ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উৎসব উপলক্ষে এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?"

ভবানী উত্তর দিলেন,—"রায় মহাশয় যাহা পরামর্শ দিবেন, চন্দ্র-নারায়ণ দাদা যাহা স্থির করিবেন, আপনাদের যাহা ভাল বোধ হইবে, তিন জনে যুক্তি করিয়া, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন। আমি স্ত্রীলোক সে বিষয়ে আমি কি বলিব?"

রামকান্ত।—"তোমাকেই বলিতে হইবে। রায় মহাশয়ের নিকট আমি এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তোমার নাম করিয়া বলিয়া দিলেন,—তুমি কি বল, তাহা না শুনিয়া তিনি কিছুই মত দিবেন না। তোমার নিকট রাজ্যের সকল অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়া, তোমার নিকট হইতেই তিনি পরামর্শ লইতে বলিয়াছেন।"

ভবানী বিষম চিন্তায় পড়িলেন। ভাবিলেন,—"এ আবার কি বিষম সমস্যায় পড়িলাম!" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আমার উপর এই গুরুকার্য্যের ভার না দিলে চলিত না?"

রামকান্ত।—"ভবানী!" আমি একা এজন্য দায়ী নহি। রায় মহাশয়, ঠাকুর মহাশয়—সকলেই তোমার উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া

আছেন। সকলই তো শুনিলে! এখন কোন্ বিষয়ে তোমার কি মত, স্পষ্ট করিয়া বল।"

ভবানী।—"আপনাদের যখন এতই জেদ, আমার যাহা মনে আসে বলিতেছি। আপনারা শুনিয়া, বিবেচনা করিয়া, যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করিবেন।"

"তাহাই হইবে। তোমার কি মত, ব্যক্ত কর।"—এই বলিয়া রামকান্ত রায় উত্তরের প্রতীক্ষায় ভবানীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ভবানী বলিতে লাগিলেন,—"আমার মতে কোষাগারে যে অর্থ সঞ্চিত আছে, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ আপাততঃ নবাব-সরকারে নজরাণা প্রেরণ করা হউক। অবশিষ্ট টাকায় প্রথমেই প্রজাদিগের অভাব-মোচনের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। যদি মত হয়, সোণা-ভাঙ্গার প্রজাদের যে ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা-দিগকে সেই ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের জন্য যথাযোগ্য অর্থসাহায্য করা যাউক। অজন্মা-নিবন্ধন খাজনার টাকা দিতে না পারিয়া উৎপীড়-নের ভয়ে যাহারা দেশত্যাগী হইয়াছে, তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনি-বার ব্যবস্থা করুন। খাজনা মকুপ দিয়া, যাহাতে তাহারা চাষ-আবাদ চালাইতে পারে, তদনুরূপ সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনুন।"

রামকান্ত।—"দেবীপ্রসাদ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য?"

ভবানী সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—"বলিতে সাহস হয় না। কিন্তু আমার ইচ্ছা—তাঁহার সম্বন্ধে বৃত্তির ব্যবস্থা হউক। স্বতন্ত্র বাড়ীতে নাটোরেই তিনি অবস্থিতি করুন। পরন্তু, তিনি আমাদের বিরুদ্ধে আর কোনও ষড়যন্ত্র করিতে না পারেন, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখুন।"

রামকান্ত বিস্ময়সহকারে কহিলেন,—"বেণী মামার সম্বন্ধেও কি তবে তোমার ঐ মত?"

ভবানী।—"আমি শুনিলাম, তাঁহার বাঁচিবার কোনই আশা নাই। তিনি মৃত্যুকালে একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন মাত্র। কৃতান্তকুমারের দণ্ডের ব্যবস্থা—নবাবের সেনাপতি মহবৎ খাঁই স্থির করিয়াছেন! সেদিনের সে ঘটনায়—আমাদের কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। এখন একমাত্র কাত্যায়নী ও তাঁহার পুত্রবধূ। যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে জানিলাম—সারাজীবন লোকের সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াও মৈত্র মহাশয় তাহাদের কোনই সংস্থান রাখিতে পারেন নাই। এমন কি, তাঁহার শুশ্রূষার ব্যয়-নির্ব্বাহ হওয়াও কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহই তাঁহাদের বিশ্বাস করে না; সুতরাং ঋণ করিয়াও যে তাঁহারা দিনপাত করিবেন, তাহার সম্ভাবনা দেখি না।

রামকান্ত।—"এ সংবাদ তোমার নিকট কি করিয়া পৌঁছিল?"

ভবানী।—"সত্য আপনিই প্রচার হয়। আমি যাহা জানিয়াছি, তাহার একবিন্দুও মিথ্যা নহে?"

রামকান্ত।—"যাহা হউক, বেণী মামার সম্বন্ধে তুমি কি করিতে বল?"

ভবানী।—"ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে আপনার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছেন। আপনি ইতস্ততঃ করিবেন না। তিনি শত্রু হইলেও এ অবস্থায় তাঁহাকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।"

রামকান্ত।—"ভবানী! আমার অন্তরের কথাই তুমি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছ। তাঁহাকে দেখিতে যাওয়া সম্বন্ধে তোমার যে অমত হইবে না, পূর্ব্বেই আমি তাহা জানিতাম।"

ভবানী।—"আপনি মৈত্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু কেবল চোখের দেখা দেখিতে গেলে চলিবে না। সত্য সত্যই যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তিনি যেন শান্তিতে মরিতে পারেন, সে ব্যবস্থা করিয়া আসিবেন।"

রামকান্ত।—“সেরূপ পাপিষ্ঠের শাস্তির ব্যবস্থা,—আমি কি করিব ভবানী? সে যে অহরহঃ আত্মগ্লানির তুষানলে দগ্ধ হইতেছে! আমার কি সাধ্য, আমি সে অনল শান্ত করি!”

ভবানী।—“সে কথা সত্য বটে! কিন্তু আপনার অন্য কর্ত্তব্য আছে। তিনি তো স্ত্রীকে ও পুত্রবধূকে পথে বসাইয়া যাইতেছেন। তাহাদের উপায় কি হইবে? আমার প্রার্থনা, আপনি তাঁহাদিগকে ভরসা দিবেন,—সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।”

রামকান্ত।—“ভাল, তাহাই হইবে। শুশ্রূষায় বেণী মামা যদি জীবন-লাভ করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিব। তাঁহার স্ত্রীর ও পুত্রবধূর সংস্থানের কথা! সে আর তোমাকে বেশী করিয়া বলিতে হইবে কেন? যাহা করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন, তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহাই ধার্য্য করিব।”

এই বলিয়া রামকান্ত রায় বাহিরে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। যাইবার সময় ভবানী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন,—“আমার শেষ কথা—শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি আপনি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। সকলেই যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, তৎপক্ষে চেষ্টা করিবেন। আমাদের সুখ-দুঃখে রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে সুখ-দুঃখ অনুভব করে, তেমনই ব্যবহারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।”

রামকান্ত উত্তর দিলেন,—“ভবানী! তোমার অভিপ্রায় আমি বুঝিয়াছি। রায় মহাশয় প্রভৃতিরও বোধ হয় এইরূপই অভিপ্রায়। যাহা হউক, যে বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা হয়, তুমি সকলই জানিতে পারিবে।”

ইহার পর রামকান্ত রায়, দয়ারাম রায় এবং চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের নিকট ভবানীর মনোভাব জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা উভয়েই সে মতে

অনুমোদন করিয়া, তদনুযায়ী কার্য্য-সম্পাদনে সম্মতি দেন। সকলেই ভবানীর বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে মনে মনে প্রশংসা করিতে থাকেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মীমাংসা।

আত্মারাম চৌধুরী ছাতিন-গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। চণ্ডীদাস শিরোমণির পরামর্শ অনুসারে মুর্শিদাবাদ-গমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তিনি গৌড়ে দয়ারাম রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে দয়ারাম রায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পরন্তু শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তখনও মুর্শিদাবাদ যাওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও, চণ্ডীদাস শিরোমণি তাহাতে আপত্তি জানাইয়াছিলেন; বুঝাইয়াছিলেন,—"কন্যাজামাতার দারুণ উদ্বেগের অবস্থায় অসুস্থ হইয়া আপনার সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। এ যাত্রার যেরূপ বিঘ্ন ঘটিতেছে, তাহাতে আপনার বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই বিধেয়।" শিরোমণি মহাশয় আরও বলিয়াছিলেন,—"আমি বরং আপনাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া দয়ারামের সন্ধান করিব। আপনার হইয়া, তাঁহাকে অনুরোধ জানাইব। তাঁহার অনুসন্ধানে আপনি যে গৌড় পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিব।"

সে পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া কতকটা উপায়ান্তর নাই দেখিয়াও, আত্মারাম চৌধুরী মুর্শিদাবাদে না গিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন; বাড়ীতে থাকিয়া, যতদূর সম্ভব, কন্যা ও জামাতার তত্ত্ব লইতে

থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহার শ্যালকপুত্র চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতি যখন তদ্বির করিতে মুর্শিদাবাদে গতাগতি করিতেছেন, তখন আর আপনার যাওয়ার বিশেষ আবশ্যকতাও উপলব্ধি করেন নাই। আপনার জমিদারী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করার পক্ষেও এ সময়ে এক বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। সে অন্তরায় অতিক্রম করিয়া বিদেশ-যাত্রা - তাঁহার পক্ষে তখন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাড়ী আসিয়া, কয়েক দিন পরেই, আত্মারাম চৌধুরী এক বিষম গণ্ডগোলে পড়িয়া যান। তাঁহার তালুকের মধ্য হইতে তাঁহারই প্রজা দীননাথ দাসের দ্বাদশবর্ষবয়স্ক পুত্রকে এই সময়ে ওলন্দাজেরা চুরি করিয়া লইয়া যায়। বাড়ী পৌছিয়াই তিনি সংবাদ পান,—ওলন্দাজ-দিগের জাহাজ পদ্মার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে; সময়ে সময়ে জাহাজ নঙ্গর করিয়া, তাহারা গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রবেশ করি-তেছে; এবং যাহার যাহা পাইতেছে, লুঠ করিয়া লইয়া যাইতেছে।

দীননাথ দাস, ওলন্দাজ জল-দস্যুদিগের লুণ্ঠনকাহিনী বর্ণন করিয়া, তাহার একমাত্র পুত্রকে ওলন্দাজেরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে বলিয়া যখন চৌধুরী মহাশয়ের নিকট কাঁদিতে লাগিল, চৌধুরী মহাশয় কোনক্রমেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। লোক লস্কর সংগ্রহ করিয়া, লাঠিয়াল সরকিওয়ালা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া, সেই দিনই তিনি ওলন্দাজ-জলদস্যুদিগের অনুসরণে ধাবমান হইলেন। অনেক দূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দীননাথ দাসের পুত্রের উদ্ধার-সাধন পক্ষে কিছুই করিতে পারেন নাই। ক্রমাগত সপ্তাহকাল চেষ্টা করিয়া, হতাশ হইয়া, তিনি যেদিন বাড়ী ফিরিয়া আসেন, সেইদিন আবার অন্য একখানি গ্রাম হইতে সংবাদ আসে,—সেই গ্রামের বংশীবদনের কন্যা মনোমোহিনীকে নবাবের

লোক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এদিকে, নিজ ছাতিনগ্রামেও নানারূপ বিভীষিকার প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ বলিতেছিল,—"বর্গি আসিতেছে"; কেহ বলিতেছিল,—"ওলন্দাজ দস্যুরা, ঘোরা-ফেরা করিতেছে"; কেহ বলিতেছিল,—"উচ্ছৃঙ্খল নবাবের সৈন্যদল লুঠ-তরাজ করিবার জন্য সন্ধান খুঁজিতেছে।"

চৌধুরী মহাশয় বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছেন। গ্রামের মধ্যে তিনিই মাতব্বর ব্যক্তি! যাহার মনে যে বিভীষিকা উপস্থিত হইতেছে, সকলেই আসিয়া তাঁহার গোচরীভূত করিতেছে! দীননাথ দাসের পুত্রের সন্ধান না পাইয়া যেদিন তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসেন, সেই দিন বৈকালে গ্রামশুদ্ধ লোক প্রায় সকলেই তাঁহার সাহায্য-প্রার্থনায় আগমন করিল। বৈকালে বাড়ীতে একটা মজলিস বসিয়া গেল। বৈঠকখানায় লোক গিস্‌গিস্‌ করিতে লাগিল। বৈঠকখানায় যখন স্থান সঙ্কুলান হইল না, তখন কেহ কেহ বা বাহিরের আঙ্গিনায় গিয়া উপবেশন করিল!

অন্যান্য দিন চৌধুরী মহাশয়ের বৈঠকখানায় গ্রামস্থ ভদ্রলোক-দিগের সমাগম হয় বটে; কিন্তু আজ যেমন তাঁহার বাড়ীতে গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই আসিয়া উপস্থিত, এরূপ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় না। বিশেষতঃ আজ যেরূপ সকলে চিন্তাকুল-চিত্ত, এরূপ ভাবও কচিৎ দৃষ্ট হয়। আজ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে গ্রামের কে না আসি-য়াছে? হরিদাস ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন; রামচন্দ্র মৈত্র আসিয়াছেন, কালীকিঙ্কর চৌধুরী আসিয়াছেন; চণ্ডীদাস শর্ম্মা আসিয়াছেন, দ্বারিকানাথ বসু আসিয়াছেন; হলধর মিত্র আসিয়াছেন। কেবল কি ব্রাহ্মণ কায়স্থই আসিয়াছেন? হীরু সর্দ্দার আসিয়াছে; ক্ষুদিরাম সর্দ্দার আসিয়াছে; নবীন দাস আসিয়াছে; শ্রীদাম মালাকর আসি-য়াছে; আরও কত কে আসিয়াছে। এক কথায়, ছেলে আসিয়াছে,

বুড়া আসিয়াছে, যুবা আসিয়াছে; আবার অন্দরে—গ্রামের স্ত্রী-লোকেরাও অনেকেই আসিয়াছেন।

চৌধুরী মহাশয়ের বৈঠকখানা বাটী একটী মহল-বিশেষ। সদর দরজা দিয়া উত্তরমুখে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে, প্রথমেই সেই বৈঠকখানার মহল। সে মহলে—চৌধুরী মহাশয়ের খাস বৈঠকখানা, আর তাঁহার আমলাদিগের কার্য্যালয় অবস্থিত। বৈঠকখানাটী উজ্জ্বল ছবিখানির ন্যায়, বহির্ব্বাটীর সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ যেন আলো করিয়া আছে। সেটী—সুন্দর একখানি আটচালা;—মোটা মোটা বাহাদুরী কাষ্ঠের খুঁটির উপর অবস্থিত। খুঁটিগুলির গায়ে লতাপাতা খোদাই করা; মাথার উপর বাঘের মুখ;—সেই মুখ-গহ্বরে চালের আড়া অবস্থিত। চাল—খড়ের ছাউনি সুবিন্যস্ত। চালের বাখারীগুলি নীল-পীত-লোহিত নানা রঙ-রঞ্জিত;—আবার সেইরূপ রঙ-রঞ্জিত বেতের বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ। রঙ-বেরঙের বাখারীতে সেই আটচালার রতি বা বেড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। যে দড়ি ও বেতের দ্বারা সেই বাখারীগুলি পরস্পর বাঁধা আছে, তাহাতেও নানা রঙের সমা-বেশ রহিয়াছে। আটচালার সেই বৃতি বা বেড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, মনে হয়—চিত্রকর যেন চারুচিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছে। আট চালার মধ্যস্থলে, নিম্নে, অর্দ্ধহস্ত উচ্চ চৌকির উপর—ফরাসের বিছানা; উপরে—ঝালর বিলম্বিত চন্দ্রাতপ।

ফরাসের মধ্যস্থলে, তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া চৌধুরী মহাশয় গুড়গুড়ির নলে তামাক টানিতেছেন; আর তাঁহার চারি পার্শ্বে গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে তিন চারিটী রূপা-বাঁধান হুঁকা, মস্তকোপরি জ্বলন্ত কলিকার মুকুট পরিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের অন্যান্য লোকেরা বর্ণ অনুসারে, ফরাসের নিম্নে চাতালে বসিয়া চৌধুরী মহাশয়ের

মুখের পানে চাহিয়া আছে। যে-ই যখন আসিতেছে, চৌধুরী মহাশয় সকলকেই যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন,—সকলেরই কুশল সংবাদ লইতেছেন।

বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই রামচন্দ্র মৈত্র সুর ধরিয়াছেন,—দেশের আর ভদ্রস্থ নাই। আজই হউক, আর কালই হউক, গ্রাম লুঠ করিতে আসিবেই আসিবে।"

হরিদাস ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন,—"আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গালায় নবাবের শক্তি দিনদিনই হ্রাস পাইতেছে। দেশের শান্তিরক্ষা নবাবের এখন সাধ্যাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

রামচন্দ্র মৈত্র সে কথায় আরও একটু জোর পাইলেন। তিনি বলিলেন,—"আমাদেরই সর্ব্বনাশ! রামে মারিলেও মরিবে, রাবণে মারিলেও মরিবে। হয় দস্যুদের হাতে, নয় নবাব-ফৌজের হাতে, আমাদের নিষ্কৃতি কোনদিকেই নেই।"

হরিদাস ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"মহারাষ্ট্রগণ যেরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা যেরূপভাবে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে রাজ্যরক্ষা-বিষয়ে নবাবের আশা বড়ই কম বলিয়া মনে হয়। পাকুড়িয়ায় সেদিন সদানন্দ স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের নিকট দেশের অবস্থার বিষয় বর্ণন করিতেছিলেন। তিনি যাহা বলিলেন,—সে বড় বিষম সংবাদ!"

সকলেই হরিদাস ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। চৌধুরী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি কি কথা বলিতেছিলেন?"

হরিদাস ভট্টাচার্য্য কহিতে লাগিলেন,—"সদানন্দ স্বামী বলিতেছিলেন, দেশে আবার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার সম্ভাবনা। মহা-

রাষ্ট্রগণ চৌথ আদায় করিবার জন্য বঙ্গদেশে অগ্রসর। তাহাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বর্দ্ধমানের দিকে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু সে সৈন্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহারা নগর লুণ্ঠন করিয়াছে।"

হরিদাস ভট্টাচার্য্যের কথায় বাধা দিয়া, রামচন্দ্র মৈত্র কহিলেন,—"তাই তো বলি। সাবধান হওয়াই এখন কর্ত্তব্য; সব বাজে কথা রাখিয়া, কোন্ দেশে কি হইল,—সে আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া, এখন আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করাই আবশ্যক।"

কালীকিঙ্কর চৌধুরী কহিলেন,—"আমার বেশী ভয়—মুসলমান-দের। শেষে কি মুসলমানদের হাতে জাতি দিতে হ'বে?"

চৌধুরী মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন,—"সে কথা কেন বলেন! মুসলমান এখন সম্রাট্। কিসে কোন্ কথা কইতে কি কথা দাঁড়ায়, বলা যায় না তো?"

কালীকিঙ্কর।—"আমি যা ব'লেছি, ঠিক কথাই ব'লেছি! আমার ভয়—সব চেয়ে তাহাদেরই। তারা যখনই যে গ্রাম দখল ক'রেছে, গ্রামকে গ্রাম কল্‌মা পড়িয়ে ছেড়েছে! শেষ বয়সে কি আমাদের কল্‌মা পড়্‌তে হবে? হা ধর্ম্ম!"

কালীকিঙ্কর আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চণ্ডী শর্ম্মা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"সব যায় যাক; দোহাই বাবা! দে'খ—যেন ধর্ম্মটা না যায়!"

চৌধুরী মহাশয় চণ্ডীশর্ম্মাকে শান্ত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালী-কিঙ্কর আবার সুর ধরিলেন,—"বর্গি আসে আসুক; সে বরং ভাল। কিন্তু মুসলমান যেন গাঁয়ে ঢুকতে না পারে। হরি কি মুখ তু'লে চাইবেন?"

কথায় কথায় কথা বাড়িয়া যায় দেখিয়া হলধর মিত্র কহিলেন,—

"কাজের কথার কি ?" এখন মান-প্রাণ রক্ষা হয় কিসে ? সেই চিন্তা কর্‌লেই ভাল হয় না কি ?"

দ্বারিকানাথ বসু বলিলেন,—"আমিও তাই বলি। আজ সকলেই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে এসেছে। আজ আর অন্য কথা ভাল লাগ্‌ছে না। লুঠ-তরাজ কিসে বন্ধ হয়, সেই উপায় আগে করা কর্ত্তব্য।"

যতই কথা উঠে, যতই আলোচনা আরম্ভ হয়, মুসলমানদিগের কলমা পড়ানর কথা লইয়া ততই আন্দোলন চলিতে থাকে। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কথারই পুনরালোচনা আরম্ভ হয়। একবার বা ওলন্দাজ দস্যুদের, একবার বা বর্গিদের, একবার বা ইউরোপীয় বণিক্‌গণের প্রসঙ্গ উঠে। আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া কলমা পড়ানর কথা আরম্ভ হয়।

একবার কথা কহিয়া বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়, চণ্ডী শর্ম্মা অহিফেনের মৌতাত একটু চড়াইয়া দিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—একদিকে ওলন্দাজ দস্যুগণ, একদিকে বর্গির দল, একদিকে ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বণিক্‌গণ আর একদিকে মুসলমানগণ—দেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তিনি দেখিতেছিলেন,—তাহারা দেশ লইতেছে; মনে মনে বলিতেছিলেন,—"নেয়, নেক্।" তিনি দেখিতেছিলেন,—তাহারা ঘরবাড়ী লুঠ করিতেছে; মনে মনে বলিতেছিলেন,—"লোঠে লুঠুক"। তিনি দেখিতেছিলেন,—"তাহারা জরু-গোরু হরণ করিতেছে।" মনে মনে বলিতেছিলেন,—"করে করুক।" দেশ লইল; ঘরবাড়ী লইল; টাকাকড়ি লইল; জরু-গোরু লইল;—চণ্ডী শর্ম্মা কোনই আপত্তি করিলেন না। কিন্তু শেষ তিনি দেখিলেন, —"তাহারা তাঁহার সবে-ধন নীলমণি অহিফেনটুকুও লুঠিয়া লইবার উপক্রম করিতেছে!"

চণ্ডীশর্ম্মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দ্বারিকানাথ বসুর শেষ কথাটা কর্ণে গিয়া যেমন প্রতিধ্বনিত হইল, চণ্ডী শর্ম্মা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সব ছেড়ে দিলাম, তবুও আশ মিটলো না। শেষ আমার নীলমণিকে নিয়ে টানাটানি!"

চণ্ডী শর্ম্মার চীৎকারে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। কিন্তু কেহ শান্ত করিবার পূর্ব্বেই চণ্ডীশর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন,—"সে কথা হবে না বাবা! সব নিওনা; কিছু রেখে যাও। ঐ আমার জীবন।"

এই বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে, চণ্ডী শর্ম্মা গাত্র সঞ্চালন করিলেন। তাহাতে হিতে বিপরীত ফল ফলিল। চক্ষু মুদিয়াই হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক তিনি যেমন অগ্রসর হইলেন, অমনি চৌধুরী মহাশয়ের গুড়গুড়ির উপর পড়িয়া গেলেন। গুড়গুড়ি গড়াগড়ি খাইল। গুড়গুড়ির কলিকার গুলের আগুন গম্‌গম্‌ করিতেছিল, ফরাসের উপর সেই আগুন ছড়াইয়া পড়িল। কালীকিঙ্কর চৌধুরী সেই আগুন নিবাইতে গিয়া লাঠির খোঁচা মারিয়া, আগুনগুলি চারিদিকে বিস্তৃত করিয়া দিলেন। রাত্রিকাল হইলে, সে আগুনের আরও বাহার ফুটিত, শুভ্র ফরাসের উপর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন গুলের আগুন, তাহা হইলে নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্রমালার ন্যায় শোভা পাইত! যাহা হউক, সকলে শশব্যস্তে বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন! গুলতানীতে দুই তিনটা হুঁকার আগুনও ছড়াছড়ি হইল। কাহারও কাপড় পুড়িল; কাহারও গায়ে ফোস্কা ফুটিল; কেহ বা উহুঁ করিলেন; কেহ বা গালি দিয়া উঠিলেন! ভৃত্যগণ তাড়াতাড়ি আগুন নিবাইতে গেল।

রামচন্দ্র মৈত্র নরম গরম স্বরে কহিলেন;—"চণ্ডী খুড়ো! তুমি কি আহম্মুখ লোক বল দেখি? একে খড়ের ঘর; তায় গুলের

আগুন। একবার ধ'রলে কি আর র'ক্ষে ছিল। এখনই যে সর্ব্বনাশ হয়েছিল!"

হরিদাস ভট্টাচার্য্যের সহিত চণ্ডী শর্ম্মার পারিবারিক একটু মনোমালিন্ত ছিল। সুযোগ পাইলেই তিনি চণ্ডী শর্ম্মাকে অপদস্থ করিতে ত্রুটি করিতেন না। এ সুযোগই বা তিনি ছাড়িবেন কেন? রামচন্দ্র মৈত্রের কথায় উৎসাহিত হইয়া, তিনি গলাধাক্কা দিয়া চণ্ডীশর্ম্মাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে গেলেন। বলিলেন,—"অসভ্য, বর্ব্বর! তোর সামান্ত জ্ঞানটুকুও নেই? তুই ভদ্রলোকের কাছে ব'সবার অনুপযুক্ত। তুই বেরো এখান থেকে!"

আগুন নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু চণ্ডী শর্ম্মার প্রতি উৎপীড়নের নিবৃত্তি হইল না। অবশেষে চৌধুরী মহাশয় মধ্যস্থতায় প্রবৃত্ত হইলেন। সকলের উত্তেজনা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে, তিনি কহিলেন,—"আপনারা সকল বিষয়েই উতলা হন! যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে। আর জের চলে কেন? চণ্ডী খুড়া কিছু ইচ্ছা করিয়া আগুন ফেলেন নাই।" এই বলিয়া, চৌধুরী মহাশয় সকলকেই উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন।

সকলে উপবেশন করিলে, আবার গ্রামের অবস্থার বিষয় আলোচনা চলিতে লাগিল! চৌধুরী মহাশয় অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোক তাঁহার মুখ চাহিয়া আছে। কিন্তু তিনি কি উত্তর দিবেন? চিন্তার বিষয় বটে! কিন্তু তিনি যদি চিন্তার ভাব প্রকাশ করেন, লোকে একেবারে হতাশ হইবে। সুতরাং অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এক উপায় স্থির করিলেন। অবশেষে তিনি সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"গ্রাম রক্ষার জন্ত কাল হইতেই আমি বিশেষ বন্দোবস্ত করিব।

কাহারও আশঙ্কার কারণ নাই। আবশ্যক হইলে, পশ্চিম হইতে পালোয়ান আনিতেও ক্রটি করিব না।"

এই বলিয়া তিনি গ্রামস্থ ব্যক্তিবর্গকেও উৎসাহ দিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"আপনারাও অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখুন। আবশ্যক হইলে, সকলকেই মহড়া লইতে হইবে।"

অতঃপর চৌধুরী মহাশয় হীরু সর্দ্দারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—কেমন হীরু! তুমি পঞ্চাশ জনের মহড়া নিতে পারবে তো?"

হীরু সর্দ্দার আহ্লাদে গদগদ হইয়া উত্তর দিল,—"আজ্ঞে হুকুম পেলে, কর্ত্তার চরণপ্রসাদে, পঞ্চাশ জন ব'ল্‌ছেন কি, আমি এক লাঠিতে এক-শ লোককে ঘাল ক'র্‌তে পার্‌বো!"

হীরুসর্দ্দারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, চৌধুরী মহাশয় ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন ক্ষুদিরাম সর্দ্দার! তুমি কি বল?"

ক্ষুদিরামও আহ্লাদে আটখানা হইয়া কহিল,—"আজ্ঞে, হীরুরও যে কথা, আমারও সেই কথা!"

চৌধুরী মহাশয় তাহাকেও ধন্য ধন্য করিলেন। তাহার পর চৌধুরী মহাশয় যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সে-ই উৎসাহ-ব্যঞ্জক উত্তর দিতে লাগিল; ফলে, চৌধুরী মহাশয় প্রমাণ করিয়া দিলেন,—এক সঙ্গে যদি দুই সহস্র দস্যু আসিয়াও গ্রাম আক্রমণ করে, গ্রামরক্ষার বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। সামান্য এক এক গাছি বাঁশের লাঠি পাইলেই গ্রামের হীরু সর্দ্দার, ক্ষুদিরাম সর্দ্দার, কালু সর্দ্দার, ফকির সর্দ্দার প্রভৃতিই গ্রাম রক্ষা করিবে।

ভাবনা-স্রোত ফিরিয়া গেল। হতাশের স্থান সাহস ও উৎসাহ আসিয়া গ্রহণ করিল।

ইতিমধ্যে ভবানীমন্দিরে আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। এদিকে নাটোর হইতেও লোক আসিয়া সংবাদ দিল,—"রাজা

রামকান্ত রায় নাটোর-রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পঞ্চম দিবসে তাঁহার অভিষেক-উৎসবের দিন ধার্য্য হইয়াছে!" রামকান্তের নাটোর-রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে নবাব আলিবর্দ্দীর আদেশ-বার্ত্তা,—চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার কন্যা ও জামাতা নাটোরে আসিয়া পৌছিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার আনন্দের আর অবধি রহিল না।

সকলেই সে আনন্দে আনন্দিত হইলেন। মা ভবানী মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন বলিয়া, সকলেই ভবানীমন্দিরের আরতি দেখিতে গমন করিলেন। পরদিন ষোড়শোপচারে মায়ের পূজার বন্দোবস্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অভিষেক।

আজ রাজা রামকান্ত রায়ের অভিষেক-উৎসব। নগর যেন আজ নূতন জীবন লাভ করিয়াছে।

নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত ভূস্বামী—নদীয়ার রাজা, তাহেরপুরের রাজা, দিনাজপুরের রাজা, পুটিয়ার রাজা সকলে—নাটোরে সমাগত হইয়াছেন। বরেন্দ্রসমাজের ভিন্ন ভিন্ন পটীর কুলীন কাপ ও প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয়গণ অভিষেক উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। আত্মীয়-কুটুম্বের তো কথাই নাই; যিনি যেখানে ছিলেন, রাজা রামকান্ত

রায় সকলকেই অভ্যর্থনা করিয়া নাটোরে আনিয়াছেন। প্রজাবর্গের মধ্যেও, অনেকেই উৎসব দেখিতে আসিয়াছে। অনেকেই নজর দিতে উপস্থিত হইয়াছে। বহুতর কাঙ্গালী দূরদূরান্তর হইতে বিদায়ের আশায় নাটোর-রাজধানীতে আগমন করিয়াছে।

উৎসবের সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই প্রতি সিংহদ্বারে নহবৎ বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। নৃত্য-গীত ও বাদ্যোদ্যম চলিয়াছে। তোরণ-দ্বারসমূহে পূর্ণকুম্ভ, কদলীবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত এবং আম্রশাখা বিলম্বিত হইয়াছে। নগরের চারিদিকে রাজচিহ্নসমন্বিত ধ্বজপতাকা উড্ডীন হইতেছে।

একদিকে সভানিবেশন, অন্যদিকে যজ্ঞস্থান। সভাক্ষেত্রে ধন-কুবেরগণ এবং যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়াছেন। সভাক্ষেত্রে দয়ারাম রায় ও চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর এবং যজ্ঞস্থলে শ্রীকৃষ্ণ শিরোমণি ও রঘুনাথ তর্কবাগীশ তদ্বির করিয়া বেড়াইতেছেন। কোনও দিকে কোনরূপ ত্রুটি না হয়, কোনও বিষয়ে শুভকার্য্যে অঙ্গহানি না ঘটে,—সকলেরই তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে।

যজ্ঞাহুতি প্রদানপূর্ব্বক, পণ্ডিতমণ্ডলীপরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা ও রাণী যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; স্তুতিবাদকগণ তখন বংশমহিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাদের মঙ্গলকামনায় ভগবৎসমীপে প্রার্থনা জানাইল। সেই সময় বধূরাণী ভবানীর মুখ দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র নরনারী উৎসুক হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র প্রজা ভবানীর বধূজীবনের বিবিধ কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া, "আমরা মায়ের মুখ দেখিব" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভবানী তখন রামকান্তের সদয় শাসনে এবং দয়ারাম রায় প্রভৃতির অনুনয়গুণে মাথার ঘোমটা একটু সরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তখন ভবানীর সেই চন্দ্র মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া, প্রজাদিগের মধ্যে কেহ হাসিল, কাহার

নয়নে আনন্দাশ্রু-সম্পাত হইল; কোনও দুঃখিনী রমণী ভবানীর সন্নিহিত হইয়া, তাঁহাকে এক কৌটা সিন্দূর উপহার প্রদান করিয়া আসিল;—কেহ বা তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে স্তুতিবাদকগণ গাহিতে লাগিল,—

জয় নারায়ণ, বিঘ্নবিনাশন,
সঙ্কট-মোচন হে।
জয় অভয়দ, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ,
শুভ সংঘটন হে॥
(জয়, জয়, জয়—জয়, জয়, জয়!)
জয় বিশ্বপতি, অগতির গতি,
মঙ্গল-কারণ হে।
জয় জনার্দ্দন, শত্রু-নিসূদন,
আতঙ্ক-বারণ হে॥
(জয়, জয়, জয়—জয়, জয়, জয়!)
জয় দয়াময়, করুণা-নিলয়,
বিজয়-ভূষণ হে!
জয় রাজেশ্বর, রাজনে বিতর,
সুদীর্ঘ জীবন হে॥
(জয়, জয়, জয়—জয়, জয়, জয়!)

অবশেষে রাজাকে সম্বোধন করিয়া তাহারা গাহিল,—

জয় রাজন, জনরঞ্জন,
যশোভাজন হে।
জয় রাজন, প্রজাপালন,
গুণভূষণ হে॥
(জয়, জয়, জয়—জয়, জয়, জয়!)

জয় রাজন্, অশেষগুণ,
জগত-জন হে।
'জয় রাজন্,' 'জয় রাজন্,'
করে কীর্ত্তন হে।

(জয়, জয়, জয়—জয়, জয়, জয়!)

গুরু পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ এবং প্রজাবর্গের আনন্দধ্বনির মধ্যে রাজা রামকান্ত রায়ের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, দান-ব্যাপার আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আশাতীত বিদায় পাইলেন। কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষিত হইল। স্বর্ণদান, ধেনুদান, ভূমিদান, নৌকাদান, হস্তি-দান,—দানের পরিসীমা রহিল না।

দেবীপ্রসাদের আধিপত্যকালে যাহাদের দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর অপহৃত হইয়াছিল, সংবাদ দিয়া আনিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে সেই সেই সম্পত্তি প্রত্যর্পিত হইল। যে সকল প্রজার ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগকে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য দেওয়া হইতে লাগিল। সেই যে ব্রাহ্মণ, দেবীপ্রসাদকে অভিসম্পাত করিতে করিতে রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, অপহৃত সম্পত্তি তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে গগন-মণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কাঙ্গালিগণ উৎসবের কয়েক দিন উদরপূর্ত্তি করিয়া খাইতে পাইল। অভিষেকের দিন তাহারা আশাতীত বিদায় লাভ করিল।

সারাদিনের কর্ম্ম-সমারোহে ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজা রামকান্ত রায়, রাজবাটীসংলগ্ন পরিখার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, বায়ুসেবন করিতেছেন! অদূরে জনৈক পরিচারক তাঁহার আবশ্যকানুরূপ আদেশের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল।

পরিখার পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া, রামকান্ত রায় এক একবার আকাশের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছিলেন; আর এক একবার পরিখার স্বচ্ছ জলের উপর তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে এক একবার ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছিলেন? এই সময় তাঁহার এক একবার মনে হইতেছিল,—"সংসারে কি করিলে ভগবানের তৃপ্তিসাধন হইতে পারে?" একবার ভাবিতেছিলেন,— "পরোপকার! পরোপকার করিলেই ভগবানের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করা হয়।" আবার ভাবিতেছিলেন,—"স্বধর্ম্ম-রক্ষা করিতে পারিলেই ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিতে পারে।" মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছিলেন, এবার হইতে "আমি ভগবৎকার্য্যেই প্রাণ-মন নিয়োগ করিলাম!"

রামকান্ত যখন এইরূপ ভাববিহ্বল অবস্থায় অবস্থিত, সহসা সম্মুখে এক অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

কে তিনি? সেই প্রহরি-বেষ্টিত রাজপুরীর সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া, রাজার নির্জ্জন চিন্তার সময়, কে তিনি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? ঠিক সেই সময়ে—যে সময়ে রামকান্ত রায় মনে মনে বলিতেছিলেন,—"এবার হইতে আমি ভগবৎকার্য্যে মনঃপ্রাণ অর্পণ করিলাম,"—ঠিক সেই সময়েই—আগন্তুক সম্মুখীন হইয়া গম্ভীর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবৎকার্য্য কিছু করিতে পারিবেন কি?"

রামকান্ত বিস্মিত হইয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আগন্তুক পুনরপি সমস্বরে কহিলেন—"আপনার অভিষেক-উৎসবের সংবাদ পাইয়া, আমি অনেক দূর হইতে অনেক আশা করিয়া আসিয়াছি। আপনি উত্তর দিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিবেন কি?"

রামকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুকের বদন-বিনিঃসৃত কি যেন এক দিব্য-জ্যোতিতে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া, অভিবাদন জানাইয়া, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে আপনি? কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনার কি প্রার্থনা?"

আগন্তুক পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলেন,—"আপনার এই অভিষেক-উৎসব উপলক্ষে স্বজাতি ও স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য ভগবদুদ্দেশে আপনি কিছু দান করিতে পারিবেন কি?"

রামকান্ত পূর্ব্ববৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন,—"কে আপনি? কি প্রার্থনা করিতেছেন?"

আগন্তুক।—"আপনি হিন্দু।—হিন্দুকে রক্ষা করাই আপনার ধর্ম। সেই ধর্ম্মকার্য্যেই আমি আপনার সহায়তাপ্রার্থী। অন্য প্রার্থনা আমার কিছুই নাই।"

রামকান্ত।—"আপনার কি প্রার্থনা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় স্পষ্ট করিয়া বলুন, যদি সামর্থ্যে কুলায়, আপনার প্রার্থনা-পূরণে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

আগন্তুক।—"আমি সন্ন্যাসী। আমার সংকল্প—হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠা। আপনি আমার সহায় হইতে পারিবেন কি?"

সন্ন্যাসী, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় বেশভূষা। পরিধান শ্বেত-বস্ত্র; গাত্রে শ্বেত-উত্তরীয়। এ আবার কি প্রকার সন্ন্যাসী।

রামকান্ত আগন্তুকের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিচলিত হইলেন। কিন্তু কহিলেন,—"আপনার প্রশ্ন বড়ই গুরুতর। যদি অনুমতি করেন, আমার প্রধান পরামর্শদাতাদিগের সহিত পরামর্শ করিতে পারি। আপনি যদি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, আমি এখনই তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছি।"

আগন্তুক।—"আমার আপত্তি নাই। আমার বক্তব্য বিষয় যেরূপ গুরুতর, তাহাতে তাঁহাদের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণীয়।"

আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া রাজা রামকান্ত রায় বহির্ব্বাটীতে একটী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দয়ারাম রায় উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাতে।

সন্ন্যাসীর নাম সদানন্দ স্বামী। দয়ারাম রায়ের সহিত মুর্শিদাবাদের পথে একবার তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। রাজা রামজীবন রায় তখন জীবিত ছিলেন।

বজরা হইতে গঙ্গাস্নান করিতে নামিয়া, হঠাৎ চোরা-বালিতে রাজা রামজীবনের পা বসিয়া যায়। রাজার অনুচরগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার উদ্ধার-সাধন করিতে পারিতেছিল না। সদানন্দ স্বামী তখন সাঁতার দিয়া গঙ্গা পার হইতেছিলেন। সহসা রাজার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি তাড়াতাড়ি রাজার দিকে আসিয়া চোরা বালির মধ্য হইতে রাজার উদ্ধার সাধন করেন।

উদ্ধার পাইয়া, বজরায় উঠিয়াই, রাজা রামজীবন রায় আপন অঙ্গুলি হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় খুলিয়া আপনার প্রাণরক্ষাকারীকে পুরস্কার দিলেন। সদানন্দ স্বামীর বেশভূষায় রাজা তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। তাঁহাকে সাধারণ লোক মনে করিয়াই তিনি এইরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন।

পুরস্কার গ্রহণ করিয়া, সদানন্দ স্বামী কহিলেন,—"আমি সন্ন্যাসী।" এ বহুমূল্য অঙ্গুরীয় লইয়া কি করিব? আপনিই রাখিয়া দিন। এ অঙ্গুরীয় বিনিময়ে যে অর্থ হইবে, সেই অর্থে দরিদ্র গৃহস্থদিগকে সাহায্য করিবেন। দরিদ্র-সেবার জন্য ইহা মূলধনরূপে গণ্য রাখিবেন।"

রাজা মনে করিয়াছিলেন,—তাঁহার উদ্ধার-কর্ত্তা দরিদ্র। বেশ-ভূষা দেখিয়াও তাহাই প্রতীত হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাঁহার মুখে ঐরূপ উত্তর শুনিলেন,—তাঁহার মুখপানে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। রাজার মনে হইল,—তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তার মুখ-মণ্ডলে কি যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশমান। কিন্তু আর অধিক-ক্ষণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। অঙ্গুরীয় প্রত্যর্পণ করিয়াই তিনি গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন।

দয়ারাম রায় এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং সন্ন্যা-সীর স্মৃতি তাঁহার অন্তরে অন্তরে চিরজাগরূক ছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, আর একবার মুর্শিদাবাদের রাস্তার ধারে দয়ারাম রায় ইঁহাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছিলেন। সেই সন্ন্যাসী—যিনি অম্লান-বদনে লক্ষমুদ্রা মূল্যের হীরকাঙ্গুরীয় উপেক্ষা করিয়া পরিচয় মাত্র না দিয়া, গঙ্গাগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন; তিনিই আবার সামান্য ভিখারীর ন্যায় ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন; ইহাতে দয়ারাম রায়ের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি গোপনে সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলেন; কিন্তু কিয়দ্দূর অনুসরণ করিয়াই দেখিলেন,—সন্ন্যাসী আপন ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া পথিপার্শ্বোপবিষ্ট এক অন্ধের হস্তে প্রদান করিল; বলিল,—"তোমার দুই দিন খাওয়া হয় নাই; এই আমি তোমার খাবার সংস্থান করিয়া আনি-য়াছি।" এই বলিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সেই অন্ধের হস্তে প্রদান

করিয়া, তদ্দণ্ডেই সন্ন্যাসী সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। অন্ধের শুভাশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবার অবসর হইল না।

এই দিন দয়ারাম রায় সন্ন্যাসীর পরিচয় গ্রহণ করেন। জানিতে পারেন,—তাঁহার নাম সদানন্দ স্বামী। পরোপকারই তাঁহার ব্রত। বিপন্নের বিপন্মুক্তির জন্য তিনি দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তার পর মধ্যে মধ্যে সদানন্দ স্বামীর নাম ও কীর্ত্তির পরিচয় লোকমুখে শুনিতে পাইতেন বটে; কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার আর সাক্ষাৎকার পান নাই। তবে মনে মনে তাঁহার এক চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এতদিন পরে সেই মহাপুরুষ আজ স্বয়ং নাটোর-রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন! আকৃতি পূর্ব্বের ন্যায়ই কান্তি-পুষ্টি-বিশিষ্ট। পরিচ্ছদ—পূর্ব্বেরই ন্যায় সাধারণ ভাবাপন্ন। বাক্যাবলী—পূর্ব্বের ন্যায়ই সরল ও মাধুর্য্য-পূর্ণ।

সদানন্দ স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, দয়ারাম রায় সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। সদানন্দ স্বামীও, আশীর্ব্বাদ করিয়া, হাত ধরিয়া দয়ারাম রায়কে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

কথায় কথায় দেশের অবস্থার বিষয় উত্থাপিত হইল। কথায় কথায় দয়ারাম রায় বুঝিতে পারিলেন,—দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সদানন্দ স্বামী সকলই অবগত আছেন। সুতরাং দয়ারাম রায় কহিলেন,—"আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা দুই একটী বিষয় জানিবার প্রার্থনা করি। নবাবের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধের বিষয়ে আপনি কি বুঝিতেছেন? মহারাষ্ট্রগণই কি কালে বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়া বসিবে?"

সদানন্দ স্বামী কহিতে লাগিলেন,—"অনেকটা আশা হইয়াছিল বটে; কিন্তু সম্প্রতি সে আশায় নিরাশ হইয়াছি! পূর্ব্ববর্ত্তী সকল

ঘটনাই আপনি অবগত আছেন! আপনাদের মুর্শিদাবাদে অধি-ষ্ঠিতির অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রসেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত কাটোয়া-লুণ্ঠন করিয়া কিরূপভাবে রাজধানী মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, সকলই আপনারা শুনিয়া থাকিবেন! গত বৎসর নবাব মহারাষ্ট্র-দিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রগণ তাহাতেও উৎসাহহীন হয় নাই। সম্প্রতি আবার ভাস্কর পণ্ডিত বঙ্গদেশে লুণ্ঠনের জন্য আগমন করিয়াছিলেন! এবার তিনি যেরূপ বিপুলায়ো-জনে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হন, তাহাতে মনে হইয়াছিল,—নবাবের আশা ভরসা বুঝি বা লোপ পাইল। কিন্তু কি প্রতারণা!"

দয়ারাম রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রতারণার কথা কি বলি-তেছেন?"

সদানন্দ স্বামী।—"আপনারা শুনেন নাই কি? নবাব আলি-বর্দ্দী কি বিশ্বাসঘাতক! নবাব আলিবর্দ্দী কি ঘোর প্রবঞ্চক!"

দয়ারাম রায়।—"কেন আলিবর্দ্দী কি করিয়াছেন?"

সদানন্দ স্বামী।—"আলিবর্দ্দী যখন দেখিলেন—মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজিত করিবার কোনই আশা নাই, তখন প্রতারণাকেই মাত্র সম্বল, আলিবর্দ্দী সেই প্রতারণাজাল বিস্তার করিলেন। মন্ত্রী জানকীরাম ও মুস্তফা খাঁ সেই প্রতারণাকার্য্যে আলিবর্দ্দীর সহায় হইল। তাঁহাদের সাহায্যে নবাব আলিবর্দ্দী ভাস্কর পণ্ডিতের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। স্থির হইল—মুর্শিদাবাদের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে মনকোরার শিবিরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে এবং সেই সময় সন্ধি-বন্দোবস্ত স্থির হইয়া যাইবে। ভাস্কর পণ্ডিত, আলিবর্দ্দীর ছলনা বুঝিতে পারিলেন না। দূত-মুখে সন্ধির প্রস্তাব অবগত হইয়া তিনি সরল বিশ্বাসে উভয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে—মনকোরার শিবিরে—আগমন করিলেন।"

বলিতে বলিতে সদানন্দ স্বামী বিচলিত হইয়া উঠিলেন। দয়ারাম রায় আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর কি হইল?"

সদানন্দ স্বামী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন;—"বিশ্বাস-ঘাতক মুসলমানের হস্তে ব্রাহ্মণের সংহারসাধন! আলিবর্দ্দী কৌশলে তাঁহাকে শিবিরে আহ্বান করিয়া, কৌশলে কথাবার্ত্তায় আপ্যায়িত করিয়া, কৌশলে সেনাপতিকে ইঙ্গিত করিলেন। ছদ্মবেশে নবাব সৈন্ত পটাবাসের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল। নবাবের ইঙ্গিত-মাত্রেই তাহারা ভাস্কর পণ্ডিতকে আক্রমণ করিল। সামান্ত কয়েকজন শরীর-রক্ষক মাত্র সঙ্গে লইয়া ভাস্কর পণ্ডিত শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। তিনি ভ্রমেও কখনও মনে করেন নাই—নবাব তাঁহার সহিত ঐরূপ প্রতারণা করিবেন।"

দয়ারাম রায়।—"ভাস্কর পণ্ডিতের সৈন্তদল কোথায় ছিল?"

সদানন্দ স্বামী।—"তাহারা দূরে অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু যখন শুনিল—তাহাদের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত আলিবর্দ্দীর প্রতা-রণায় ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন, তখন তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। মুসলমান সৈন্তগণ কাটোয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা কোনই বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই।"

দয়ারাম রায়।—"তবে বোধ হয় আর মহারাষ্ট্রদিগের আক্রমণের কোনই আশঙ্কা নাই।"

সদানন্দ স্বামী।—"আশঙ্কা নাই? আপনি নিশ্চয় জানিবেন,—এ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণে মহারাষ্ট্র জাতি কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না। সে আক্রমণে, নবাবের বিশেষ কিছু ক্ষতি হউক বা না হউক; বাঙ্গালার জন-সাধারণ যে পূর্ব্বাপেক্ষা নির্য্যাতনগ্রস্ত হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।"

দয়ারাম রায়।—"আপনি এখন তবে কি প্রস্তাব করেন?"

সদানন্দ স্বামী।—"আমার প্রস্তাব—হিন্দুরাজ্যপ্রতিষ্ঠা!"

দয়ারাম রায়।—"কিরূপে তাহা সম্ভবপর?"

সদানন্দ স্বামী।—"এখন দেশের যেরূপ অবস্থা, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, আজি হউক, কালি হউক, আর দুই দিন পরেই হউক, মুসলমানরাজ্যের ধ্বংস-সাধন অবশ্যম্ভাবী।"

দয়ারাম রায়।—"কিসে আপনি ইহা বুঝিতেছেন?"

সদানন্দ স্বামী।—"বাঙ্গালার—কেবল বাঙ্গালার বলিয়া নহে—ভারতবর্ষের চারিদিকে এখন গভীর ষড়যন্ত্রের আয়োজন চলিয়াছে। পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে চাহিয়া দেখুন,—ওলন্দাজগণ কি অরাজকতারই সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে! পশ্চিম-দক্ষিণে উড়িষ্যার দিকে, পাঠানগণ মস্তক উত্তোলন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এদিকে, মধ্যস্থলে দক্ষিণ বঙ্গে, ইংরেজ-ফরাসী বঙ্গদেশ গ্রাসের জন্য কিরূপভাবে বদন-ব্যাদান করিয়া আছে,—কে না তাহা বুঝিতে পারে? তার পর উত্তর-পশ্চিম হইতে মহারাষ্ট্রগণ আসিয়া পঙ্গপালের ন্যায় পতিত হইয়া বঙ্গদেশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।"

দয়ারাম রায়।—"সকলই আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাহাতে আমাদের সুবিধা কি আছে?"

সদানন্দ স্বামী।—"এই বিশৃঙ্খলার সময় আমরা যদি সামান্য কিছু বলসঞ্চয় করিতে পারি, অনায়াসে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।"

দয়ারাম রায়।—"আপনার কল্পনা সমীচীন বটে! কিন্তু আমাদের হিন্দুজাতির মধ্যে একতার সম্ভাবনা কোথায়? আমরা পরস্পর গৃহ-বিবাদে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি, ভাই হইয়া ভাইয়ের গলায় ছুরি মারিতে সঙ্কুচিত হইতেছি না। আমাদের দ্বারা আবার রাজ্য-প্রতিষ্ঠা!"

দয়ারাম রায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার কহিলেন,—"একদিন সে আশা ছিল বটে। কিন্তু আমরাই—আমরাই বা বলি কেন—আমি নিজেই সে আশামূল ছিন্ন করিয়াছি।" যেন কোন পুরাণ স্মৃতি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল—এমনই ভাবে দয়ারাম রায় আক্ষেপ করিলেন।

সদানন্দ স্বামী—"গতানুশোচনায় কোনই ফল নাই। যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও সাবধান হইলে হানি কি?"

দয়ারাম রায়।—"আপনি কতদূর কি করিয়াছেন?"

সদানন্দ স্বামী। "আমি সন্ন্যাসী! আমার কি সাধ্য? আমি কি করিতে পারি? আমি আপনাদের পাঁচজনকে আমার সংকল্পের বিষয় জানাইতেছি মাত্র। যদি কখনও সংকল্প সিদ্ধ করিবার অবসর আসে এবং সেই সংকল্প-সিদ্ধির পক্ষে আপনাদের সহায়তা আবশ্যক হয়, আপনারা কোনরূপ সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন কি?"

দয়ারাম রায়।—"সে কথা এখন কেমন করিয়া বলিতে পারি? রাষ্ট্রবিপ্লবে সংশ্রব রাখা ধর্ম্মানুমোদিত কিনা—সে বিষয়েই আমার সংশয় আছে। আপনিই কি নিশ্চয় করিয়া উহাকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিতে পারেন?"

সদানন্দ স্বামী।—"আমি প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি মাত্র; তর্ক করিতে আসি নাই। যে প্রার্থী, তাহার তর্ক যুক্তিযুক্ত হইলেও, দাতা কখনও সে কথায় কর্ণপাত করেন বলিয়া মনে হয় না।"

রাজা রামকান্ত রায় একাগ্রচিত্তে উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন। সদানন্দ স্বামীর বিরক্তির ভাব দেখিয়া, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন,—"আপনার যাহা প্রার্থনা, আপনি একটু স্পষ্ট করিয়া ইঁহাকে বলুন না কেন?"

সদানন্দ স্বামী কহিলেন,—"আমার সংকল্প—হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা।

যদি কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা দেখেন, আপনারা বাধা না দিয়া সহায়তা করিবেন কি ?”

দয়ারাম রায় বুঝিলেন,—সন্ন্যাসীর কল্পনা আকাশ-কুসুম। তিনি মনে মনে বুঝিয়াছিলেন,—পাশ্চাত্য জাতির শক্তি দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে একদিন-না একদিন তাঁহারাই দেশের রাজা হইতে পারেন। কিন্তু সে কথাও প্রকাশ করিয়া বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন; পরন্তু সদানন্দ স্বামীকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—“ভাল—সেদিন আসুক; আপনার প্রার্থনা অবশ্যই স্মরণ করিব। আপনার অনিষ্ট-সাধনে নাটোর কখনই অগ্রসর হইবে না। অর্থ-সাহায্য যদি কখনও আবশ্যক হয়, আপনি জানাইলেই সাধ্যমত সরবরাহ করা হইবে।”

সদানন্দ স্বামী কহিলেন,—“আপনাদের মঙ্গল হউক। আমি তবে এখন আসি।”

এই বলিয়া সদানন্দ স্বামী প্রস্থানোদ্যোগ করিলেন। রাজা রামকান্ত এবং দয়ারাম রায় উভয়েই তাঁহাকে সে রাত্রি সেখানে অবস্থিতির জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সদানন্দ স্বামী কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বলিলেন,—“আমি সন্ন্যাসী! রাজবাটী আমার অবস্থানের উপযোগী স্থান নহে; বিশেষতঃ অদ্য রাত্রেই অন্যত্র আমার এক গুরুতর কাজ আছে। আমি কোনক্রমে অপেক্ষা করিতে পারি না।”

সদানন্দ স্বামী চলিয়া গেলেন। রাজা রামকান্ত ও দয়ারাম রায় দুই জনের মনে দুই প্রকার ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। দয়ারাম রায় ভাবিতে লাগিলেন,—“সন্ন্যাসীর কল্পনা আকাশকুসুম।” রাজা রামকান্ত রায় ভাবিতে লাগিলেন,—“অসাধ্য কিছুই নাই।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আত্মগ্লানি।

এত করিয়াও বেণীভূষণের পীড়ার শান্তি হইল না। রাজবৈদ্য নিদান-শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া, সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু কোনই ফল ফলিল না। ভবানী প্রতিদিনই লোক পাঠাইয়া সন্ধান লইতেন; প্রতিদিনই রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু বেণীভূষণের রোগমুক্তির সম্ভাবনা কিছুই উপলব্ধি হইল না।

আজ বেণীভূষণের পীড়ার বড় বাড়াবাড়ি। তাঁহার জ্ঞান-বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; কিন্তু নাড়ীর গতি বড়ই খারাপ! কবিরাজ মহাশয় বড়ই ভয় পাইয়াছেন। রাত্রি কাটিবে কিনা,—সেই বিষয়ে তাঁহার সংশয় হইয়াছে।

অভিষেক-উৎসবে কয় দিন রামকান্ত রায় ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং একদিন নিমেষ মাত্র আসিয়া বেণীভূষণকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। সে দিন বেণীভূষণ নিদ্রিত ছিলেন; বেশীক্ষণ বসিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কথাবার্ত্তা কহিবার অবসর হয় নাই। তারপর কয়েক দিন ইচ্ছা-সত্ত্বেও বেণীভূষণকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ যখন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট শুনিলেন,—"অবস্থা শোচনীয়"; কোন ক্রমেই অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সংবাদ পাইয়াই বেণীভূষণকে দেখিবার জন্য তিনি বেণীভূষণের বাড়ীতে আগমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজ মহাশয়ও পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামকান্তকে আসিতে দেখিয়া বেণীভূষণ উঠিয়া বসিবার চেষ্টা পাইলেন। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখা যেমন জ্বলিয়া উঠিল। রামকান্ত

রায় তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন,—"আপনি ব্যস্ত হইবেন না। যেমন আছেন, সেইভাবেই শুইয়া থাকুন। এ অবস্থায় হঠাৎ কোনও উত্তেজনা হওয়া ভাল নহে।"

বেণীভূষণের দেহে যেন নবজীবন সঞ্চার হইল। বেণীভূষণ, রামকান্তকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন,—"বাবা! তুমি চিরজীবী হও। তোমাকে দেখেই, আমার পনর আনা কষ্টের লাঘব হ'ল।"

রামকান্ত রায় কহিলেন,—"কয় দিন আস্‌বো আস্‌বো ক'রে কাজের ঝঞ্চাটে আসতে পারি-নি। আজ একটু অবসর পেয়েছি তাই আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি। আজ আপনি কেমন আছেন—মামা!"

বেণীভূষণ শিরে করাঘাত করিয়া কহিলেন,—"আর বাবা! এখন যেতে পারলেই বাঁচি?"

রামকান্ত।—"কেন, এমন অশুভ কথা মুখে আনছেন কেন?"

বেণীভূষণ।—"আর বাবা! এতক্ষণ যে কষ্ট হচ্ছিল, তা আর তোমায় কি ব'লবো?"

রামকান্ত।—"এখন কেমন বোধ হ'চ্ছে?"

বেণীভূষণ।—"বলেছি তো বাবা—তোমাকে দেখে অবধি পনর আনা কষ্টের লাঘব হ'য়েছে। এখন মনে হ'চ্ছে—বোধ হয় আমি শান্তিতে ম'রতে পারবো।"

এই বলিয়া, বেণীভূষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে হইল;—"রামকান্ত যখন আসিয়াছে, সে নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করিবে। সে যদি আমায় ক্ষমা করে, নিশ্চয় আমি শান্তিতে ম'রতে পারবো। ভাবিতে ভাবিতে বেণীভূষণের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। বেণীভূষণ উদ্বেগ-আবেগে বলিয়া উঠিলেন,—"রামকান্ত! বাবা! আমায় ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে কি?

"সে কি বলেন?—সে কি বলেন?"—এই বলিয়া রামকান্ত চমকিয়া উঠিলেন।

বেণীভূষণ উত্তর করিলেন,—"আমি সত্যই বলিতেছি। তোমার উপস্থিতিতে আমার কষ্টের যখন এতদূর লাঘব হইয়াছে, তুমি ক্ষমা করিলে, বোধ হয় আমার আর কোনও কষ্টই থাকিবে না।"

এই বলিয়া, বেণীভূষণ একে একে পুরাতন কাহিনী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। রামকান্ত যতই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাই-লেন; যতই তাঁহাকে স্থির হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, ততই তাঁহার আত্মগ্লানি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। খর জলস্রোত ক্ষীণ বাধা পাইলে, শেষে যেমন বর্দ্ধিতবেগে প্রবহমাণ হয়, রামকান্তের প্রতিরোধ-বাক্যে বেণীভূষণের আত্মগ্লানি-প্রবাহ সেইরূপ প্রবলবেগে নির্গত হইতে লাগিল।

বেণীভূষণ কহিতে লাগিলেন,—"আমি কেবল পরের সর্ব্বনাশ করি নাই; পরের সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া, আমি নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছি। জানি না—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিধাতা কোনও নূতন নরক সৃষ্টি করিতেছেন কি না! বাবা! তোমার যত কিছু কষ্ট, তার সকলেরই মূলাধার—এই হতভাগ্য! দয়ারাম রায়ের সহিত তোমার বিচ্ছেদের মূল—সেও আমি। তোমার রাজ্যচ্যুতির মূল—সেও আমি! আমার পাপকাহিনী বলিয়া শেষ করা যায় না।"

রামকান্ত রায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"আপনি বৃথা কেন গতানু-শোচনায় কষ্ট পাইতেছেন? যাহা অদৃষ্টে ছিল,—তাহাই ঘটিয়াছে। আপনার তাহাতে কি দোষ? আপনি উতলা হইবেন না!"

কবিরাজ মহাশয়ও কহিলেন—"আপনি উতলা হইবেন না। ক্ষীণ নাড়ী, উত্তেজনায় এ সময় হঠাৎ কোনও উপসর্গ আসিয়া জুটিতে পারে।"

বেণীভূষণ উত্তর দিলেন,—"কবিরাজ মহাশয়! কেন আর আমায় বৃথা প্রবোধ দেন? আমার নিজের অবস্থা আমি কি বুঝিতে পারিতেছি না? আপনি যে আশঙ্কা করিতেছেন, আমার পক্ষে এখন তাহা শ্রেয়ঃ। অনুতাপের যে তুষানল অহরহ হৃদয়মধ্যে প্রজ্বলিত রহিয়াছে; তাহার তুলনায় মৃত্যু কি বেশী ভয়ঙ্কর?"

এই বলিয়া, বেণীভূষণ আবার রামকান্তের প্রতি চাহিলেন; আবার কহিলেন,—বাবা! এ পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করতে পারবে না কি? মা ভবানী—সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী। আমি অকারণ তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছি। আমার পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে?"

রামকান্ত একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পুনরপি তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিলেন। কিন্তু বেণীভূষণ তথাপি নিবৃত্ত হইলেন না।

বেণীভূষণ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত! তথাপি আমার পাপের শান্তি নাই। বোধ হয়, জন্ম-জন্মান্তরেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আমার যেমন কর্ম্ম, আমি তাহার উপযুক্ত ফলই পাইয়াছি। সে জন্য আমার কোনই ক্ষোভ নাই। এক একটা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়া যাই; তোমরা একটু ধৈর্য্য ধারণ কর! না বলিতে পারিলে, আমার বুক যেন বিদীর্ণ হইতেছে! প্রথম,—কৃতান্তকুমারের কথা বলিতেছি। আমার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র কৃতান্তকুমার—অন্ধের নয়নমণি কৃতান্তকুমার! কিন্তু সেই মণি কি করিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছি—তোমরা জান কি? দেবীপ্রসাদের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দিয়ে কে তার উচ্ছৃঙ্খলতার পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিল?—সে এই আমি। তাহার গর্ভধারিণীর সহস্র আপত্তি—সহস্র বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া, আমিই কৃতান্তকুমারের যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছিলাম। দেখ দেখি—কেমন হাতে হাতে তার ফলভোগ করিলাম? বিষবৃক্ষ

স্বহস্তে রোপণ ক'রেছিলাম; বিষ-বৃক্ষে স্বহস্তে জলসেচন ক'রে এসেছি; বিষবৃক্ষের দারুণ বিষে নিজেই এখন জর্জ্জরীভূত হই-তেছি। প্রায়শ্চিত্ত—এর চেয়ে আর কি হ'তে পারে?"

বেণীভূষণের চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল।

রামকান্ত রায় সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সে প্রবোধ—মানিবে কেন? বর্ষার জলস্রোত যখন প্রবল-বেগে প্রবহমান হয়, জলমধ্যে নিপতিত শুষ্কপত্রাদি আপনিই সে বেগে ভাসিয়া যায়। রামকান্তের সকল সান্ত্বনা-বাক্যই সেইরূপ বেণীভূষণের অনুশোচনা-স্রোতে ভাসিয়া গেল।

বেণীভূষণ আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমি সকলকে পথে বসাইয়াছি। আমার মৃত্যুর পর, আমার বালিকা পুত্রবধূর কি দশা হইবে, ভাবিতেও প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। আমার স্ত্রী—আজীবন আমার পাপানুষ্ঠানে বাধা দিয়া আসিতেছে; কিন্তু আমি একদিনও তাহার কথায় কর্ণপাত করি নাই। চিরদিনই সে মনো-বেদনা সহ্য করিয়া আসিয়াছে; আজ মৃত্যুর দিনে তাহাকে পথে বসাইয়া চলিলাম। আমার মৃত্যুর পর, কি লইয়া তাহারা হবিষ্য করিবে, সত্য বলিতে কি, সে সংস্থানও আমি রাখিয়া যাইতেছি না। কত বলিব? অতীতের ও বর্ত্তমানের যত কথাই মনে পড়িতেছে, ভবিষ্যতের ভাবনায়, ততই আমার কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। রামকান্ত! তুমি যদি আমায় ক্ষমা করিতে পার, তবু আমার কতক কষ্টের লাঘব হয়।"

রামকান্ত।—"আপনি পূজনীয়—গুরুস্থানীয়। আপনি কেন আমায় পুনঃপুন ও-কথা বলিয়া পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিতেছেন? আমি কখনও ভাবি নাই, আজিও ভাবি না—আপনার জন্ম আমরা অযথা কষ্ট পাইয়াছি। আমরা তখনও বিশ্বাস করিতাম, এবং

এখনও বিশ্বাস করি,—অদৃষ্টবশে কর্ম্মফলে আমরা কষ্টভোগ করিয়াছি। আপনার তাহাতে কোনও দোষ নাই। আপনি সেজন্য একটুও সঙ্কুচিত হইবেন না।”

বেণীভূষণ আনন্দ জানাইয়া রামকান্তের কথার কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। সহসা তাঁহার মূর্চ্ছার ভাব হইল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় পলকশূন্য হইল; শরীর স্পন্দহীন হইয়া আসিল; শ্বাস লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

কবিরাজ মহাশয় বুঝিলেন,—আর অধিক বিলম্ব নাই; সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া তুলসীতলায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া রামকান্তকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার অল্পক্ষণ পরেই বেণীভূষণের বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূরা কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। প্রতিবাসীরা কেহ সান্ত্বনা করিতে লাগিল, কেহ আনন্দ অনুভব করিল, কেহ বা স্পষ্ট করিয়া বলিল,—“বাঁচা গেল—পাপ দূর হ'ল।”

যথারীতি বেণীভূষণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, রাজা রামকান্ত রায় ভবানীর পরামর্শ অনুসারে তাঁহার বিধবা পত্নী ও পুত্রবধূর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বেণীভূষণের শ্রাদ্ধেও যথাসম্ভব ব্যয়-বাহুল্যের ত্রুটি হইল না। বেণীভূষণের বিধবা স্ত্রী ও বালিকা পুত্রবধূ কোনরূপ কষ্ট না পান,—ভবানী সর্ব্বদা তাহার তত্ত্ব লইতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুক্তার মালা।

সে বৎসর রাজ্যে যেন সুখশান্তি উছলিয়া উঠিল। মাঠ শস্যপূর্ণ হইল। কৃষকগণের আনন্দের অবধি রহিল না। বৃক্ষ-লতা ফলফুলে সুশোভিত হইল। প্রকৃতি হাস্যময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন।

প্রজার সুখেই রাজার সুখ। প্রজার স্বচ্ছলতাই রাজকোষের স্বচ্ছলতা। কৃষাণগণ সে বৎসর এতই শস্য পাইল যে, তাহারা দুই হাত তুলিয়া রাজা ও রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে খাজনার টাকা বাকীজায় সমস্ত চুকাইয়া দিল।

যথাসময়ে রাজা রামকান্ত রায় নবাবের রাজস্ব প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে রাজকীয় অন্যান্য ব্যয়ের সঙ্কুলান হইল। যথাসময়ে দেব-সেবা, অতিথি-সেবা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত হইয়া গেল। যথা-সময়ে সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইল। অল্পদিনের মধ্যেই রাজকোষে প্রচুর অর্থ জমিয়া গেল।

ভবানী যেদিন রাজারক্ষার জন্য গা হইতে আপন গহনাগুলি খুলিয়া দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে রামকান্তের মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল,—ভবানীকে তিনি অমূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিতা করিবেন। আজ সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

গোপনে গোপনে রামকান্ত রায় ভবানীর জন্য এক ছড়া মুক্তার মালা ক্রয় করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর্য্যন্ত সে অলঙ্কারের বিষয় ভবানীকেও জ্ঞাপন করেন নাই। রামকান্ত রায় জানিতেন,—ভবানী যে কোন সামগ্রীই ব্যবহার করুন, অগ্রে তদনুরূপ দ্রব্য দেব-

দ্বিজে অর্পণ না করিয়া কখনই পরিতুষ্ট হইতেন না। কোনও নূতন ফল ভবানীকে প্রদান করিলে, ভবানী আগে তাহা দেবতা-ব্রাহ্মণে অর্পণ করিতেন; তারপর সকলের কুলাইয়া উদ্বৃত্ত থাকিলে আপনি তাহা গ্রহণ করিতেন। কেবল ফল, ফুল খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে নহে;—ভবানী যখনই কোনও নূতন বস্ত্র ব্যবহার করিতেন, অগ্রে দেব-দ্বিজে তদনুরূপ বস্ত্র উৎসর্গীকৃত হইত। দেবতা-ব্রাহ্মণে তদনুরূপ বস্ত্র বিতরিত না হইলে তিনি কখনই বস্ত্র পরিধান করিতেন না। যখন যেমন অবস্থা, তখন সেই ভাবেই অবশ্য কাজ হইত। কখনও কোনও অলঙ্কারের কথা উঠিলে, তিনি সে কথার উত্তর দিতেন,—"অলঙ্কার পরিবার সামর্থ হইলেই অলঙ্কার পরিধান করিব।" সে উপলক্ষে সময়ে সময়ে তিনি আরও বলিতেন,—"আমি যে অলঙ্কার পরিধান করিব, আমার গৃহদেবতা মা জয়কালীর জন্য আগে সেইরূপ গহনা গড়াইতে হইবে। মা আমার নিরলঙ্কারা থাকিতে, আমি কখনই নূতন গহনা পরিতে পারিব না। ব্রাহ্মণ-দিগকেও সেই গহনা বা তাহার মূল্য বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। তার পর আমার গহনা পরা।"

রামকান্ত রায় ভবানীর নিকট যখনই গহনার কথা উত্থাপন করিতেন, সকল সময়েই প্রায় একই উত্তর পাইতেন। তাই তিনি মুক্তার হার ক্রয় করিয়াও ভবানীকে প্রদান করিতে সাহস করেন নাই। জয়কালীর জন্য তিনি আর একছড়া মুক্তার হার সংগ্রহ করিতেছিলেন; এবং ব্রাহ্মণাদির দানের জন্য মূল্যের অনুরূপ টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছিলেন।

আজ সেই নূতন হার সংগ্রহ হইয়াছে। অর্থের স্বচ্ছলতাও যথেষ্ট আছে। সুতরাং দুইছড়া মুক্তার হার হস্তে লইয়া, রাজা রামকান্ত রায় আজ হাসি-হাসি মুখে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

শয়নকক্ষে গিয়া ভবানীকে ডাকাইয়া আনিয়া, রামকান্ত রায় কহিলেন,—"এই দেখ—কেমন মুক্তার হার আনিয়াছি।"

মুক্তার হার হস্তে লইয়া, ভবানী কহিলেন,—"দুই ছড়াই কি আমার জন্য ?"

রামকান্ত।—"না ভবানী! একছড়া তোমার জন্য, আর এক ছড়া মা কালীর জন্য! কেমন—হার পছন্দ কি না? এক এক ছড়া হারের দাম কত, জান ?"

মুক্তার হার হস্তে লইয়াই ভবানী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দুই ছড়া হারই মূল্যবান্। পরন্তু একছড়া হার অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ ছড়ার কত দর ?"

রামকান্ত।—"কেন—তোমার কি ইতর বিশেষ মনে হইতেছে ?"

এই বলিয়া রামকান্ত রায় একে একে হার দুইছড়ায় হাত দিয়া দেখাইয়া কহিলেন,—"এই ছড়া তোমার জন্য আনিয়াছি। ইহার দাম—চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। আর এই যে ছড়া—মা জয়কালীর জন্য আনিয়াছি; ইহার দাম—দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। কিন্তু দেখ—দেখিতে দুই ছড়াই এক প্রকার। উভয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ প্রায়ই লক্ষ্য হয় না।"

স্বামীর কথা শুনিয়া, ভবানী মনে মনে একটু হাসিলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আপনি যে আমায় যথেষ্ট ভালবাসেন, আজ তার পরিচয় পাইলাম। নিজের জন্য অল্পমূল্যের মুক্তার হার আনিয়া, আমার জন্য অধিক মূল্যের মুক্তার হার আনিয়াছেন,—ইহা ভালবাসারই পরিচায়ক। ভাল—আপনার সাধ আপনি মিটাইলেন; আমারও সাধ আমি আজ মিটাইব।"

ভবানীর কথা রামকান্ত কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভবানী! কি বলিতেছ? তোমার সাধ আজ তুমি মিটাইবে—এ কি বলিতেছ?"

ভবানী।—"কেন—আমার কি কোন সাধ থাকিতে পারে না?"

রামকান্ত।—"সাধ থাকিতে পারে না—এমন কথা তো আমি বলিতেছি না? তোমার সাধ মিটাইব বলিয়াই তো এই হার আনিয়াছি।"

ভবানী।—"সত্য বলিতেছেন? আমার সাধ মিটাইবেন বলিয়াই এই হার আনিয়াছেন?"

রামকান্ত।—"সত্য নয় কি মিথ্যা বলিতেছি?"

স্বামীর মুখে তাঁহার সাধ মিটাইবার কথা শুনিয়া, ভবানীর বড়ই আহ্লাদ হইল। ভবানী আহ্লাদ-সহকারে কহিলেন,—"বড় ভালই হইল! শুনিয়াছি—কাল শুভদিন আছে। কাল আমরা, স্বামী-স্ত্রী দুই জনে গিয়া, মা জয়কালীর গলায় এই দুই ছড়া হার পরাইয়া দিয়া আসিব।"

রামকান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কহিলেন,—"ভবানী! আমি এখনও তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

ভবানী উত্তর দিলেন,—"আপনার সাধ হইয়াছে—মা জয়কালীর গলায় মুক্তার মালা পরাইবেন, আমারও কি সে সাধ হইতে নাই? আপনার হার আপনি পরাইবেন; আমার হার-ছড়া আমি পরাইয়া দিব। এ মুক্তার মালা মায়ের গলায় পরাইলে, মায়ের কত শোভাই প্রকাশ পাইবে।"

রামকান্ত রায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"ভবানী! এ হার যে তোমার জন্য আনিয়াছি! যদি তুমি বল, মা জয়কালীর জন্য না হয় আর এক ছড়া মালা কিনিয়া আনিয়া দিব। এ মুক্তার মালা যে তোমার।"

ভবানী।—"আমার বলিয়াই তো আমি মায়ের গলায় পরাইব সাধ করিয়াছি। আমার এ সাধে আপনি বাদ সাধিবেন না। যার কৃপায় আমাদের সব। যার পূজা না দিয়া—যার গলায় মুক্তার মালা না দোলাইয়া—আমি কি মালা পরিতে পারি?"

রামকান্ত।—"সেই জন্যই তো দুই ছড়া আনিয়াছি।"

ভবানী।—"দুই ছড়া আনিয়াছেন বলিয়াই তো আমারও সাধ মিটাইবার সুবিধা হইয়াছে। এক ছড়া আপনি মায়ের গলায় পরাইয়া দিবেন; আর এক ছড়া আমি মায়ের গলায় পরাইয়া দিব। দেখিয়া চক্ষু জুড়াইবে।"

রামকান্ত বুঝিলেন,—ভবানীর একান্ত ইচ্ছা, দুই ছড়া মুক্তার মালাই জয়কালীর গলায় পরাইয়া দেওয়া হয়। ভবানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর অধিক কথা কহিলে, ভবানী পাছে ক্ষুণ্ণ হন,—এই ভাবিয়া, রামকান্ত রায় ভবানীর মতেই মত দিলেন। রামকান্ত রায় কহিলেন,—"ভবানী! তোমার যখন এতই সাধ হইয়াছে, ভাল—তোমার সাধই পূরণ হউক। আমার সাধ আপাততঃ অপূর্ণ রহিল; আমি চেষ্টা করিয়া শীঘ্রই আবার তোমার জন্য নূতন মুক্তার মালা সংগ্রহ করিয়া আনিব।"

ভবানী কহিলেন,—"ইহাতেও কি আপনার সাধ মিটিল না? আপনি স্বহস্তে আনিয়া আমায় মুক্তার মালা প্রদান করিলেন,—ইহাতেও কি আপনার সাধ মিটিল না? আমায় আনন্দিত দেখিবার জন্যই তো আপনার মুক্তার মালা দেওয়া? কিন্তু এই মুক্তার মালা হাতে পাইয়া, বিশেষতঃ এই মালার সদ্ব্যবহার করিবার অনুমতি পাইয়া, আমার যে আনন্দ হইল, সে আনন্দের তুলনা আছে কি? কাল যখন এই মালা মায়ের গলায় পরাইয়া দিব, আমার জীবন সার্থক হইবে,—নয়ন-মন তৃপ্তিলাভ করিবে।"

রামকান্ত রায় উত্তর দিলেন,—"ভাল—তাহাই হউক। তোমার যাহাতে আনন্দ, আমি তাহাতে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। কাল ষোড়শোপচারে মায়ের পূজার আয়োজন করিবে। আর সেই পূজা উপলক্ষে আমরা মায়ের গলায় দুই জনে দুই ছড়া মালা পরাইয়া দিয়া আসিব।"

পরদিন সেই পরামর্শমতই কার্য্য হইল। মহা ধূমে জয়কালীর পূজা সমাধা হইলে স্বামি-স্ত্রী দুই জনে দুই ছড়া মুক্তার মালা মায়ের গলায় পরাইয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যর্পণ।

মার গলায় মুক্তার মালা পরাইয়া দিয়া রাজা ও রাণী প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছেন; এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল,—"রায় মহাশয় অপেক্ষা করিতেছেন!"

আসিবার কোনই কথা ছিল না; দিবা দ্বিপ্রহরে হঠাৎ তিনি কেন আসিলেন?

ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাইবামাত্র, রাজা রামকান্ত রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। প্রাসাদের বহিঃপ্রকোষ্ঠে রাজা রামকান্ত রায়ের খাস কামরায় দয়ারাম রায় আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভৃত্যবর্গ তাঁহার ধূমপানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল।

দয়ারাম রায় প্রকোষ্ঠে আসিয়া বসিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার বরকন্দাজ হনুমান্ সিং চোবে তাঁহার পাল্কীর ভিতর হইতে একটী বাক্স আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়াছিল। তামাক

খাইতে খাইতে সেই বাক্সটীর প্রতি এক একবার তিনি দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন; আর অতীত অনাগত কত কথাই তাঁহার মনে পড়িতেছিল। তিনি একবার ভাবিতেছিলেন,—"আমি কি নিষ্ঠুর! আমি কি পাষণ্ড!" আবার ভাবিতেছিলেন,—"আমার উদ্দেশ্য কখনই মন্দ ছিল না। তবে কেন আমি সঙ্কুচিত হই?" কখনও তাঁহার মনে হইতেছে,—"উদ্দেশ্য যতই ভাল হউক, আমার কার্য্য কখনই শ্লাঘনীয় নহে। আমার কার্য্যে, আমার ব্যবহারে মা'র প্রাণে একটুও বেদনা যে অনুভূত হয় নাই, কেমন করিয়াই বা বলিতে পারি।" পরক্ষণেই আবার মনকে সান্ত্বনা দিতেছেন,—"আমারই আর উপায় ছিল কি? আমি তো নিরুপায় হইয়াই টাকা চাহিয়াছিলাম। টাকা না পাইলেই বা কিরূপে তখন কার্য্যোদ্ধার হইত? ইহাতেও যদি কিছু পাপ হইয়া থাকে, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না কি?"

দয়ারাম রায় বসিয়া বসিয়া কত কথাই ভাবিতেছেন। ইতিমধ্যে রাজা রামকান্ত আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"দাদা মহাশয়! আপনি কতক্ষণ এসে ব'সে আছেন? আমার আসতে বেশী দেরী হয়েছে কি?"

দয়ারাম রায় কহিলেন,—"না আমি বেশীক্ষণ আসি নাই তো। আসিয়া শুনিলাম,—তোমরা একটু পূর্ব্বেই জয়কালীর মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছ; তাই বসিয়া আছি।"

রামকান্ত রায় বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"আমার যাওয়ার একটু পরেই আপনি এসেছেন। সে যে অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল। তা' খবর দেন নাই কেন?"

দয়ারাম রায় উত্তর দিলেন,—তোমরা মা'র পূজা দিতে গিয়াছ, সেখানে কি খবর দিতে পারি? পূজার সময় মন চঞ্চল হইলে পূজার বিঘ্ন ঘটিতে পারে; সেই আশঙ্কায় তখন তোমায় সংবাদ

দিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। তার পর, আমি তো কৈ বেশীক্ষণ এসেছি ব'লেও মনে হয় না।"

রামকান্ত রায় কহিলেন,—"সে কি বলেন? আমরা প্রায় এক প্রহর কাল মায়ের মন্দিরে পূজায় ব্যস্ত ছিলাম। আমরা যাওয়ার ছ' এক দণ্ড পরেও আপনি যদি এসে থাকেন, তা হলেও ত বড় কম ক্ষণ আসেন-নি।

দয়ারাম।—"আমার তো কৈ তত বেশীক্ষণ বলে মনে হচ্ছে না। তা যাক, যা বল্‌তে এসেছি,—শোন।"

এই বলিয়া দয়ারাম রায়, পাল্কী হইতে আনীত সম্মুখস্থিত সেই বাক্সটীর উপর হস্ত প্রদান করিলেন। বাক্সের চাবি পূর্ব্বেই বাক্সের গায়ে লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন চাবিটী খুলিয়া, রামকান্তকে কহিলেন,—"একবার দেখিয়া লও—সকলগুলি ঠিক আছে কি না? আপনি একবার দেখিয়া লইয়া মা-ভবানীকে এগুলি বুঝাইয়া দিয়া আইস।"

বাক্স খুলিতেই তন্মধ্যস্থিত কতকগুলি অলঙ্কারের প্রতি রামকান্ত রায়ের দৃষ্টি পড়িল। রামকান্ত রায় দেখিলেন,—গহনাগুলি ভবানীর! মুর্শিদাবাদে অবস্থিতিকালে দয়ারাম রায়ের নিকট যে গহনাগুলি বিক্রয় করিতে দিয়াছিলেন,—এগুলি সেই গহনা। তাঁহার রাজ্য উদ্ধারের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্ত যে গহনাগুলি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, এইগুলি সেই গহনা! গহনাগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় রামকান্ত রায় বিস্মিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে স্মৃতি দিনদিন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, সহসা বাক্সের মধ্যে গহনাগুলি দেখিয়া আবার সে স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কি বলিবেন,—কি উত্তর দিবেন,—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

রামকান্তকে নির্ব্বাক্‌, নিস্পন্দ দেখিয়া, দয়ারাম রায় আবেগভরে কহিলেন,—“এই সেই গহনা। এতকাল হৃদয়ে হৃদয়ে বহন করিয়া আসিয়াছি। আজ তোমার সামগ্রী তোমাকে প্রদান করিয়া আমার সেই হৃদয়-ভার লাঘব করিব। এই লও—গহনাগুলি গ্রহণ কর।”

রামকান্ত।—“গহনাগুলি বিক্রয় করিতে দিয়াছিলাম, বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। আবার এগুলি কোথা হইতে আসিল?”

দয়ারাম।—“মায়ের গহনা বিক্রয় করিব? আমি কি এতই পাষণ্ড?”

রামকান্ত।—“আমাদের নিজের প্রয়োজনে আমরা স্বেচ্ছায় গহনাগুলি বিক্রয় করিতে দিয়াছিলাম। ইহাতে আপনার দোষ কি? আমরা তো কৈ একদিনও এই গহনার জন্য ভ্রমেও আপনার নিকট কোনও ক্ষোভ প্রকাশ করি নাই; পরন্তু আমাদের সেই সামান্য কয়খানি গহনার সাহায্যে আপনি যে আমাদের রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন,—ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করি।”

দয়ারাম।—“সেইজন্যই তো আমার আরও অনুশোচনা। আমার প্রতি তোমাদের করুণার, স্নেহের, বিশ্বাসের অবধি নাই। কিন্তু আমি টাকার জন্য মায়ের গহনাগুলি গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভাই! এ কথা মনে হলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয় না কি?”

রামকান্ত।—“আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যতই ভাবিতেছি, বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। সেই গহনা,—আবার কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিল? যদি ফিরাইয়াই দিবেন, তবে উহা গ্রহণ করিয়াই বা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল?”

দয়ারাম।—“ভাই, আর কেন আমায় লজ্জা দেও? বলিয়াছি তো—তোমাদের চিনিতে পারি নাই।—কতকটা অবিশ্বাস বশতঃ,

কতকটা তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, আমি টাকার চাপ দিয়াছিলাম। তারপর, মা-ভবানী যখন আপনার গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া পাঠাইয়া দিয়া আমায় বিষম পরীক্ষায় ফেলিলেন; তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলাম। গহনাগুলি তখন ফেরৎ পাঠাইলেও পাঠাইতে পারিতাম। কিন্তু তখন যে ফেরত পাঠাই নাই, তাহারও একটু কারণ ছিল। তোমাদের সেই দুর্দ্দিনে, আমি দেখিয়াছিলাম, অনেকেই বন্ধুবেশে আসিয়া তোমাদিগকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রবঞ্চকগণের মায়া-মোহে পড়িয়া পাছে তোমরা তোমাদের শেষ সম্বল—এই গহনাগুলি—তাহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া ব'সো; তাই আর আমি এগুলি তখন প্রত্যর্পণ করি নাই।"

এই বলিয়া দয়ারাম রায় গহনার বাক্সটী লইয়া রামকান্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পুনরায় কহিলেন,—"যাও ভাই, বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাও; মাকে গহনাগুলি বুঝিয়ে দিয়ে এস।"

রামকান্ত রায় বলিতে গেলেন,—"দেনা কত টাকা আছে?"

দয়ারাম রায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"কিসের দেনা? তোমার রাজ্যোদ্ধারের আনুষঙ্গিক ব্যয়-নির্ব্বাহের?"

রামকান্ত।—"তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম, সে সময় আপনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, গহনা-বিক্রয়ের টাকাতেও সে ব্যয় সঙ্কুলান হয় নাই। ভাবিতেছিলাম,—আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব—সে সম্বন্ধে আরও কত দেনা আছে?"

দয়ারাম।—"তুমি এখনও বালক। তাই ও-সকল চিন্তা মনোমধ্যে স্থান দিয়া রাখিয়াছ! তুমি জান কি, কত টাকা ব্যয় করিয়া মায়ের এই অলঙ্কারগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল? ব্যয়ের প্রতি

দৃক্‌পাত না করিয়া দেশের শ্রেষ্ঠ কারিকরের দ্বারা এই গহনাগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল। যে টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল, আমার হাত দিয়াই তাহা সরবরাহ করা । আমার খুব মনে পড়ে, ঐ অলঙ্কারগুলি প্রস্তুত করাইতে তখন পঞ্চবিংশ সহস্রাধিক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় পড়িয়াছিল। যদি গহনাই বিক্রয় করিতাম, ঋণ আবার কেন হইবে? বরং উদ্বৃত্ত টাকাই ফেরত পাইতে।"

রামকান্ত।—"গহনা-বিক্রয় করেন নাই। বলিতেছেন,—দেনাও নাই। তবে সে সকল ব্যয় নির্ব্বাহ কি প্রকারে হইয়াছিল?"

দয়ারাম।—"সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমার সম্পত্তির সাহায্যেই তোমার ভৃত্যগণ তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল।"

রামকান্ত।—"আমি শুনিয়াছিলাম, জগৎশেঠের নিকট গহনাগুলি বন্ধক রাখিয়া আপনি লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর সেই ঋণ পরিশোধ না হওয়ায়, গহনাগুলি জগৎশেঠ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন।"

দয়ারাম।—"সে কথা আর জানিয়া ফল কি ভাই? যাহা ভবিতব্য ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। এখন যাও—গহনাগুলি মাকে বুঝাইয়া দেও গে, যাও।"

রামকান্ত।—"আমি আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

দয়ারাম।—"বুঝিবার জন্য মস্তিষ্ক আলোড়িত করিবার কোনই আবশ্যক নাই। মনে করিও—তোমারই অর্থে তোমারই ভৃত্যগণ সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। বৃথা কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ?"

রামকান্ত।—"ভাল, আপনাকে এ বিষয়ে আর বিরক্ত করিব না। যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনিই করিবেন। যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনার কার্য্যের উপর কোন কথা কহিব না; তখন আর কেনই বা

কথা কহিতে চাহিতেছি? তবে একটা কথা জানিবার জন্য বড়ই ব্যগ্রতা হইতেছে; জিজ্ঞাসা করিব কি?"

দয়ারাম।—"কি বল?"

রামকান্ত।—"এতদিন এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারি নাই কেন?"

দয়ারাম।—"আবশ্যক হয় নাই, তাই বলি নাই। বিশেষতঃ এই গহনাগুলি এতদিন হস্তান্তরে অন্যত্র ছিল। আজ অল্পক্ষণ পূর্ব্বে উহা আমার হস্তগত হইয়াছে। যেমনই হাতে আসিয়াছে, তেমনই লইয়া আসিয়াছি। যাক্, এখন তুমি গহনাগুলি মাকে ফিরাইয়া দেও গে, যাও! এখন আমি আসি।"

এই বলিয়া দয়ারাম রায় গাত্রোত্থান করিলেন।

রামকান্ত রায় আর কথা কহিতে পারিলেন না। দয়ারাম রায়ের উপদেশ অনুসারে তিনি গহনার বাক্সটী লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তখন দয়ারাম রায়ও, পাল্কীতে আরোহণ করিয়া, দীঘাপতিয়ার বাটী অভিমুখে রওনা হইলেন।

গহনার বাক্স লইয়া রামকান্ত রায় যখন অন্দরে প্রবেশ করিলেন, তখন সেখানে সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

ভবানী মনে মনে কহিলেন,—"মা জগদম্বা! তুমি কি খেলাই দেখাইলে! মুক্তার মালার পরিবর্ত্তে আমায় সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ।" এই বলিয়া ভবানী আপন মনে একটু হাসিলেন। স্বামীকে কহিলেন,—"কেমন, আমি বলিয়াছিলাম কিনা? রায় মহাশয় আমাদিগকে কিরূপ স্নেহের চক্ষে দেখেন, বুঝিলেন কি?"

রামকান্ত রায় উত্তর দিলেন,—"বুঝিতে যে একটু বাকী ছিল, আজ তাহাও বুঝিতে পারিলাম।"

নবম পরিচ্ছেদ।

বিভীষিকা।

আবার কি নূতন গোল বাধিল?

মুর্শিদাবাদ সহরের, আর তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকা, যে যেদিকে পাইতেছে, এমন করিয়া পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে কেন?

জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ কোনও উত্তর দেয় না। যদি কচিৎ কেহ উত্তর দেয়, বলে—"পদ্মাপারে চলিয়াছি।"

পদ্মাপারে এত লোক কেন যাইতেছে? মান-অপমান জ্ঞান নাই, যান-বাহনের অপেক্ষা নাই, কুলের কুলবধূরা পর্য্যন্ত পদব্রজে পলায়ন করিতেছে! কেহ শিশুর হাত ধরিয়া চলিয়াছে, কেহ আপন শিশু-সন্তানটীকে ক্রোড়ে লইয়াছে, কেহ বা একটীকে কোলে করিয়া আর একটীর হাত ধরিয়া চলিয়াছে।

সকলেই ঊর্দ্ধমুখে রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। কেহই পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে না। মাঝে মাঝে কেহ চীৎকার করিয়া কহিতেছে'—"দোহাই দিদি! আমায় ফেলে যাস্‌নে!" মাঝে মাঝে কেহ বা রাষ্ট্র করিতেছে,—"ঐ আস্‌ছে! নিরির মাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। আমাদেরও ধ'রতে আস্‌ছে।"

এক প্রৌঢ়া উদ্দেশে গালি পাড়িতেছে;—বলিতেছে,—"আ-মর, ড্যাকরারা! আমার উপরও নজর! বেণীর পিসি, তা নইলে আমাকেই বা আস্‌তে বল্‌বে কেন? সে ঠিক শুনেছে—ঠিকই শুনেছে। আমার উপরেই ড্যাকরাদের নজর প'ড়েছে। আমিত্ত

বুড়ি মাগি! আমার তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে। মর মিন্সেরা—মর। চোখের মাথা খা।"

প্রৌঢ়ার এইরূপ মধুবর্ষণ শুনিয়া, তাহার সঙ্গিনী, একটু মুচকি হাসিয়া একটু রসান দিয়া কহিল,—"তুই বলছিস্ বটে; কিন্তু তোর আর কিসের বয়েস? কর্ত্তার যেই গঙ্গালাভ হ'য়েছে, সেই হ'তে লোকে তোকে বুড়ি বলতে আরম্ভ ক'রেছে! হরির ঠাকুর-মার তিন কুড়ি তিন গণ্ডা বয়েস হ'লো, এখনও সে ঘোমটা দিয়ে চলে,—তার কত কেরদানি। একজনের অভাবেই এমনিতর হয়। তোকে ধ'র্‌তে আস্‌বে না তো আর কাকে ধ'র্‌তে আস্‌বে?"

অন্য একজন উভয়ের বাদ-প্রতিবাদ শুনিয়া, ঘোরাল করিয়া কথাটা ফাঁদিয়া উত্তর দিল,—"তোরা ছাই কি জানিস্? আসল কথা ত কেউ শুনিস্ নি—কি জন্যে এই সব মানুষ ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে? তাদের দেশে মহানদী ব'লে একটা নদী আছে—জানিস্? সেই নদীর মোহনা বন্ধ করার দরকার হ'য়েছে, তাই এই সব মানুষ ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে।"

সঙ্গীরা উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তা মানুষ ধ'রে নিয়ে কেমন ক'রে নদীর মোহনা বন্ধ ক'রবে—দিদি?"

সঙ্গিনী।—"আ-মর। তা শুনিস্-নি! কচাকচ কাটবে, আর সেই মোহনায় ফেলে দেবে! তা হ'লেই মোহনা বন্ধ হ'য়ে যাবে। মা কালীর নাকি তাই আদেশ হয়েছে।"

অপর আর একজন অমনি তাহার কথা সমর্থন করিয়া কহিল,— হাঁ-হাঁ, আমিও শুনছিলাম বটে! কথাটা প্রথমে বিশ্বাস হয়-নি; কিন্তু যারা দেখে এসেছে, তাদের মুখে শুনে অবধি হাত-পা গুলো যেন পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে; এখন চল্, তোরা চল্; আর দেরী করিস্ নে! যদি কোনও রকমে পেছন দিক্ থেকে এসে ধরে, আর বাপ-মা বলতে দেবে না।"

দলে দলে লোক চলিয়াছে। এক এক দলে এক এক বিভীষিকার কথা। এক দলে বলিতেছে,—"টাকা-কড়ি লুট করাই তাদের মতলব।" আর এক দলে বলিতেছে,—"মানুষ ধরাই তাদের ব্যবসা।" আর এক দলে বলিতেছে,—"নবাবের রাজ্য কাড়িয়া লওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য।" যাহারা যেমন বুঝিতেছে, যাহারা যেমন শুনিতেছে, তাহারা সেই ভাবের কথাই রাষ্ট্র করিতেছে।

ব্যাপার বড় গুরুতর। বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্রগণ বঙ্গদেশ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

আলিবর্দ্দীর নবাবী-প্রাপ্তির পর, পূর্ববর্ত্তী নবাব সুজা-উদ্দীনের জামাতা মুর্শিদকুলি খাঁ, আলিবর্দ্দীকে উড়িষ্যার আধিপত্য প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। বলা বাহুল্য, এই মুর্শিদকুলি খাঁ—নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহারই নামানুসারে ইহাঁর নামকরণ হইয়াছিল মাত্র। আলিবর্দ্দীর সহিত ইহাঁর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, উড়িষ্যার অন্যান্য বিদ্রোহ দমনপূর্ব্বক, আলিবর্দ্দী যখন মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন; সেই সময়ে সহসা সংবাদ আসিল—মহারাষ্ট্রাধিপতি রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ পঞ্চকোটের পার্ব্বত্যপথ দিয়া বঙ্গদেশ লুণ্ঠনের জন্য বর্দ্ধমান অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। আলিবর্দ্দী তখন, উড়িষ্যার যুদ্ধজয়ে নিষ্কণ্টক হইলাম মনে করিয়া আপনার অধিকাংশ সৈন্যদলকে বিদায় দিয়া কেবলমাত্র পাঁচ সহস্র সৈন্যসমভিব্যাহারে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। সেই সময়েই মহারাষ্ট্রগণের অভিযান-সংবাদ তাঁহার শিবিরে উপনীত হইল। কিন্তু কি করিবেন? মনে মনে শঙ্কান্বিত হইলেও, তাঁহাকে

মহারাষ্ট্রগণের অনুসরণে বর্দ্ধমান অভিমুখে সৈন্য-চালন করিতে হইল।

কয়েক দিন বর্দ্ধমানে উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ চলিল। সেই যুদ্ধে নবাব-সৈন্য পরাজিত হওয়ায়, মহারাষ্ট্রগণকে দশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়া, আলিবর্দ্দী মহারাষ্ট্র-শিবিরে দূত প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত এক কোটী টাকা চাহিয়া বসিলেন; এদিকে মহারাষ্ট্রগণ আশ্রয়প্রার্থীদিগকে আশ্রয় দান করিবেন বলিয়া রাষ্ট্র করিলেন। তাহাতে নবাব-পক্ষের বহুসৈন্য মহারাষ্ট্রদলে যোগদান করিল।

নবাবের সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ, হতাশ হইয়া দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদিন রাত্রিকালে, প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলার হস্তধারণ করিয়া, নবাব আলিবর্দ্দী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন;—আপনাদের ভাবী বিপদের কথা জানাইয়া, বর্গি-দমনে তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। মুস্তাফা খাঁর সৈন্যগণ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিল বটে, প্রথমে নবাব-পক্ষে আশারও সঞ্চার হইল বটে; কিন্তু পরিশেষে নবাব-সৈন্যের আহার্য্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া মহারাষ্ট্রগণ বিষম বিপত্তি বাধাইয়া তুলিল। তাহারা কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া কাটোয়া লুণ্ঠন করিল এবং তত্রত্য শস্যভাণ্ডার ভস্মীভূত করিল। এই সময়ে মীর হবীব নামক জনৈক মুসলমান-সেনাপতি মহা-রাষ্ট্রপক্ষে যোগ দিয়াছিল; মীর হবীব প্রথমে উড়িষ্যার মুর্শিদকুলির একজন সেনানায়ক ছিল। আলিবর্দ্দীর প্রবল প্রতাপ প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রভুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, তাঁহার দলে যোগদান করিয়াছিল; বর্দ্ধমানে যুদ্ধের পর, সে এখন মহারাষ্ট্রদিগের সহিত মিলিত হইল। আলিবর্দ্দীর রাজধানী মুর্শিদাবাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা মীর হবীব,

সমস্তই অবগত ছিল। মহারাষ্ট্রদিগের গতিরোধ জন্ত আলিবর্দ্দী যখন কাটোয়ার অভিমুখে সৈন্ত-পরিচালনা করিলেন; মীর হবীব, অবসর বুঝিয়া, ক্ষিপ্রগামী অশ্বারোহী মহারাষ্ট্র সৈন্তসহ মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনে অগ্রসর হইল।

মুর্শিদাবাদের পশ্চিমে ডাহাপাড়া পল্লী অবস্থিত। মীর হবীব সেই পল্লী ভস্মীভূত করিয়া, সেই পথে ভাগীরথী পার হইল। ভাগী-রথী পার হইয়াই নগর লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। আলীবর্দ্দীর সৈন্তগণ কেবলমাত্র কেল্লা রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। তদ্ভিন্ন নগরের চারিদিক মহারাষ্ট্র-সৈন্তে ছাইয়া ফেলিল। এই সময় মহারাষ্ট্রগণ জগৎশেঠের কুঠী লুণ্ঠন করিয়াছিল। কথিত হয়; সেই লুণ্ঠনে, তাহারা দুই কোটী টাকা নগদ ও বহু মূল্যবান্ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, লুণ্ঠনের দ্বিতীয় দিবস রাত্রিতে আলিবর্দ্দী খাঁ সসৈন্তে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হন। মহারাষ্ট্রগণ তখন লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার লইয়া পুনরায় কাটোয়ায় ফিরিয়া যায়।

এ ঘটনা—১৭৪২ খৃষ্টাব্দের। ঐ সময়ে কাটোয়ায় শিবির সন্নি-বেশ করিয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। কাটোয়ার তিন ক্রোশ উত্তরে দাঁইহাট গ্রাম; কাটোয়া হইতে এই দাঁইহাট পর্য্যন্ত তখন মহারাষ্ট্র-শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল; সেখান হইতে বড় বড় নৌকায় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, গঙ্গা পার হইয়া তাহারা চারিদিক্ লুণ্ঠন করিত, সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ সহরের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিবর্গের প্রাণে যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, নানা কিংবদন্তীতে আজিও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নগরের অধিবাসিবর্গ অনেকেই তখন ভয়ে পদ্মাপারে গমন করিয়া-ছিলেন। মালদহ, রামপুর-বোয়ালিয়া এবং গোদাগাড়ী প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করিয়া, অনেকে সেই সেই স্থানে বসবাস করিতেও

বাধ্য হইয়াছিলেন। অধিক বলিব কি, নবাবের ধন-সম্পত্তির সহিত তাঁহার পরিবারবর্গ তখন গোদাগাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের কৃষি-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। অধিকাংশ স্থান জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইতে বসিয়াছিল।

কয়েক বৎসর এই ভাবেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কখনও নবাব আলিবর্দ্দী মহারাষ্ট্রদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন; কখনও বা তাহারা আসিয়া দেশমধ্যে অশান্তি-অনল বিস্তার করিয়াছিল। অবশেষে, ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দীর বিশ্বাসঘাতকতায় ভাস্কর পণ্ডিত নিহত হইলে, অনেকেই মনে করিয়াছিল,—'বঙ্গদেশ এইবার নিরুপদ্রব হইল।'

কিন্তু সে আশা স্বপ্ন-মাত্র! মহারাষ্ট্রগণের অত্যাচার হইতে আলিবর্দ্দী কয়েক দিনের জন্য নিষ্কৃতি পাইলেন বটে; দেশে সুশৃঙ্খলাস্থাপনের চেষ্টা চলিতে লাগিল,—বটে; কিন্তু পরক্ষণেই সংবাদ আসিল,—ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য স্বয়ং রঘুজি ভোঁসলা অধিকতর সৈন্যসহ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এই সময়ে নবাবের সেনাপতি মুস্তাফা খাঁও বিদ্রোহী হইয়া, নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।

নবাব কোন্ দিক্ দেখিবেন? পাটনার দিকে, বহুতর পাঠান-সর্দ্দারের সহায়তায়, মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছিল। আর এদিকে বাঙ্গলায় মহারাষ্ট্রগণ অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সে অত্যাচারের বিবরণ তাৎকালিক গ্রন্থপত্রে এবং ইতিহাসে কি ভীষণ রঙেই চিত্রিত হইয়া আছে! এখনও পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের মহিলারা শিশু-সন্তানদিগকে ঘুম পাড়াইবার সময় "বর্গী এল দেশে" বলিয়া ভয় দেখাইয়া থাকেন। অর্থের সন্ধান পাইবার জন্য মহারাষ্ট্রগণ লোকের গৃহদাহ করিয়াছে, নাসা-কর্ণ-ছেদ

করিয়াছে, হস্তপদ কাটিয়া দিয়াছে, স্ত্রীলোকের স্তনযুগল কাটিতেও, কুণ্ঠিত হয় নাই। সত্য-মিথ্যা, ত্রিকালদর্শী অবগত আছেন। কিন্তু ইতিহাসে মহারাষ্ট্র-যোদ্ধগণের এই কলঙ্ককাহিনী কি বীভৎসরূপেই চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে! অনেকে বলেন,—এই অত্যাচারই মহারাষ্ট্রজাতির পতনের মূল।

যাহা হউক, রঘুজী ভোঁসলা যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে আসিলেন, মুর্শিদাবাদবাসিগণ আবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। নগর-গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, বাস্তভিটার মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া, আবার তাহারা পদ্মাপারে পালাইতে বাধ্য হইল।

বর্গিরা আবার আসিয়াছে,—এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবামাত্র, যে যেভাবে ছিল, উধাও হইয়া পলাইতে লাগিল। মান-অপমানের প্রতি দৃক্‌পাত নাই, যান-বাহনের অপেক্ষা নাই,—কুলের কুলবধূরা পর্য্যন্ত পলায়নপর হইল।

পদ্মার পথে ঐ যে জনস্রোত চলিয়াছে, বর্গির হাঙ্গামাই তাহার একমাত্র কারণ। যাহারা যে ভাবে বুঝিয়াছে, তাহারা সেই ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিতেছে; যাহারা বুঝিতে পারে নাই, তাহারা নানা-কথার অবতারণা করিয়া বসিতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশ্রমে।

নাটোর-রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সদানন্দ স্বামী উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

শুক্লা দশমীর রাত্রি। চাঁদের হাসি-রাশিতে প্রকৃতি হাস্যময়ী। হাসির ছটায়, জ্যোৎস্নালোকে দিগঙ্গনা উদ্ভাসিত।

দণ্ডেকের মধ্যে তিনি লোকালয় অতিক্রম করিলেন। তার পর রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া মাঠের আলি-পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর চলিতে চলিতে, সম্মুখে একটা বিল দেখিতে পাইলেন। বিল ঘুরিয়া পরপারে যাইতে হইলে, দুই তিন প্রহর সময় লাগে; সুতরাং তিনি সাঁতরাইয়া সেই বিল পার হইলেন।

বিলের পরপারে গভীর অরণ্য-প্রদেশ। বিল পার হইয়া উত্তরাভিমুখে যতই অগ্রসর হইবে, দেখিবে—অরণ্যের গভীরতা ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পথ দুর্গম—বন্ধুর। কোথাও বৃক্ষের উপর বৃক্ষ পড়িয়া আছে; কোথাও প্রস্তরের উপর প্রস্তরের স্তূপ সঙ্কীকৃত রহিয়াছে, কোথাও খরস্রোতা শৈবলিনী সর্পগতিতে প্রবাহিত হইতেছে।

বিল পার হইয়া সদানন্দ স্বামী যখন সেই অরণ্যের প্রবেশপথে উপনীত;—তখন দশমীর চাঁদ ধীরে ধীরে অস্তমিত হইলেন। একে গভীর অরণ্য-প্রদেশ, তাহাতে প্রগাঢ় নৈশ অন্ধকার। দিবাভাগেই সহজে পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অন্ধকার নিশীথে, সে পথে একাকী কে বিচরণ করিতে পারে?

এই গভীর রাত্রিতে এই দুর্গম বন-পথে সদানন্দ স্বামী একাকী এ কোথায় চলিয়াছেন ?

বনপথে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া, একটী বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, সদানন্দ স্বামী শিশ দিলেন। তখনই বনাভ্যন্তরে যেন প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল। অল্পক্ষণ পরেই মশাল লইয়া এক ব্যক্তি তাঁহাকে পথ দেখাইতে আসিল।

সদানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছ ? তোমাদের কোন কষ্ট হয় নাই তো ?"

আগন্তুক কহিল,—"আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আপনি যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে কেহই কোনও কষ্ট বোধ করে নাই।"

সদানন্দ স্বামী।—"তোমাদের সঙ্গীরা সেইরূপ সদানন্দেই আছেন তো ?"

আগন্তুক।—"আপনি তাঁহাদিগকে আনন্দ দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ; তাঁহারা কেন নিরানন্দ হইবেন ?"

সদানন্দ।—"প্রত্যুষেই আমরা আনন্দ-আশ্রমে পৌঁছিতে পারিব কি ? সঙ্গীরা যদি কষ্টবোধ করেন, এইখানেই বিশ্রামের আয়োজন করা যাইতে পারে।"

আগন্তুক।—"বিশ্রামের আর আবশ্যক নাই ; প্রত্যুষেই আমরা আনন্দ-আশ্রমে পৌঁছিতে পারিব ?"

সদানন্দ।—"কাহারও কষ্ট হইবে না তো ?"

আগন্তুক।—"আজ্ঞে না। আপনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন শুনিয়া সঙ্গীদের আনন্দের আর অবধি নাই।"

অল্পদূরেই ত্রিশ জন লোক অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের নিকটে পাঁচ সাতটি মশাল জ্বলিতেছিল। মশালের আলোকে বন-

প্রদেশ আলোকিত হইয়াছিল। কয়েক জনের হস্তে বর্শা, লাঠি ও তরবারি শোভা পাইতেছিল।

সদানন্দ স্বামী নিকটে উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন জানাইল। তিনিও যথাযোগ্য প্রত্যভিবাদন জানাইলেন। তখন সকলে একযোগে গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে বনভূমি কম্পিত করিয়া "হর-হর বম্-বম্" শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল।

সেই রাত্রিতে তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটী নদী পার হইলেন। দুইবার দুইটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর উঠিলেন; দুইবার দুইটী পাহাড় হইতে অবতরণ করিলেন।

প্রভাতে যখন সূর্য্যোদয় হইল, বৃক্ষপত্রান্তরাল-প্রবিষ্ট রশ্মিরেখা-সমূহে নৈশ শিশিরসিক্ত পত্র-পুষ্পদল অনুপম চাক্‌চিক্যময় হইয়া উঠিল; তারপর সকলেই স্বভাবের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। সদানন্দ স্বামী উর্দ্ধমুখ হইয়া দিনদেবের প্রতি চাহিয়া যুক্তকরে স্তোত্রগীতি আরম্ভ করিতে লাগিলেন,—

> "নমো নমস্তেঽস্তু সহস্ররশ্মে সর্ব্বস্য হেতুস্ত্বমশেষকেতুঃ।
> পাতা ত্বমীড্যোঽখিলযজ্ঞধাম ধ্যেয়স্তথা যোগবিদাং প্রসীদ॥"

কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সঙ্গিগণও সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিলেন।

অরণ্যের কি মনোহর মূর্ত্তি! কোথাও শাল তাল তমাল—ক্ষুদ্র বিশাল বৃক্ষরাজি আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। কোথাও গুল্মসমূহ পুঞ্জীকৃত হইয়া কুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতেছে! কোথাও বৃক্ষপরিশূন্য ভূখণ্ডে তৃণসমাচ্ছন্ন সুচারু আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে; কোথাও পুষ্পগুচ্ছ-সমলঙ্কৃত লতিকাসমূহ, পতিবাহুমূলে বিন্যস্তদেহা সালঙ্কারা সুন্দরীর ন্যায়, প্রিয়তম তরুবরকে আলিঙ্গন

করিয়া আছে; কোথাও বা কত বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট বিহঙ্গমগণ বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে প্রভাতী-গীতি গাহিতেছে।

প্রকৃতির এই রমণীয় শোভা দর্শন করিতে করিতে, দিবা এক প্রহরের মধ্যে, তাঁহারা আনন্দ-আশ্রমে উপনীত হইলেন।

সত্যই সে আনন্দ-আশ্রম! নিম্নে স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী। সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, পুষ্পস্তবকশোভিত ফল-ভারাবনত বৃক্ষ-বল্লরী। মধ্যস্থলে সেই আনন্দ-আশ্রম। প্রকৃতি যেন, সকল অভাব ঘুচাইয়া, সর্ব্বসুখময় করিয়া, নিভৃতে এই রমণীয় স্থানটীকে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। যদিও পার্শ্বে পত্রাচ্ছাদিত কয়েকখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু লতা-বিতানসমন্বিত বৃক্ষমূলেই সাধারণতঃ আশ্রমবাসীরা বসবাস করিয়া থাকেন।

সময়ে সময়ে এই আনন্দ-আশ্রমে চারি পাঁচ শত লোকেরও সমাবেশ হইয়া থাকে। কেহ সন্ন্যাসী, কেহ গৃহত্যাগেচ্ছু, কেহ বা তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া সেখানে উপস্থিত হয়। কত দিন হইতে ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত, কেহই তাহা অবগত নহেন। এতদিন এই আশ্রমে কেবল তত্ত্বালোচনাই চলিত; কিন্তু দুই তিন বৎসর হইতে উহার কিছু ভাব-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। স্বধর্ম্মরক্ষাই মুখ্য উদ্দেশ্য বটে; তবে যে উপায়ে সে উদ্দেশ্য-সাধন হইতে পারে, সে উপায় এখন ভাবান্তরে পরিচালিত হইতেছে।

আনন্দ-আশ্রমের এখন যিনি গুরুস্থানীয়, তাঁহার নাম শিবানন্দ স্বামী। বর্ণ তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায়। আ-বক্ষ শ্বেতশ্মশ্রু বিলম্বিত। মস্তকে জটাজুট পরিশোভিত। তাঁহার বয়ঃক্রম কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। তিনি যোগী পুরুষ।

সদলবলে আনন্দ আশ্রমে উপনীত হইয়া, সদানন্দ স্বামী সেই যোগী পুরুষের চরণে প্রণত হইলেন।

শিবানন্দ স্বামী সকলের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া, সকলকেই বিশ্রাম করিতে কহিলেন। সকলেই পথ-পর্য্যটনে ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়াছিল। সুতরাং তখনকার মত সকলেই বিশ্রাম করিতে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আলোচনা।

বিশ্রামান্তে যথাসময়ে শিবানন্দ স্বামীর সহিত সদানন্দের কথা-বার্ত্তা আরম্ভ হইল। সদানন্দ স্বামী প্রথমে দেশের অবস্থার কথা কহিতে লাগিলেন। হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপন-পক্ষে আশা-নৈরাশ্যের সকল সংবাদই বিদিত করিলেন। শিবানন্দ স্বামী—একমনে সকল কথাই শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে এক একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আয়োজন কোথায় কিরূপ হইয়াছে, সন্ধান জানিয়াছ কি?"

সদানন্দ।—"উত্তর-বঙ্গের বহু অরণ্যপ্রদেশে আনন্দ-আশ্রমের ন্যায় আশ্রমসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমাদের ন্যায় সকলেই গুরু শম্ভূনাথের আদেশ মান্য করিতেছেন। গুরু-মন্দির হইতে নানা স্থানে শাখাস্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। এখানে আমরা যেমন এই ক্ষুদ্র গণ্ডী প্রতিষ্ঠা করিয়াছি; কেন্দ্রে কেন্দ্রে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।"

শিবানন্দ।—"এ চেষ্টায় কি ফললাভ হইবে?"

সদানন্দ।—"দেশের ভূ-স্বামিগণ যদি সত্য সত্যই জাগরিত না হন; আপনি জানিবেন, শেষে ভারতে সন্ন্যাসীর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত

হইবে। সন্ন্যাসীর দল দিন দিন যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে তাহাদের গতি কেহই রোধ করিতে পারিবে না!"

শিবানন্দ স্বামী মনে মনে একটু হাসিলেন; বলিলেন,—"সন্ন্যাসীরা রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে, আমার তাহা মনে হয় না। যাহা গৃহীর কর্ম্ম, সংসার-কীটের অনুষ্ঠেয়, সন্ন্যাসিগণের পক্ষে তাহা সম্ভবপর কি! কিন্তু যাউক সে কথা। যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহার শেষ কোথায় দাঁড়ায়—দেখা আবশ্যক।"

সদানন্দ।—"আমারও তাহাই মত; এক্ষণে চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক। ফলাফল—ভগবানের অনুকম্পা-সাপেক্ষ!"

শিবানন্দ।—"ভাল, এ যাত্রায় লোকজন কিরূপ সংগ্রহ করিতে পারিলে? এই যে কয়েক জন নূতন লোক সঙ্গে আসিয়াছে, ইহাদিগকে কোথায় পাইলে?"

সদানন্দ।—"ইহাদের সকলেই স্বেচ্ছায় আসিয়াছে। সকলেরই প্রতি বিশেষ আশার কথা আছে। যদি অনুমতি করেন, এক একজনের কাহিনী বলিয়া যাই। শুনিলে আপনারও মনে হইবে,—এ প্রকারের লোক দ্বারাই কার্য্যোদ্ধারের সম্ভাবনা আছে।"

শিবানন্দ।—"ক্রমশঃ সকলের কথাই শুনিব। কিন্তু ঐ একজন বৃদ্ধকে আনিয়াছ কি জন্য? দেশোদ্ধারের কোন্ কর্ম্মে উঁহাকে নিয়োজিত করিবে মনে করিয়াছ?"

সদানন্দ।—"গুরুদেব! অপরাধ লইবেন না; আমার বিশ্বাস,—যদি ঐরূপ বৃদ্ধ আরও জনকয়েক সংগ্রহ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের সুফল-লাভের আশা ষোল আনা বলিয়া মনে করিতাম।

শিবানন্দ।—"বৃদ্ধ কি প্রকারে তোমার এতাদৃশ অনুগ্রহভাজন হইল?"

সদানন্দ।—"যদি আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, বৃদ্ধ আপনার অনুগ্রহভাজন হইবে, সন্দেহ নাই। শুনিবেন কি, উহাকে কোথায় কি প্রকারে পাইয়াছি ?

শিবানন্দ।—"বল, সত্যই শুনিবার জন্য আগ্রহ হইতেছে।"

সদানন্দ।—"পদ্মার ধারে বদনগঞ্জের পরপারে এই বৃদ্ধকে আমি জীবন্মৃত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ইহার নাম কৃত্তিবাস। বৃদ্ধ সত্যই কৃত্তিবাস। প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য এই বৃদ্ধ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে গিয়াছিল। ইহার প্রভু ছাতিন-গ্রামের জমিদার আত্মারাম চৌধুরী পদ্মার জলে আ-বক্ষ-নিমগ্ন-অবস্থায় সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছিলেন। সেই সময়ে একটা হাঙ্গর হাঁ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে যায়। এই বৃদ্ধ সেই অবস্থায় প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য হাঙ্গরের মুখের সম্মুখে ঝম্প প্রদান করে। হাঙ্গর ভয় পাইয়া জল-মধ্যে ডুব দেয়। বৃদ্ধ তলাইয়া গিয়া হাবুডুবু খাইয়া পদ্মার পরপারে ভাসিয়া যায়। আমি উহাকে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় জল হইতে উঠাইয়া লইয়া উহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হই। হঠাৎ আমি সেদিকে গিয়াছিলাম, তাই আমি উহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাই বৃদ্ধ প্রাণ পাইয়াছে। নচেৎ সেই দিন পদ্মার গর্ভেই উহার মৃতদেহ জলচর জীবগণের তৃপ্তিসাধন করিত।"

শিবানন্দ।—"উহার দ্বারা আমাদের কি উপকার হইতে পারে ?"

সদানন্দ।—"কি উপকার হইতে পারে ? যে জন অমনভাবে প্রভুর জন্য জীবন-দান করিতে পারে, সে না পারে কি ? আমার মনে হয়, বৃদ্ধকে যে কার্য্যের ভার দিব, বৃদ্ধ সেই কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া আসিবে।"

শিবানন্দ।—"বুঝিলাম, কৃত্তিবাসের মত লোকের প্রয়োজন আছে। বুঝিলাম, ওরূপ লোকের উপর অনায়াসেই নির্ভর করা

যায়; কিন্তু ঐ যে ব্রাহ্মণটীকে দেখিতেছি, উহাকে কি জন্ম আনিয়াছ?"

সদানন্দ;—"ঐ ব্রাহ্মণের জীবনও অপূর্ব্ব ঘটনা-পরিপূর্ণ। ঐ ব্রাহ্মণের পুত্র, পুত্রবধূ, পরিবার—সোণার সংসার ছিল; কিন্তু এক দিন নৌকা-ডুবিতে পদ্মার গর্ভে সমস্তই গ্রাস করিয়া লইয়াছে। এখন সংসারে ব্রাহ্মণ একা। উহার আর আপনার বলিবার দ্বিতীয় কেহ নাই। নাম—চণ্ডীদাস শিরোমণি। ব্রাহ্মণ—সত্যই শিরোমণি।"

শিবানন্দ।—বুঝিলাম, ঠিক লোকই বাছাই করিয়াছ। কিন্তু উহারা স্বেচ্ছায় আসিয়াছে কি? ব্রতগ্রহণে কষ্টের বিষয় উহাদিগকে কিছু বুঝাইয়া বলিয়াছ কি?"

সদানন্দ।—"কোন বিষয়ে আমি সংশয় রাখি নাই। সকলকেই বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া এখানে আনিয়াছি।"

শিবানন্দ।—"কৃত্তিবাসের সংসার চলিবে কি করিয়া, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?"

সদানন্দ।—"কৃত্তিবাসের সংসার চালাইবার জন্ত আত্মারাম চৌধুরী আপনিই বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। যদি কখনও কিছু অনাটন হয়, আমরা অবশ্যই তাহা পূরণ করিব। কৃত্তিবাসের পরিবারবর্গকে অর্থসাহায্য করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইব না। কৃত্তিবাসের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ! আমি পদ্মায় বাঁচাইয়াছিলাম বলিয়া, কৃত্তিবাস প্রায়ই বলে—'এ জীবন আপনারই; যখন ইচ্ছা লইতে পারেন; যেরূপে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন।' কৃত্তিবাস আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে সম্মত নহে।"

শিবানন্দ।—"সদানন্দ! তোমার নির্ব্বাচনশক্তি দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম। যদি কখনও হিন্দুজাতির অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তোমার ন্যায় বিচক্ষণ সহৃদয় ব্যক্তিগণের দ্বারাই তাহা সম্ভবপর।"

এই কথা বলিয়াই শিবানন্দ স্বামী একটী বালকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এই বালকটীকে কোথায় পাইলে ?"

সদানন্দ।—"এই বালকের ইতিহাস বড়ই লোমহর্ষণ। আমি একদিন বোয়ালিয়ার পথে যাইতেছিলাম। সেই সময় দূর হইতে এই বালকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমি বিচলিত হই। তখন যে পথে যাইতেছিলাম, সে পথ পরিত্যাগ করিয়া আর্ত্তনাদের অনুসরণ করি। কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাই, কয়েকজন ওলন্দাজ জলদস্যু এই বালকটীকে অপহরণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে; বালকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তখন আমি সেই জলদস্যুগণের নিকট অগ্রসর হইয়া এই বালককে ভিক্ষা চাহিলাম।"

এই বলিয়া সদানন্দ স্বামী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন।

শিবানন্দ।—"তারপর ?"

সদানন্দ।—"তাহারা সে কথা শুনিবে কেন ? তাহারা আমায় অকথ্য কহিয়া গালাগালি দিল। কিন্তু বালক আমার প্রতি চাহিয়া কাতরকণ্ঠে কহিতে লাগিল—'আপনি আমায় বাচান। এরা আমায় নরবলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে।" বালকের ক্রন্দনে আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। এদিকে আমার অনুনয়-বিনয়ে উপেক্ষা করিয়া বালককে লইয়া, জল-দস্যুগণ নদীর দিকে ছুটিতে লাগিল। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। পদ্মার উপর দস্যুগণের জাহাজ নঙ্গর করা ছিল। দস্যুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি যখন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন একজন দস্যু আমাকেও ধরিয়া ফেলিল; বলিল,—"চল্ বেটা, তোকেও নিয়ে যাই।' তাহার হাত ছিনাইয়া অনায়াসে আমি পলায়ন করিতে পারিতাম, কিন্তু সে চেষ্টা করিলাম না। তাহারা যেমনভাবে বলিল, তেমনই ভাবে আমিও বন্দীর ন্যায়

জাহাজে গিয়া আরোহণ করিলাম। অতঃপর জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট এই বালককে ও আমাকে উপস্থিত করা হইল। আমাদিগকে দেখিয়া, তিনি তাঁহার নিজের ভাষায় কি বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তবে, যে প্রহরীর নিকট আমাদের রক্ষার ভার ন্যস্ত হইল, সে বলিল,—'কাল তোমাদিগকে বিক্রয় করা হইবে। এই পথে দাস-বোঝাই একখানি জাহাজ যাইবে, সেই জাহাজে তোমাদিগকে তুলিয়া লইবে।' আমি আর কোন উচ্চবাচ্য করিলাম না।"

শিবানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাস-বোঝাই জাহাজ কোথায় লইয়া যাইবে?"

সদানন্দ।—"এদেশ হইতে ওলন্দাজ জলদস্যুরা যে সকল লোক ধরিয়া লইয়া যায়, তাহাদিগকে বিক্রয়ার্থ নানাদেশে চালান দেয়। সেই সকল দেশের লোক উহাদিগকে ক্রয় করিয়া লইয়া দাসত্ব-কার্য্যে নিযুক্ত করে।"

শিবানন্দ স্বামী—"শুনিয়াছি বটে। আচ্ছা, তারপর তুমি কি করিলে?"

সদানন্দ।—"আমি সেই দাসবাহী জাহাজেরই অপেক্ষা করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমাদের পলায়নের এক অবসর উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ প্রহরীর জিম্মায় আমাদিগকে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। অবশেষে সন্ধ্যার সময় জাহাজের অধ্যক্ষ আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া একটী কামরায় আবদ্ধ করিতে গেলেন। তিনি অগ্রে অগ্রে, বালক ও আমি মধ্যস্থলে, আর সেই প্রহরী আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই আমরা জাহাজের একটী সিঁড়ির নিকট উপনীত হইলাম; সেই সিঁড়ি দিয়াই ডেকের পথে অবতরণ করিতে হয়।"

শিবানন্দ।—"তখন তোমাদের হাত-পা খোলা ছিল কি?"

সদানন্দ।—"আজ্ঞে হাঁ, তাহাতেই আমার সুবিধা হইল। সেই সময় জাহাজের অধ্যক্ষ যেই সিঁড়িতে অবতরণ করিলেন, আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া বালককে জাপটাইয়া ধরিয়া জাহাজ হইতে পদ্মার জলে ঝম্প প্রদান করিলাম। পশ্চাতের প্রহরী চীৎকার করিয়া উঠিল। জাহাজের অধ্যক্ষ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অল্পক্ষণ পরেই জাহাজ হইতে পদ্মার জলে ঘন ঘন কামানের গোলা বর্ষণ আরম্ভ হইল। কিন্তু তখন সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিয়াছে, আমাদের প্রতি তাহারা লক্ষ্য করিতে পারিল না; আমাদের কোনই ক্ষতি হইল না; আমরা ভাঁটার পথে গা-ভাসান দিয়া পদ্মার পর-পারে উপনীত হইলাম।"

শিবানন্দ।—"বালককে উদ্ধার করিলে বটে, কিন্তু উহার পিতা-মাতার নিকট প্রত্যর্পণ করিলে না কেন? সন্তান-হারা হইয়া তাঁহারা কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছ না কি?"

সদানন্দ।—"বালক আমার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিল না। উহার পিতা-মাতার উদ্বেগ দূর করিবার জন্য আমি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহাদিগকে বলিয়া আসিয়াছি,—'শীঘ্রই বালককে দেখিতে পাইবেন।' কেবল বালকের জিদ্‌বশতঃ আপনাকে একবার দেখাইবার জন্য উহাকে এখানে আনিয়াছি। এখন আপনি যেরূপ আদেশ করেন, সেইমত ব্যবস্থা করিব।"

শিবানন্দ।—"সকলই বুঝিলাম। কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইও না। মনে থাকে যেন—আমাদের ব্রত পর-সেবা। সংসারের কষ্ট দূর করিবার জন্যই ভগবৎ-প্রেরণায় আমরা এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা—সেই ব্রতেরই অন্তর্নিবিষ্ট। যখন দেখি, অত্যাচারীর নিকট নিরীহ জন নিপীড়িত হইতেছে, তখনই আমাদের কর্তব্য—অত্যাচারীর হস্ত হইতে

তাহাদের উদ্ধারসাধন। এখন দিন দিনই দেশ অরাজকতাময় হইতেছে। তাই শান্তিময় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা উদ্যোগী হইয়াছি। আমাদের সেই গূঢ় উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া জনহিত-ব্রত পালন করিবে, জনে জনে সে ব্রত শিক্ষা দিবে। অধিক আর কি বলিব? আপাততঃ তুমি অন্য কার্য্যে যাইতে পার।"

কথাবার্ত্তার পর সদানন্দ স্বামী উঠিয়া যাইতেছিলেন; সেই সময় শিবানন্দ স্বামী পুনরায় কহিলেন,—"আর একটী কথা আমার বলিবার আছে। সেইটী শুনিয়াই তুমি কার্য্যান্তরে যাইতে পার।"

সদানন্দ।—"আদেশ করুন। একটু পরে যাইলেও আমার কার্য্যহানির সম্ভাবনা নাই।"

শিবানন্দ।—"আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি কি, এই সকল লোকের উপর এখন কি কি কার্য্যের ভার দিবে মনস্থ করিয়াছ?"

সদানন্দ।—"আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন।"

শিবানন্দ।—"তুমি যে সকল লোক বাছাই করিয়া আনিয়াছ, আমি আবারও বলিতেছি, তাহারা সহৃদয়। কিন্তু তাহাদের জনহিতৈষণা প্রবৃত্তি এই নিবিড় অরণ্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা কখনই সমীচীন নহে। ইহাদিগকে যদি এখন সংসারের কার্য্যে প্রেরণ কর, ইহাদের দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।"

সদানন্দ।—"এখানে উহাদিগকে কেবলমাত্র শিক্ষার জন্য আনিয়াছি। শিক্ষা-সমাপন হইলেই স্থানে স্থানে প্রেরণ করিব।"

শিবানন্দ।—"শিক্ষার অর্থ তুমি কি বুঝিয়াছ, আমি বলিতে পারি না। সকলকেই যে কেবল অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে, এরূপ কখনও মনে করিও না। যে ব্যক্তি যে কার্য্যের উপযুক্ত, তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। এখন দেশের যেরূপ অবস্থা, দেশের

নানাস্থানে এই সন্ন্যাসীর দল বিস্তৃত হইয়া পড়া আবশ্যক। কখন কোথায় কোন্ ভাবে কি অত্যাচার হয়, সন্ধান লইয়া তাহার তদনুরূপ প্রতিকার-ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।"

সদানন্দ।—"আমিও তাহাই মনস্থ করিয়াছি। সহরে, মফঃস্বলে, নানাস্থানে আমাদের দল বিস্তৃত করিতেছি। পরসেবার জন্য, আর্ত্তের পরিত্রাণের জন্য, তাহারা সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিবে।"

শিবানন্দ।—"এই কথা বলিবার জন্যই তোমায় অপেক্ষা করিতে বলিতেছিলাম। কিন্তু বুঝিলাম, তুমি দেশকালপাত্রের সকল অবস্থায় অভিজ্ঞ আছ। তোমার ব্যবস্থা-অনুসারে অবশ্যই সুফল লাভ হইবে।"

ইহার পর আগন্তুকগণের পরিচর্য্যার জন্য শিবানন্দ স্বামীর নিকট হইতে সদানন্দ স্বামী বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কাজীর বিচার।

নগর অবরোধের দিন কৃতান্তকুমার সেনাপতির হস্তে বন্দী হয়। পিতার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া সে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল, পথে নবাবের ফৌজগণ তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। সেই সময় সেনাপতিকে লক্ষ্য করিয়া কৃতান্তকুমার ছুরি ছুড়িয়াছিল। সে ছুরি সেনাপতির অঙ্গস্পর্শ করে নাই বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ফলে কৃতান্তকুমার বিদ্রোহী বলিয়া ধৃত হইয়াছিল।

আজ কাজীর নিকট কৃতান্তকুমারের বিচার। সেনাপতি নিজেই কৃতান্তকুমারকে কৃতান্তপুরে পাঠাইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি আপন ন্যায়পরতা প্রকাশের জন্য কাজীর নিকট উঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

কাজী, বিচারাসনে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, আর দণ্ডাজ্ঞা জানাইতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে দুই জন সহকারী বসিয়া বিচারের ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতেছে। সম্মুখে ও পশ্চাতে বহুসংখ্যক সশস্ত্র-প্রহরী দণ্ডায়মান আছে। এক একজনের বিচার শেষ হইতেছে, আর সেই প্রহরিগণ তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র-প্রদানে সরাইয়া লইতেছে।

তৃতীয় প্রহরের পর, কাজীর এজলাস বসিয়াছে। এখনও এক ঘণ্টা অতীত হয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যেই তিনি দশ-জনের বিচার শেষ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট সেদিন সকল অপরাধীই প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে। এক একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে আনীত হইলে, কাজী তাহার মুখপানে একবার চাহিয়া দেখিতেছেন, আর যে ব্যক্তি যে অপরাধে অভিযুক্ত, তাহাকে সেই বিষয়ে একটী করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন। যে ব্যক্তি চৌর্য্য-অপরাধে অভিযুক্ত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"কেমন, তুই চুরি করিয়াছিস?" তারপর, সে কি উত্তর দেয় বা না দেয়, তাহা আর তিনি শুনিতেছেন না; একেবারেই হুকুম দিতেছেন—"প্রাণদণ্ড"।

অপরাধের তারতম্যানুসারে, তিনি কাহারও মস্তকচ্ছেদের, কাহাকেও শূলে চড়াইবার আদেশ দিতেছেন।

এইরূপে দশ জনের বিচার শেষ হইলে, কাজীর নিকট কৃতান্ত-কুমারের বিচার আরম্ভ হইল। যুবকের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া ভদ্র-সন্তান বুঝিতে পারিয়া, কাজীর মনে একটু দয়ার সঞ্চার হইয়া-ছিল। বিশেষতঃ কৃতান্তকুমারের শ্বশুর, জামাতার প্রাণরক্ষার জন্য

কাজীর করুণা উদ্রেকের পক্ষে গোপনে গোপনে একটু চেষ্টা করিতে-ছিলেন; তাহাতেও কাজীর করুণা উদ্রেকের একটু সম্ভাবনা হইয়াছিল। সুতরাং বিদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেও কাজী কৃতান্তকুমারকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে মনস্থ করিলেন।

কাজী কহিলেন,—"তুমি বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত। প্রমাণ হইলে, তুমি গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। সুতরাং যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, এই সময় বলিতে পার।"

কৃতান্তকুমার উত্তর দিল,—"কাজী সাহেব! আমায় আর কি গুরুদণ্ড দিবেন? আপনার গুরুদণ্ড ত'—আমার প্রাণদণ্ড! আমি সেজন্য প্রস্তুত হইয়াছি। বরং আপনার সে দণ্ডাদেশ প্রদানে যতই বিলম্ব ঘটিবে, ততই আমায় এই যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আপনি এই দণ্ডেই আমার প্রাণদণ্ড বিহিত করুন।"

কাজী সাহেব পুনরায় কহিলেন,—"তোমার পরিণাম কি হইবে, এখনও তুমি বুঝিতে পারিতেছ না।"

কৃতান্তকুমার বিকট হাস্য করিয়া কহিল,—"আমার পরিণামের কি এখনও বাকী আছে? আমি পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করি-য়াছি; আমার শিক্ষার দোষে সেই বংশ কলঙ্কিত হইয়াছে; আর, এখন আমি তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছি। ইহার অধিক গুরুদণ্ড আমার আর কি হইতে পারে? সে তুলনায় আমার প্রাণ-দণ্ড কিছুই নহে। আপনি আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিন।"

ব্রাহ্মণ-সন্তান শিক্ষার দোষে কুপথগামী হইয়াছিল। এখন তাহার গভীর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। এ অবস্থায় নিষ্কৃতি পাইলে, হয় তো সে শুধরাইয়া [illegible] অজুহাতে

কাজী আবারও কহিলেন,—"তোমার বয়স অল্প এখনও তুমি

গুধরাইতে পার। তাই তোমার প্রতি দয়া করিতে ইচ্ছা হইতেছে তুমি যদি কাফেরের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া—"

কৃতান্তকুমার, কাজীর বাক্যে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, তাঁহার কথায় বাধা দিয়া, কি যেন কি বলিতে গেল। কিন্তু তাহার মুখে "যবন" এই শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র, দুই তিন জন প্রহরী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

এদিকে ঠিক সেই সময়ই সেনাপতি মহবত খাঁ এজলাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজী সাহেব, তাঁহাকে দেখিয়া সেলাম করিয়া, আপন দক্ষিণ-পার্শ্বে বসিবার আসন দিলেন। ক্ষণকাল দুই জনে কি কথাবার্ত্তা হইল। কথাবার্ত্তার পর সেনাপতি চলিয়া গেলেন। অবশেষে কৃতান্তকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কাজী দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন।

কাজী সাহেব কহিলেন,—যুবক! তুমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, মস্তকচ্ছেদ ইহার উপযুক্ত দণ্ড। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তদপেক্ষা গুরুদণ্ডের প্রয়োজন।"

এই বলিয়া কাজী সাহেব আদেশ দিলেন,——"এই অপরাধী যুবকের কোমর পর্য্যন্ত মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়া ডালকুত্তা দিয়া উহাকে খাওয়াইবে। কুকুরের কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ক্ষতস্থানে লবণ প্রক্ষেপ করিতে হইবে।"

কাজীর আদেশমাত্র প্রহরিগণ কৃতান্তকুমারকে বিচারালয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল। সে আরও কিছু বলিবার চেষ্টা করিলে তৎপ্রতি কেহই কর্ণপাত করিল না। কৃতান্তকুমার কথা কহিবার চেষ্টা করিলে, দুই তিন জনে পুনঃপুন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

সেদিনকার বিচার সেইখানেই শেষ হইল।

রাণী ভবানী।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত

১৭৫২ খৃষ্টাব্দ (১১৫৮-৫৯ সাল) পর্য্যন্ত রাজা রামকান্ত রায় নির্ব্বিঘ্নে রাজকার্য্য পরিচালনা করিলেন। হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর এই কয়েক বৎসর সুখের ও সৌভাগ্যের অবধি রহিল না। তিনি যেমন রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে, প্রজাবর্গের উন্নতি বিধানে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; তেমনই স্বধর্ম্ম রক্ষায় ও সমাজ-বন্ধনের দৃঢ়তা-সম্পাদনে উদ্‌যোগী রহিলেন। মহারাণী ভবানীর গুণগ্রামেও দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও তাঁহারা কোনরূপ মনঃকষ্ট পাইলেন না। 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর,' বলিতে যাহা বুঝাইয়া থাকে, এই কয় বৎসর তাঁহারা সেই অবস্থায় উপনীত হইয়া ছিলেন। তাঁহাদের একটী পুত্রসন্তান জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তাঁহারা এক অনুপম কন্যারত্নও লাভ

করিলেন। এক দিকে তাঁহাদের যশঃসৌরভে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; অন্যদিকে পুত্র-কন্যার মুখ দেখিয়া এবং অতুল ধনসম্পদের অধিকারী হইয়া তাঁহারা পৃথিবীতেই স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতেছেন।

সহসা ভাগ্যচক্রের আবার এক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। মানুষ জানে না, মানুষ বুঝিতে পারে না, তাহার অদৃষ্ট-পটের কখন কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। রাজা রামকান্ত রায় ভ্রমেও ভাবেন নাই, মহারাণী ভবানী স্বপ্নেও বুঝিতে পারেন নাই,—সহসা এমন এক নূতন বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বিপত্তি—রাজ্যভ্রষ্ট হওয়া অপেক্ষাও গুরুতর। যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! তাঁহাদের দুইবর্ষ-বয়স্ক কুমার, এক দিনের জ্বরে, হঠাৎ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। পিতামাতার হৃদয়বৃন্ত ছিন্ন করিয়া কালের করাল হস্ত যখন শিশুটীকে অপহরণ করিল, রাজা ও রাণী দুই জনেই তখন শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। উভয়েই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন,—"হা বিধাতঃ! কোন পাপে আমাদের নয়নমণি অপহরণ করিয়া লইলে?" রাজা রামকান্ত রায় পুত্রশোকে পাগলের ন্যায় হইলেন। মহারাণী ভবানী অনেক সময় ফুকারিয়া কাঁদিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রাণের আগুন প্রাণের ভিতরেই জ্বলিত; এক একবার দীর্ঘশ্বাসে তাহা প্রকাশ পাইত মাত্র। বিশেষতঃ পতি পাগলের ন্যায় হইয়াছেন দেখিয়া, মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিয়া, অনেক সময় তাঁহাকে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে শোককাতর দেখিয়া পতির শোক-সাগর পাছে উছলিয়া উঠে—এই আশঙ্কায়, তিনি পতির নিকট মনোভাব প্রকাশ না করিয়া নির্জ্জনে জগৎপতির পাদপদ্মে সকল কষ্ট নিবেদন করিতেন।

দিনের পর দিন চলিয়া যায়। স্মৃতির উপর নূতন নূতন আবরণ

আসিয়া সঞ্চিত হয়। কিন্তু বিধাতার কি কঠোর পরীক্ষা! ভবানীর হৃদয়ে পুত্রশোক-স্মৃতির উপর নূতন আবরণ সঞ্চিত হইতে না-হইতে, আবার এ কি বিষম শক্তিশেল নিপতিত হইল!

জ্যৈষ্ঠ মাস। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি। ভবানীর সাবিত্রী-ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। সকল শোক ভুলিয়া গিয়া, ভবানী একমনে পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা পতির চরণ পূজা করিলেন। বিষাদের মধ্যে আনন্দের নবীন মুকুল অঙ্কুরিত হইল। ব্রত সম্পন্ন হইলে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বিদায়-প্রাপ্ত হইলেন; যথাযোগ্য দান-ধ্যান-ভোজন-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে, রাজা রামকান্ত রায় শয়ন-প্রকোষ্ঠে আসিয়া, ভবানীকে বলিলেন,—"আমার শরীরটা আজ কেমন কেমন করিতেছে।"

বিবাহের পর বিংশতি বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে একদিনও ভবানী স্বামীর কোনরূপ শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ শ্রবণ করেন নাই। আজ অমাবস্যার দিন, দিবা দ্বিপ্রহরে, হঠাৎ কেন তিনি অসুস্থতার ভাব প্রকাশ করিলেন?

পতির অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়াই ভবানীর প্রাণটা কেমন কাঁদিয়া উঠিল। আজ আর ভবানী মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি উদ্বেগ-আবেগে কহিলেন,—"আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ!"

ভবানী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, রামকান্ত রায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"তুমি একটুতেই বড় বিচলিত হও! অমাবস্যার দিন সামান্য একটু হাত-পা কামড়াইতেছে, তাহাতেই তোমার অদৃষ্ট মন্দ হইল?"

ভবানী ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন;—আমার বড়ই মন্দ ভাগ্য, আমি যে দিকে তাকাই, সেই দিক্‌ই শূন্য হয়ে যায়।"

ভবানীকে অধিকতর উদ্বিগ্ন দেখিয়া, সে উদ্বেগ নিবারণের জন্য, রামকান্ত রায় এইবার এক কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। ভবানীকে শান্ত করিবার একটী প্রধান উপায় তিনি অবগত ছিলেন। ভবানীর সান্ত্বনার পক্ষে অতঃপর সেই অমোঘ উপায় অবলম্বন করিলেন। রামকান্ত কহিলেন,—"ও সব কথা রাখিয়া এখন আমার পা-টা একটু টিপিয়া দিতে পার?"

যেন সকল উদ্বেগ দূর হইল। ভবানী পতির পদতলে বসিয়া পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু একি! পদদ্বয় এত উষ্ণ কেন? ভবানী পতির গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া দেখিলেন,—উষ্ণতা ততোধিক। দেখিয়া বিচলিত হইয়া, ভবানী কহিলেন,—"আমি একবার চন্দ্রনারায়ণ দাদাকে ডাকাইতে ইচ্ছা করি।"

রামকান্ত রায়, ভবানীর সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। কে যেন তাঁহার কাণে কাণে আসিয়া বলিয়া গেল,— "আপত্তি করিয়া বৃথা কেন ক্ষোভ রাখিবে?" সুতরাং পরিচারিকাকে ডাকিয়া ভবানী অনায়াসে চন্দনারায়ণ ঠাকুরকে ডাকাইয়া আনিতে পারিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই চন্দনারায়ণ ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নে দয়ারাম রায়কেও ডাকিয়া আনা হইল। রাজবৈদ্য সেই দিনই যথাবিধি চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যতই অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল, জ্বর ততই বৃদ্ধি পাইল।

ভবানী সেই যে বসিয়াছিলেন; একই ভাবে স্বামীর চরণতলে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি কাটিল; প্রভাত হইল; বেলা বাড়িতে লাগিল; কিন্তু জ্বরের নিবৃত্তি ঘটিল না! আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, ভবানী একই ভাবে পতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন

দ্বিতীয় দিনে পীড়া বড়ই বৃদ্ধি পাইল। জরের প্রাখর্য্যে রামকান্ত রায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। কবিরাজ আশ্বাস দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন,—"ভয়ের কারণ কিছুই নাই; জর কমিলেই সংজ্ঞলাভ হইবে।" এই বলিয়া বুঝাইয়া, সকলেই ভবানীকে আহারাদির জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভবানীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তিনি একদণ্ডও স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। এই ভাবে দ্বিতীয় রাত্রিও কাটিয়া গেল।

তৃতীয় দিবস প্রভাতে একবার ক্ষণেকের জন্য রামকান্ত রায়ের সংজ্ঞা হইল। অনেকে মনে করিলেন,—সুরাহা হইয়াছে। কিন্তু সে যে কিছুই নয়।—সে যে স্তিমিতপ্রায় দীপশিখার শেষ-দীপ্তি! তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সংজ্ঞা লাভ করিয়া, রাজা রামকান্ত রায় অন্যান্য সকলকে ক্ষণকালের জন্য ঘর হইতে অন্তরে যাইবার ইঙ্গিত করিলেন। একমাত্র ভবানী ভিন্ন সকলে অন্তর্হিত হইলে, অশ্রুপূর্ণনয়নে ভবানীর পানে চাহিতে চাহিতে রামকান্ত রায় কহিলেন,—"ভবানী! আমি চলিলাম! এ জীবনে এই শেষ দেখা; আর এ জীবনে আমার এই শেষ অনুরোধ,—আমার লোকান্তরে তুমি বিচলিত হইও না! এখন আমার সঙ্গে যাইবারও আকাঙ্ক্ষা করিও না। তোমার করুণায় এ রাজ্যের অনেক অনাথ আতুর প্রতিপালিত হইতেছে। তুমি যদি এখন আমার সঙ্গে এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাও, তোমার সেই শত শত সন্তানের প্রতি কে চাহিয়া দেখিবে? আমার অনুরোধে তুমি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিও; জগতে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ শিক্ষা দিও।"

রামকান্তের এক একটী বাক্য ভবানীর হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"আমার যে এ সর্ব্বনাশ হইবে, আমি সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু আমার কেন সঙ্গে

যাইতে নিষেধ করিতেছেন? আমি আপনার পরিচর্য্যায় শত ত্রুটী করিয়াছি। আমায় মার্জ্জনা করুন, আমায় ক্ষমা করুন, আমায় সঙ্গে লউন।"

রামকান্ত রায় আবার কহিলেন,—"মা ভবানী! এখনও তোমার কার্য্যের শেষ হয় নাই। তোমার কত আশা—কত আকাঙ্ক্ষা! আমি কিছুই তো পূরণ করিতে পারি নাই। এই দীর্ঘ বিংশাধিক বৎসর কাল, তোমাকে পাইয়া আমি সুখী ছিলাম, তাহার তুলনায় আমার নিকট স্বর্গও অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু জেনো ভবানী! তোমাকেও আমি সঙ্গে লইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছি; কেন না, তোমার অন্তরে অন্তরে যে সকল শুভ অনুষ্ঠানের বীজ নিহিত আছে;—অঙ্কুরিত মুকুলিত হইলে, তদ্দ্বারা জগতের অশেষ উপকার সাধিত হইবে। ভবানী। আমি আর অধিক কথা কহিতে পারিতেছি না। তুমি এস, আমার কোলের কাছে একবার এস, তোমায় একবার শেষ আলিঙ্গন করি।"

ভবানীর ক্রন্দন কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। শত চেষ্টা করিয়াও ভবানী মনের উদ্বেগ নিবারণ করিতে পারিলেন না।

রামকান্ত রায় পুনরায় কহিলেন,—"তুমি ধৈর্য্য ধর। আমি আবার বলিতেছি, তুমি উতলা হইও না। আমি বুঝিতেছি; আর অল্পক্ষণ আমার আয়ুষ্কাল। তুমি একটু অবসর দাও; আমি সকলের সমক্ষে তোমার কথা বলিয়া যাই।"

এই বলিয়া, ভবানীর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, রামকান্ত রায় আপনিই চীৎকার করিয়া, বহিঃস্থিত আত্মীয়-স্বজনকে আহ্বান করিলেন। তখন সেই শয়নকক্ষে দয়ারাম রায়, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়াও রামকান্ত রায় সেই একই কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি

বলিলেন,—"আমি পোষ্যপুত্রগ্রহণের অনুমতি দিলাম। ভবানীর ইচ্ছাক্রমে এই রাজ্যের সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ভবানী ইচ্ছা করেন,—আমার ভাবী জামাতাকেও এই রাজ্য অর্পণ করিতে পারেন।" এই বলিয়া, একবার কন্যা তারাসুন্দরীকে কোলের কাছে ডাকিয়া আনিলেন। দয়ারাম রায় প্রভৃতি সকলেই সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি উতলা হইতেছ কেন? আজ তোমার শরীর অনেক ভাল আছে। দুই এক দিনের মধ্যেই আরোগ্যলাভ করিবে।"

"সে আশা আর বৃথা।" এই বলিয়া রামকান্ত রায় মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন।

* * * *

সেই দিনই অপরাহ্ণে 'দুর্গা' নাম জপ করিতে করিতে রামকান্ত রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। "হায় কি হইল"—বলিয়া ভবানী শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কন্যা তারা-সুন্দরী পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। পৌরজন সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। নগরে নিদারুণ শোকধ্বনি উত্থিত হইল।

ভবানী সহমরণে যাইবেন, মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীর নিষেধ-বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বিরত হইতে হইল। বিশেষতঃ এই সময়ে, কাশিম-বাজারে মহারাষ্ট্র-মহিলার সহমরণের স্মৃতি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠায়, গুরুদেবের উপদেশের কথাও মনে পড়িতে লাগিল। সেদিনও সহমরণ-সম্বন্ধে রামকান্ত রায়ের সহিত রঘুনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের যে প্রশ্নোত্তর চলিয়াছিল, ভবানী অন্তরালে থাকিয়া তাহা সমস্তই শুনিয়াছিলেন। সে কথা তাঁহার হৃদয়ে গ্রথিত ছিল। ভবানীর গুরুদেব সে দিন যে বলিয়া-

ছিলেন,—"পতিবাক্যই সতীর প্রতিপাল্য"; সেই কথাই এখন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠিল। ভবানীর সহমরণে যাওয়া ঘটিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুষ্ঠান।

মহারাণী ভবানীর ব্রত-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গুরু-পুরোহিত আত্মীয়-স্বজন প্রায় সকলেই নাটোর-রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সকলের উপস্থিত-কালেই রাজা রামকান্ত রায়ের লোকান্তর ঘটিয়াছিল। সুতরাং সকলের নিকট স্বস্থানে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি ইহধাম হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। মহারাজের মৃত্যুর পরও তাঁহাদিগকে নাটোরে অবস্থিতি করিতে হইল। দয়ারাম রায় প্রভৃতির অনুরোধে তাঁহারা সে সময় নাটোর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। কেহ বা ভবানীকে সান্ত্বনা দানের জন্য, কেহ বা রাজার আদ্যশ্রাদ্ধের আয়োজনের জন্য বিব্রত রহিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই শোকতাপ পরিহার করিতে হইল। ভবানী যতই অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহার গুরুদেব রঘুনাথ তর্কবাগীশ তাঁহার মনঃস্থৈর্য্য-সম্পাদনের জন্য ততই সদুপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন বুঝাইতে বুঝাইতে তিনি ভবানীকে কহিলেন,—"মা! আর বৃথা কেন শোক করিতেছ? রাজা রামকান্ত রায় স্বর্গে গিয়াছেন। স্বর্গ হইতে তিনি তোমার কার্য্য-পরম্পরা লক্ষ্য করিতেছেন। মা! তুমি কি তাঁহার শেষ আদেশ বিস্মৃত হইলে?"

কি জানি কেন, সেই দিন ভবানীর যেন চমক ভাঙ্গিল। ভবানী উত্তর দিলেন,—"গুরুদেব! সে উপদেশ স্মরণ আছে বটে; কিন্তু মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না!"

রঘুনাথ তর্কবাগীশ আবার কহিলেন,—"না মানিলেই বা চলিবে কেন? সকলই কর্ম্মফল! ইহসংসারে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভোগ শেষ হইলেই আমরা আপন-আপন স্থলে চলিয়া যাইব! রাজা রামকান্ত রায়ের কর্ম্ম-ভোগ শেষ হইয়াছিল, তিনি চলিয়া গেলেন। আমাদের কর্ম্ম-ভোগ শেষ হইলে, আমরাও চলিয়া যাইব। মা! তুমি বৃথা ব্যাকুলা হইতেছ কেন? বিশেষতঃ যিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের এখনও শেষ হয় নাই। আমাদের ত্রুটিতে পাছে পরলোকে তাঁহার কোনরূপ অতৃপ্তি ঘটে, আমার সদাই সেই আশঙ্কা। তাই মা তোমায় আবার বলিতেছি,—"তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর; হৃদয়ে শক্তিসঞ্চয় কর। এ সময় তুমি এত উতলা হইলে, তোমার পতি-দেবতার পারলৌকিক কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। তাহার জন্যও অন্ততঃ এ সময় তোমার চিত্তস্থৈর্য্য আবশ্যক।"

পতির পারলৌকিক কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিতে পারে—এই কথা শুনিয়া ভবানীর প্রাণটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। ভবানী উত্তর দিলেন,—"গুরুদেব! আপনি যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য। আমি ঘোর নারকী; তাই এখনও আমি তাঁহার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই। যাহা হউক, আপনার কথায় এবার আমার জ্ঞান-সঞ্চার হইল। সত্য সত্যই তো—আমি এ করিতেছি কি?"

রঘুনাথ তর্কবাগীশ কহিলেন,—"সে জন্য অনুশোচনায় প্রয়োজন নাই। এখনও সময় অতীত হয় নাই। এখনও চিত্ত স্থির করিলে, অনায়াসেই আমরা তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন

করিতে পারিব। মা! তুমি বুদ্ধিমতী; তোমাকে আমি আর বেশী কি বুঝাইব? অর্দ্ধবঙ্গ আজ মা! তোমার মুখপানে চাহিয়া আছে। পতির পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, তুমি অন্নপূর্ণারূপে একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখ।"

ভবানী।—"আপনি যে প্রকার আদেশ করিতেছেন, মনকে এখন তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আপনার উপদেশ অনুসারে আমি সকল শোক-তাপ বিস্মৃত হইলাম।"

রঘুনাথ তর্কবাগীশ।—"যাহাতে তাঁহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহাই এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।"

ভবানী।—"কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, আদেশ করুন। আমার ইচ্ছা, তাঁহার পারলৌকিক-কার্য্যে কোন বিষয়ে যেন কোনরূপ অঙ্গহানি না হয়।"

তর্কবাগীশ মহাশয় কহিলেন,—"আমারও সেই ইচ্ছা। শাস্ত্রানুসারে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু করা প্রয়োজন, কোন বিষয়ে অঙ্গহানি রাখিব না। সময় সংক্ষেপ বটে; কিন্তু রাজধানীতে আমাদের অভাব তো কিছুরই নাই?"

ভবানী।—"অনেক দিন হইতে আমার কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা আছে। আপনার নিকট একদিন গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপদেশ শুনিয়াছিলাম। সেই হইতে কতকগুলি সদনুষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষা মনে উদয় হয়। মহারাজেরও ইচ্ছা ছিল—আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু অকালে তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন; তাই আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। তবে অন্তিমশয্যায় শয়ন করিয়া ইঙ্গিতে আমায় তিনি সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।"

রঘুনাথ তর্কবাগীশ উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি আকাঙ্ক্ষা মা তোমার? কি আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে চাও?"

ভবানী।—"আপনি ইষ্টাপূর্ত্ত সম্বন্ধে একদিন যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই কথাই কহিতেছি!"

রঘুনাথ তর্কবাগীশ উত্তর দিলেন,—"হাঁ হাঁ, আমার মনে পড়িয়াছে বটে। সে অনুষ্ঠানের এই এক উপযুক্ত অবসর। তাঁহার পারলৌকিক কার্য্যের সময় সেই অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। আমি তোমায় মহর্ষি মনুর যে বচনটী বলিয়াছিলাম; তাহার মর্ম্ম,—ইষ্ট অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম এবং পূর্ত্ত অর্থাৎ কূপ-দীর্ঘিকাদি খনন,—গৃহস্থের ধর্ম্ম। মনু বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধয়েষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্ধনৈঃ॥

অর্থাৎ 'শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বদা ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্ম করিবে। ন্যায়ার্জ্জিত ধন দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই উভয়বিধ কর্ম্ম করিলে, তাহা অক্ষয় ফলের কারণ হইয়া থাকে।' মা! তুমি যখন মনস্থ করিয়াছ, আমাদের উহা অবশ্যই কর্ত্তব্য। জলদান, বস্ত্রদান, অন্নদান, ইহা তো পারলৌকিক কর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য আছে। এ তুমি ভাল কথাই বলিয়াছ।"

ভবানী।—"বঙ্গদেশের নানাস্থানে জলকষ্টের কথা শুনিতে পাই। আমার ইচ্ছা—এই উপলক্ষে জল দান করি। আমার ইচ্ছা—এই উপলক্ষে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া দিই; একদিকে অন্নদান, বস্ত্রদান প্রভৃতির যেরূপ আয়োজন চলিবে; অন্যদিকে, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া, জলদানের ব্যবস্থা করিব।"

রঘুনাথ তর্কবাগীশ।—"মা! তোমার এই শুভসঙ্কল্প আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। জলাভাবে এক এক প্রদেশে লোকের

কষ্টের অবধি নাই। তৎপ্রতি তোমার যে দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহার অধিক আহ্লাদের বিষয় আমার আর কি হইতে পারে?"

ভবানী।—"আমার আরও কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু জানি না, সেগুলি এ ক্ষেত্রের উপযোগী কি না?"

রঘুনাথ তর্কবাগীশ।—"কি আকাঙ্ক্ষা মা! আমায় জানাইতে হানি কি?"

ভবানী।—"এই উত্তর-প্রদেশে ভাবদা-ভবানীপুরে মা-ভবানীর পীঠস্থান আছে। ঐ পীঠস্থানে সতীদেহের অংশবিশেষ পতিত হইয়াছিল। এতদ্দেশের বহু নরনারী সর্ব্বদা সেই পীঠস্থানে মা-ভবানীর পূজা দিতে যায়। কিন্তু মা'র নিকট যাইবার একটী ভাল পথ নাই। পথে কোথাও বিশ্রামের স্থান নাই। আমার বড় সাধ, আমি ভবানীপুরে যাইবার জন্ত একটী পথ প্রস্তুত করিয়া দিই;—আর সেই পথের মাঝে মাঝে পান্থ-নিবাস প্রতিষ্ঠা করি।"

তর্কবাগীশ মহাশয় মনে মনে কহিলেন,—"মা। ভবানীর স্বপ্নাদেশেই সাক্ষাৎ ভবানীরূপিণী মা-তুমি আত্মারামের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার কৃপায় ভক্ত নর-নারী মায়ের পূজায় সমর্থ হইবে,—ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে?" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"সে যে বড় ব্যয়-বাহুল্য ব্যাপার, সে দুর্গম পথ কি প্রকারে সুগম হইতে পারে?"

ভবানী।—"সে পথ সুগম করা যতটা কঠিন বলিয়া এখন মনে হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে ততটা কঠিন নহে। আমার পিত্রালয় ছাতিন-গ্রাম এই নাটোর রাজধানী হইতে দশ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। সে পর্য্যন্ত যাতায়াতে বিশেষ কোন কষ্ট নাই। পূর্ব্বে যে সামান্ত একটু অসুবিধা ছিল, আমার শ্বশুর মহাশয় তাহা দূর করিয়া গিয়াছেন। ছাতিন-গ্রাম হইতে আমার মাতুলালয় পাকুড়িয়া প্রায়

বার ক্রোশ। পাকুড়িয়া যাইবার পথে চৌগ্রাম অবস্থিত। চৌগ্রাম হইতে পাকুড়িয়ার পথ এখনও ভাল নহে। আমার ইচ্ছা,—চৌগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া পাকুড়িয়ার মধ্য দিয়া ভবানীপুর পর্য্যন্ত একটী সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দিই।"

রঘুনাথ তর্কবাগীশ।—"উদ্দেশ্য খুবই ভাল! আমাদের দেশের তীর্থক্ষেত্রসমূহ একে একে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এ অবস্থায় যদি দুই একটী তীর্থেরও সংস্কার-সাধন হয়, বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা আছে। তবে ঐ পথে স্থানে স্থানে জলাভূমি আছে, মাঝে মাঝে বন-জঙ্গল আছে; পথে কোথাও একটী পুষ্করিণী নাই যে, যাত্রিগণ জলপান করিতে পারে। এত অভাব দূর করা কি সম্ভবপর ?"

ভবানী।—"আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কল্পনা যদি কার্য্যে পরিণত হয়, আমি সে অভাব সমস্তই মিটাইয়া দিব। যেখানে জলাভূমি আছে, ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু প্রস্তুত করাইয়া দিব; যেখানে জলকষ্ট আছে, সোপানাবলি-বিশিষ্ট পুষ্করিণী প্রস্তুত করাইয়া দিব। তারপর, পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে পান্থশালা ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিব। যে পথ প্রস্তুত করাইব, আমার ইচ্ছা তাহার বিস্তার পনের হাতের কম না হয়। তদ্ব্যতীত, আমি ইচ্ছা করিয়াছি, সেই প্রশস্ত পথের উভয় পার্শ্বে নৌকা চলাচলের উপযোগী খাল কাটাইয়া দিব। যাঁহারা নৌকা করিয়া যাইবেন, তাঁহারা সেই খাল দিয়া অনায়াসে ভবানীপুরে যাইতে পারিবেন। আর যাঁহারা পাল্কীতে গাড়ীতে বা হাঁটিয়া যাইবেন, তাঁহারা ঐ স্থল-পথেই যাতায়াত করিতে পারিবেন।"

তন্ময় হইয়া, ভবানী ভবানীপুরে যাইবার পথের কথা কহিতেছেন; ইতিমধ্যে চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি পূর্ব্বেই ভবানীর কল্পনার কথা শুনিয়াছিলেন, এবং বরাবরই তাহাকে উৎসাহ দিয়া আসিতেছিলেন। আজ আপন গুরুদেবের নিকট ভবানীকে সেই মনোভাব ব্যক্ত করিতে দেখিয়া, তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। ভবানী তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, ভবানীকে তিনি "মহারাণী" বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। ভবানীর কথার পোষকতা করিয়া, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর কহিলেন,—"মহারাণীর আশাহর্ষিকণমধ্যে রাজা রামকান্ত রায়ও আমার নিকট এই প্রস্তাব জানাইয়াছিলেন। আমরা ব্যয়াদির হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলাম; ইতিমধ্যেই তাঁহার স্বর্গলাভ হইল।"

তর্কবাগীশ মহাশয় উৎসাহ জানাইয়া কহিলেন,—"এ সদনুষ্ঠানে [illegible] হবে দিন সংক্ষেপ; শ্রাদ্ধের মধ্যে উহাতে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিপর বলিয়া মনে হয় না। উপস্থিত কার্য্য সমাধান পর ভবানীপুরের পথ-নির্ম্মাণের আয়োজন করিলে, আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইব। তীর্থ-স্থান রক্ষা,—এ তো হিন্দুরই উচিত কর্ম্ম।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর উত্তর দিলেন,—"তবে আরও একটু শুনুন। মহারাণী আপনাকে বলিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু তীর্থ-স্থান-রক্ষা যে হিন্দুর উচিত কর্ম্ম, মহারাণী অনেক দিন হইতেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। রাজা রামকান্ত রায় যেবার তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন; আপনিও সঙ্গে ছিলেন, আমিও সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু মনে আছে কি,—ভবানী আমাদের নিকট তখন কি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন?"

রঘুনাথ তর্কবাগীশ।—"ভবানীর কত আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়াছিলাম; তুমি কোন্ আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিতেছ?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর আবেগভরে উত্তর দিলেন,—"মনে হয় কি—কাশীধামে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার মন্দির দর্শন করিবার সময় মহারাণী

ছলছল নেত্রে কি বলিয়াছিলেন? মনে হয় কি—মহারাণী যখন দেখিলেন, আওরঙ্গজেব বাদশাহ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উপর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তখন কি বলিয়াছেন? আরও মনে হয় কি—আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ৺কাশীধাম বিপর্য্যস্ত বিধ্বস্ত হইয়াছে দেখিয়া, কাশীর পরিচয়-চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে বুঝিয়া, মহারাণী কি বলিয়াছিলেন?

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের উত্তেজনাময়ী উক্তিতে তর্কবাগীশ মহাশয়ের মনে পুরাতন স্মৃতি দীপ্তরাগে জাগিয়া উঠিল। ভবানীরও হৃদয় উৎসাহ-আবেগে পরিপূর্ণ হইল। ভবানী আপনা হইতেই কহিলেন,—"আমি সে পরামর্শও এখনই জিজ্ঞাসা করিতাম। ভাল, সে সম্বন্ধেও এখন কোন পরামর্শ করা যায় না কি?"

তর্কবাগীশ মহাশয় কহিলেন,—"কিরূপভাবে কি করিতে চাও, সকল কথা আমি অবগত নই। তোমার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিতে পারিলে আমি যথাজ্ঞান উত্তর দিতে পারি।"

ভবানী।—"আমার ইচ্ছার কথা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জানাইয়া ছিলাম কি না, আমার স্মরণ হয় না। কিন্তু আজ আপনাকে আমার সেই আকাঙ্ক্ষা জানাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। ৺কাশীধামে এখন ঘোর বিশৃঙ্খলা। কাশীর সীমানাই এখন নির্দ্দিষ্ট নাই। অন্নপূর্ণার লীলানিকেতন অন্নক্ষেত্র—এখন অন্নশূন্য। আমার তাই আকাঙ্ক্ষা,—আমরা শাস্ত্রানুসারে কাশীর এরণ্ডপত্রাকৃতি সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া প্রতি সীমাস্থানে শিবস্থাপনা করি, সঙ্গে সঙ্গে কাশীতে দুর্গামন্দির ও অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া দিই।"

তর্কবাগীশ মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উত্তর দিলেন,—"মা তা' যদি করিতে পার, সত্যই ধর্ম্ম রক্ষা করা হয়, আমি আশীর্ব্বাদ করি. তোমার ভবানী নাম সার্থক হউক।"

ভবানীর আবার পুরাণ কথা মনে পড়িল। ভবানী বিচলিতা হইয়া কহিলেন,—"মহারাজেরও বড়ই ইচ্ছা ছিল,—আমার সাবিত্রী-ব্রত প্রতিষ্ঠার পর সেই বৎসরই তিনি কাশীধাম সম্বন্ধে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু হায়, আমি রাক্ষসী। অকালেই তাঁহাকে গ্রাস করিয়া বসিলাম!"

ভবানী আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় সান্ত্বনাচ্ছলে কহিলেন,—"মা! আবারও তুমি বিচলিত হইলে? মহারাজের পারলৌকিক কার্য্যের এখনও যে কোনও আয়োজন হয় নাই। তবে কি কার্য্য পণ্ড হইবে?

ভবানী আত্মসংবরণ করিয়া উত্তর দিলেন,—"না—না। আমি কাঁদিব না। কি করিলে ভাল হয়, আপনারা পরামর্শ করিয়া স্থির করুন। আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমাকে আর জিজ্ঞাসা না করিয়া যাহা করিতে হয়, আপনারাই ব্যবস্থা বন্দোবস্ত স্থির করুন।"

তখন স্থির হইল,—আপাততঃ উপস্থিত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ক্রমশঃ একে একে ভবানীর আকাঙ্ক্ষা-সমুদয় পূরণ করা হইবে। তদনুসারে চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর ও তর্কবাগীশ মহাশয় উভয়ে মিলিয়া রাজা রামকান্ত রায়ের পারলৌকিক কার্য্যের উদ্‌যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য,—দয়ারাম রায়ও তাঁহাদের পরামর্শে একমত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সিরাজ উদ্দৌলা।

মহারাজ রামকান্ত রায়ের লোকান্তরের পর মহারাণী ভবানী যখন নাটোর-রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন, তাহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালার মসনদ-পার্শ্বে নবাব আলিবর্দ্দীর স্নেহময় ক্রোড়ে এক স্নেহ-পুত্তলি পরিপুষ্ট হইতেছিল।

নবাব আলিবর্দ্দীর পুত্র সন্তান ছিল না। উপর্য্যুপরি তাঁহার তিনটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল। আপন ভ্রাতা হাজি আহম্মদের তিন পুত্রের সহিত তিনি সেই তিন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

নওয়াজেস্ মহম্মদের সহিত আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসেটি-বিবির বিবাহ হয়। মধ্যমা কন্যাকে সৈয়দ বিবাহ করেন। কনিষ্ঠা আমিনা (আয়মানা) বিবিকে জৈনুদ্দীন বিবাহ করিয়াছিলেন। নওয়াজেস্ ঢাকার, সৈয়দ পূর্ণিয়ার এবং জৈনুদ্দীন পাটনার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। আলিবর্দ্দির কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বিবির গর্ভে জৈনুদ্দিনের এক পুত্র-সন্তান হয়। পুত্রের নাম—মির্জ্জা-মহম্মদ। নবাব আলিবর্দ্দী দৌহিত্র মির্জ্জা-মহম্মদকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি তাই তাহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। সেই হইতে মির্জ্জা-মহম্মদ 'সিরাজ উদ্দৌলা' নামে অভিহিত হন।

আলিবর্দ্দী যখন পাটনার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় সিরাজউদ্দৌলার জন্ম হয়। দৌহিত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন দেখিয়া, আলিবর্দ্দী দৌহিত্রকে আপন পুত্র-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দৌহিত্র স্বভাবতই স্নেহের সামগ্রী; তাহার উপর আবার,

তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভাগ্য-দেবী সুপ্রসন্ন,—সুতরাং আলিবর্দ্দীর নিকট সিরাজউদ্দৌলার আদরের আর অবধি রহিল না। আলিবর্দ্দী আদরে আদরে সিরাজউদ্দৌলাকে মাথায় তুলিয়া বসিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৌহিত্রের কুপ্রবৃত্তি স্ফুর্ত্তি-প্রাপ্ত হইল। আলিবর্দ্দী তাহা দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইলেন না।

দৌহিত্র জিদ্ ধরিল,—স্বতন্ত্র ভবনে বাস না করিলে, তাহার আনন্দে—অন্তরায় ঘটে। আলিবর্দ্দী অমনি তাহার জন্য "হীরাঝিল" প্রমোদ-উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন; ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে লতা-নিকুঞ্জ-শোভিত বিচিত্র-কারুকার্য্য-সমন্বিত বিলাস-ভবন প্রস্তুত হইল। উচ্ছৃঙ্খল যুবক যথেচ্ছভাবে আপন পাপপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার অবসর পাইল।

প্রশ্রয় দিয়া আলিবর্দ্দী দৌহিত্রের প্রতাপ দিন দিন এতই বাড়াইয়া তুলিলেন যে, শেষে পদে পদে আপনাকেই বিড়ম্বিত হইতে হইল। একদিনের একটী ঘটনা বলি। সিরাজের নিত্য টাকায় প্রয়োজন। নবাব সরকার হইতে তিনি যে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হন, বিলাস-ব্যসনের উদ্দাম তরঙ্গে দুই দিনেই তাহা ভাসিয়া যায়। সুতরাং সর্ব্বদাই টাকার অভাব—টাকা নহিলে আর চলে না! কিন্তু সেরূপ অপব্যয়ের জন্য আলিবর্দ্দী আর কত টাকা যোগাইবেন? সহজে যথেচ্ছভাবে টাকা পাওয়া যায় না দেখিয়া, সিরাজউদ্দৌলা এক কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। "হীরাঝিল" প্রমোদ উদ্যানে একদিন তিনি নবাব আলিবর্দ্দীকে এবং দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। সেখানে—এক গোলকধাঁধা প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রাসাদ দেখাইবার ভাণ করিয়া সেই গোলোকধাঁধায় লইয়া গিয়া, সিরাজ-উদ্দৌলা আলিবর্দ্দীকে আবদ্ধ করিলেন। আলিবর্দ্দী সেই গোলোক-ধাঁধার যেদিকে যান, সেই দিকেই দেখিতে পান, দ্বার রুদ্ধ; সেই

দিকেই শুনিতে পান,—সিরাজ খল খল করিয়া হাসিতেছে। আলিবর্দ্দী প্রথমে মনে করিয়াছিলেন,—দৌহিত্র বিদ্রূপ করিতেছে, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার অনুনয়—বিনয়েও সিরাজ যখন দ্বার খুলিলেন না; বিশেষতঃ উপযুক্তরূপ অর্থদণ্ড না পাইলে মুক্তিদানে সম্মত হইলেন না; আলিবর্দ্দীকে তখন প্রমাদ গণিতে হইল। সে অবস্থায় সিরাজের প্রার্থিত অর্থই বা কি প্রকারে সংগ্রহ হওয়া সম্ভব পর? দেশের জমিদার বর্গ—যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন; সে কথা শুনিলে, তাঁহারাই বা কি মনে করিবেন? আলিবর্দ্দী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু উপায় নাই। সিরাজ কহিলেন,—জমিদার-দিগের যাঁহার সঙ্গে যে পরিমাণ টাকা বা মূল্যবান্ দ্রব্য আছে; আপনার মুক্তির জন্য তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করিতে বলুন। নগদ টাকা ভিন্ন কোন ক্রমেই আপনার মুক্তি নাই।" নবাব আলিবর্দ্দী কি করিবেন? অগত্যা সিরাজের প্রস্তাবেই তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। তখন জমিদারগণের যাঁহার নিকট যাহা ছিল, সংগৃহীত হইয়া, ৫০১১৯৭ টাকার সংস্থান হইল। সেই টাকা পাইয়া সিরাজউদ্দৌলা আলিবর্দ্দীকে মুক্তি দিলেন; কিন্তু মুক্তি পাইয়া সকলের নিকট উপস্থিত হইয়া আলিবর্দ্দী দৌহিত্রের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সেরূপ ভাবে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন—তখন আর তাঁহার উপায়ান্তরই বা কি ছিল? কথায় বলে—"কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকা।" এক্ষেত্রে আলিবর্দ্দীকেও সেইরূপ কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকিতে হইয়াছিল। ইতিহাসে প্রকাশ,—আলিবর্দ্দীর এই জরিমানার টাকা শেষে সিরাজউদ্দৌলার বার্ষিক বৃত্তি রূপে পরিণত হয়। আর সেই বৃত্তির টাকা জমিদারগণই বৎসর বৎসর সরবরাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং উহা "মনসুরগঞ্জ নজরানা" নামে অভিহিত হইয়াছিল। একদিকে বিলাসিতার প্রশ্রয়দান, অন্যদিকে নৃশংসতায় উত্তেজনা,

আলিবর্দ্দী নানা প্রকারেই দৌহিত্রের মস্তক চর্ব্বণ করিয়াছিলেন! সে জন্য আলিবর্দ্দীকেও শেষ-জীবনে যথেষ্ট অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শনে যে কঠোরতর আবশ্যক, স্নেহ ভালবাসার উদ্দাম তরঙ্গে সে কঠোরতা ভাসাইয়া দিলে তাহার যে বিষময় পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে তাহার পূর্ণ-নিদর্শন।

মাতামহের আদরে সিরাজউদ্দৌলা পাপ পুণ্যে তৃণ-তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। পরদার হরণ, নর-হত্যা প্রভৃতি অনেক সময় তাঁহার অঙ্গের আভরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন কি, সময়ে সময়ে তিনি কুলের কুলবধূর প্রতি অত্যাচার করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চরিত্র।

বিলাস-লালসার পরিতৃপ্তি নাই। বরং তাহাতে নিত্য নিত্য নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা উদয় হয়।

সিরাজেরও বিলাস-লালসার পরিতৃপ্তি হইল না। তাঁহার প্রমোদ-ভবন নিত্য-নূতন সুন্দরীগণে পরিপূর্ণ হইল; কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল কৈ? রূপ মোহে মুগ্ধ হইয়া, তিনি মাতামহের এক ক্রীতদাসীকে বিবাহ করিলেন। লুৎফ-উন্নেসা বা 'প্রিয়তমা মহিষী' নামে তিনি অভিহিত হইলেন। পতিব্রতা সাধ্বী সতীর ন্যায় লুৎফ-উন্নেসা সিরাজের চরণে আত্মদান করিলেন। কিন্তু তাহাতেও সিরাজের তৃপ্তি হইল না, সিরাজ শুনিলেন,—দিল্লীতে এক বাইজী আছে; তাহার নাম—ফৈজী; সে নাকি পরম রূপবতী। সিরাজ

অমনি তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া, বহু অনুনয়-বিনয়ে, ফৈজীকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করা হইল। বার-বিলাসিনী ফৈজী সিরাজের অন্তঃপুর বাসিনী হইলেন। সিরাজ তাঁহার রূপ-মোহে পাগল হইয়া পড়িলেন। দিন কতক সে কি প্রেম, কি ভালবাসা! সে প্রেমের স্রোতে লুৎফ-উন্নেসা কোথায় ভাসিয়া গেল! কিন্তু সিরাজ বুঝিলেন না;—বারবিলাসিনী কখনও প্রণয়-পাত্রী হইতে পারে না।

একদিন হঠাৎ সিরাজের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। সিরাজের একজন পার্শ্বচর ফৈজীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল; কিন্তু কোন প্রকারেই ফৈজীকে প্রলোভিত করিতে পারে নাই। সুতরাং তাহার হৃদয়ে ঈর্ষানল জ্বলিতে ছিল। সে এক দিন সিরাজকে দেখাইয়া দিল,—ফৈজীর প্রকোষ্ঠ হইতে সৈয়দ মহম্মদ খাঁ বাহির হইয়া গেলেন। মহম্মদ খাঁ—সিরাজের ভগিনীপতি। সুন্দর বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ।

সিরাজ তদ্দণ্ডেই ফৈজীকে ডাকাইয়া আনিলেন; রোষ-কষায়িত-লোচনে তীব্রবচনে কহিলেন,—"নিমকহারাম। বেইমান মহাম্মদ খাঁ তোর ঘরে কেন প্রবেশ করিয়াছিল?

ফৈজী অনেকক্ষণ উত্তর দিতে পারিল না, মস্তক অবনত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সিরাজ পুনরায় কহিলেন,—চুপ করিয়া রহিলি যে হারামজাদি?

ফৈজী এবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ফৈজী উত্তর দিল,—আমায় যা বলিবে বল। আমার বাপ মা তুলো না।

ফৈজী একটু রুক্ষস্বরেই সিরাজের মুখের উপর এই উত্তর দিল!"

এতদূর আস্পর্দ্ধা! সিরাজের মুখের উপর এই উত্তর!

সিরাজের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সিরাজ কহিলেন,—"বিশ দফে কহেঙ্গে। সরম নেহি হ্যায় শূয়ারকা বেটী।"

কৈজী সহিতে পারিল না। সে উত্তর দিল,—মুখ সামলে কথা কবে। কেয় কিছু বলুলে সমান উত্তর শুনবে।"

সিরাজ ক্রমেই অধিকতর অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখে যাহা আসিল, তিনি তাই বলিয়া কৈজীকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। তিনি আবারও তাহাকে বেইমান, নিমকহারাম বলিলেন; তিনি আবারও তাহাকে শূয়রকা বেটী, হারাম জাদি বলিয়া গালি দিলেন; অধিকন্তু বারবিলাসিনী বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন।

কৈজীর রাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সিরাজের শেষ কথায় কৈজী বিশেষরূপ রুষ্ট হইয়া উত্তর দিল,—"আমি বারবিলাসিনী; বারবিলাসিনীর মত কাজ করিয়াছি। কিন্তু তোমার জননী আমিনা বিবি কি করিতেছেন, খোঁজ লইয়াছ কি? আমাকে তিরস্কার করিবার পূর্ব্বে আপনার জননীকে তিরস্কার করা উচিত ছিল। যাহার জননী ব্যভিচারিণী, সে আবার বারবিলাসিনীর নিকট সতীত্বের আশা করে? ধিক্!"

সিরাজের চক্ষু ফাটিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সিরাজ ডাকিলেন কোই,—'কোই হায়!"

দুইজন খোজা কুর্ণিশ করিতে করিতে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সিরাজ বলিলেন,—"এই বাঁদীর হাত-পা বাঁধিয়া ফেল।"

"যো হুকুম খোদাবন্দ" বলিয়া, তাহারা কৈজীকে বাঁধিয়া ফেলিল;

তারপর অপর দুইজন অনুচরকে ডাকাইয়া, সিরাজ হুকুম দিলেন,—"বাগানের কোণে যে ছোট কুটুরী আছে, সেই কুটুরীর মধ্যে এই বাঁদীকে এখনই লইয়া চল। কুটুরীর মধ্যে উহাকে রাখিয়া এখনই ইষ্টক দ্বারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাও।"

একজন অনুচর জিজ্ঞাসা করিল,—"এই রাত্রেই!"

সিরাজ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন,—"হাঁ! এই রাত্রেই। প্রকোষ্ঠের দুয়ার-জানলা যে কোনও অবকাশ-পথ আছে, এই রাত্রের মধ্যে সমস্ত ইট দিয়া গাঁথিয়া ফেলিতে হইবে। যেন বায়ু-প্রবেশের ছিদ্র পর্য্যন্ত না থাকে। ইহাই আমার আদেশ।"

তাহাই হইল। সেই রাত্রিতেই হতভাগিনী ফৈজী বায়ুসমাগম-শূন্য প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হইল। সিরাজউদ্দৌলা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া ভৃত্যগণের আদেশ-প্রতিপালন দেখিতে লাগিলেন।

যে ফৈজীর এত আদর ছিল; যে ফৈজী সিরাজের হৃদয়-সিংহাসনে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; সেই ফৈজীর এই পরিণাম বিহিত হইল। যে ফৈজীর সৌন্দর্যকাহিনী দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল; যে ফৈজীকে হৃদয়েশ্বরী করিবার জন্য বহু আমীর-ওমরাহ পাগল হইয়াছিলেন; সেই ফৈজীর এই হইল।

তিন মাস পরে সিরাজউদ্দৌলা একদিন কৌতুকচ্ছলে সেই প্রকোষ্ঠের একদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিবার হুকুম দিলেন। প্রাচীর ভাঙ্গিলে দেখা গেল,—ফৈজী চলিয়া গিয়াছে; তাহার কঙ্কাল কয়-খানি পড়িয়া আছে। সুন্দরী ফৈজী জীবিত অবস্থায় ওজনে বাইস সের ছিল; পুষ্পিতা লতিকার ন্যায় কৃশাঙ্গীর শোভা বিকশিত ছিল। কিন্তু যেদিন প্রকোষ্ঠ-প্রাচীর ভগ্ন করিয়া তাহার কঙ্কাল মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল, সেদিন সকলই ছায়াবাজী বলিয়া মনে হইতে লাগিল! মানুষের রূপ বা সৌন্দর্য্য—সকলই ছায়াবাজী।

কিন্তু যাউক সে কথা। ফৈজী চলিয়া গেল বটে; কিন্তু সিরাজের হৃদয়ে যে বিষ ঢালিয়া দিয়া গেল, সিরাজ সেই বিষের জ্বালায় অহরহ জ্বলিতে লাগিলেন। ফৈজী সিরাজের জননীর চরিত্রে গভীর কলঙ্ক অঙ্কন করিয়াছিল। সে কলঙ্ক সিরাজ কিরূপে ক্ষালন করি-

বেন? সে ত মিথ্যা নয়। ফৈজী যাহা বলিয়া গিয়াছে, সে যে বর্ণে বর্ণে সত্য। ফৈজীর মৃত্যুর পর সিরাজের চিত্ত সেই চিন্তায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সিরাজ বুঝিলেন,—সে সর্ব্বনাশের মূল হোসেন কুলী খাঁ! সিরাজের জ্যেষ্ঠা মাতৃস্বসা ঘেসেটি বিবি—সেই হোসেন কুলীর প্রণয়ে পদস্খলিত কলুষিতা হইয়াছিলেন, এখন আবার সিরাজের জননী আমিনা বিবিও—সেই হোসেন কুলীর প্রণয়পাশে পড়িয়া আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কথাটা বহুদিন গোপনেই ছিল। কিন্তু ঘেসেটি বিবিকে বঞ্চিত করিয়া যে দিন হইতে হোসেন কুলী আমিনা বিবির প্রণয়প্রার্থী হয়, এবং যে দিন ঘেসেটি বিবি তাহা বুঝিতে পারেন, সেই দিনই হোসেন কুলীর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত। দুশ্চরিত্রা রমণী আপন প্রণয়ীকে অন্যের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দেখিলে, হিংসায় জ্বলিয়া উঠে; এমন কি, সেই প্রণয়ীর মৃত্যু-কামনায় কুণ্ঠিত হয় না। হোসেন কুলীর সম্বন্ধে ঘেসেটি বিবিরও সেই ঈর্ষা উপস্থিত হইল। হোসেন কুলীর উচ্ছেদ-সাধনে ক্রমে ঘেসেটি বিবিও সিরাজের সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। নবাব আলিবর্দ্দী ও তাঁহার বেগম, উভয়েই কন্যাদ্বয়ের চরিত্রদোষের জন্য মনে মনে ক্ষুণ্ণ ছিলেন; উভয়েই হোসেন কুলীকে ইহসংসার হইতে অপসারিত করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন।

সিরাজের প্রতি ফৈজীর ভর্ৎসনায় সেই সুযোগ আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। সিরাজ আপনিই সে প্রতিশোধ প্রদান করিলেন! হোসেন কুলীর হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইল। ভৃত্যগণ হোসেন কুলীর খণ্ড-বিখণ্ড দেহ হস্তিপৃষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া নগরের পথে পথে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। হোসেন কুলী ঢাকার শাসনকর্ত্তা নোওয়াজেস মহম্মদের দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন। তাঁহারই নিকট ঢাকার ধনভাণ্ডার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু ঘেসেটি বিবি প্রতিবাদী হওয়ায় কি

নোওয়াজেস, কি আলিবর্দ্দী, হোসনকুলীর হত্যাকাণ্ডে কেহই কোনরূপ দুঃখপ্রকাশ করিলেন না। বরং সিরাজের কার্য্যে মনে মনে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন! ফলে সিরাজের স্পর্দ্ধা দিন দিনই বাড়িয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আবার পরীক্ষা।

যথাসময়ে রাজা রামকান্ত রায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহার দানসাগর শ্রাদ্ধে ভবানী দশ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিলেন। সেই উপলক্ষে আর আর যে সদনুষ্ঠানের আয়োজন হইল'—তাহার ব্যয় পরিমাণ কে নির্দ্দেশ করিতে পারে? ভবানীর প্রাণে বহু দিন হইতে যে আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল; এখন একে একে তিনি সেই সকল সদনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিলেন।

এই যে উত্তর বঙ্গে বহুতর প্রাচীন সরোবর ও দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয় উহার অধিকাংশই সেই সদনুষ্ঠানের ফল। ঐ যে সুপরিসর রাজ-পথ চৌগ্রাম হইতে বাহির হইয়া পাকুড়িয়ার মধ্য দিয়া ভবানীপুরের পীঠস্থানে মিলিত হইয়াছে; ঐ যে পথের দুই পার্শে নৌকা চলাচলের জন্য প্রণালী রহিয়াছে; আর ঐ যে স্থানে স্থানে শিবালয় ও পান্থ-নিবাসসমূহের ভগ্নস্তূপে অতীত-গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি বিদ্যমান আছে; সকলই মহারাণী ভবানীর পুণ্যকীর্ত্তি। উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ "ভবানী জাঙ্গাল"— মহারাণী ভবানীরই পুণ্যকীর্ত্তি।

কেবল কি উত্তর-বঙ্গে? মহারাজ রামকান্তের লোকান্তরের

পর ভারতের নানাস্থানে ভবানীর কীর্ত্তি-স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীশ্রী৺কাশী ধামে ঐ যে দ্বিতীয় অন্নপূর্ণালয় দুর্গাবাড়ী প্রতিষ্ঠিত; ঐ যে স্থানে স্থানে কাশীর সীমা-নির্দ্দেশক শিবস্থাপন দৃষ্ট হয়; উহা মহারাণী ভবানীর অদ্বিতীয় কীর্ত্তি! চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাত্মা নীলমণি ঠাকুরের পরিচর্য্যায়, কাশীধামে মহারাণী ভবানী ঐ সকল পুণ্যানুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন। কাশীর প্রসিদ্ধ 'নীল ভৈরব শিব'—সাধক নীলমণি ঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পতির পরলোকের পর, এইরূপ ভাবেই অন্নদান, জলদান, তীর্থস্থানরক্ষা প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে মহারাণী ভবানী প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছিলেন।

পতির পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপনান্তে, মহারাণী ভবানী ব্রহ্মচারিণী হইয়া গঙ্গাতীরবাসিনী হন। মুর্শিদাবাদের উত্তরে বড়নগরে গঙ্গার তীরে তাঁহাদের যে বাসভবন ছিল; এই সময় হইতে প্রায়ই তিনি সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে যে মধ্যে মধ্যে নাটোর রাজধানীতে যাতায়াত করিতেন, সে কেবল—কন্যা তারাসুন্দরীর মমতায়।

পতির লোকান্তরের পর তিনি স্থির করিয়াছিলেন,—কন্যা তারাসুন্দরীর বিবাহ দিয়া, জামাতার হস্তে রাজ্য-ভার অর্পণ করিয়া আপনি গঙ্গাতীরেই বসবাস করিবেন। এ বৎসর তাহারই জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। রাজা রামকান্ত রায় কন্যা তারাসুন্দরীর বিবাহের জন্য পাত্র স্থির করিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে, সেই বৎসরেই, দুই এক মাসের মধ্যেই তারাসুন্দরীর বিবাহ হইত। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার লোকান্তর ঘটায় বিবাহ এক বৎসর পিছাইয়া পড়িয়াছিল।

বৎসরান্তে শুভদিনে মহাসমারোহে তারাসুন্দরীর পরিণয়-কার্য্য

সম্পন্ন হইল। উপযুক্ত কুলীন দেখিয়া পাত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ভবানী সেই পাত্রে—খাজুরা-গ্রামের রঘুনাথ লাহিড়ীর হস্তে শুভ-মুহূর্ত্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বহুদিনের পর বিবাহের আনন্দ উৎসবে নাটোর-রাজধানী আবার আনন্দময় হইয়া উঠিল।

কিন্তু সে যেন বিজলীর চকিত চমক! ভবানীর প্রাণ-ভরা আশা—তাঁহার পতির শেষ ইচ্ছা—জামাতা রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু আবার বিধাতার কি বিষম পরীক্ষা! বিধাতা ভবানীর সে আশায়ও বাদ সাধিলেন। বিবাহের পর বৎসর কাটিল না; আদরের সোহাগের ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র উপভোগ করিবার পূর্ব্বেই জামাতা রঘুনাথ ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

পুত্র গিয়াছিল;—পতি গিয়াছিল;—কিন্তু কন্যা তারাসুন্দরীর মুখ চাহিয়া ভবানী সকল শোক চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। মনে করিয়া-ছিলেন,—তারার বিবাহ দিয়া জামতার মুখ দেখিয়া একে একে সকল শোক বিস্মৃত হইবেন। কিন্তু যে দিন জামাতা রঘুনাথও তাঁহার বক্ষে বজ্র হানিয়া চলিয়া গেল, সে দিন তিনি একবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

ভবানী যখনই শুনিলেন,—"রঘুনাথ জীবিত নাই;" তখনই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে, শুশ্রূষায় সংজ্ঞা হইলে কেবলই শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। পৌরজন প্রবোধ দিবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু মন প্রবোধ মানিবে কেন? বরং সে প্রবোধে, অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায়, জামাতৃ-শোকে পুরাতন শোক-স্মৃতি আরও জাগিয়া উঠিল। তখন, কখনও তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—তাঁহার স্নেহের কুমার পরলোক হইতে তাঁহাকে যেন ডাকিতেছে। তাই তিনি, যেন তাহার দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া, এক একবার "যাই-যাই বলিয়া উত্তর দিতে লাগিলেন। আবার, কখন, তাঁহার মনে হইতে

লাগিল,—রাজা রামকান্ত রায় স্বর্গ হইতে যেন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন,—সহ্য—সহ্য—সহ্য কর।” অমনি ভবানী চমকিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন,—“এ-এ, এখনও সহ্য করিতে হইবে। সংসারে আমার একমাত্র অবলম্বন—তারা। সেই তারার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। আমাকে আরও সহ্য করিতে হইবে?”

ভবানী অমনি যুক্তকরে ভগবান্‌কে ডাকিলেন,—“ভগবন! পতি-পুত্র দিয়াও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। আমার সুখের বালিকা তারাসুন্দরী,—আমার পাপে তাহার হৃদয়ে কেন এ শক্তিশেল হানিলে? যমযন্ত্রণা ভোগ করাইবার জন্য আমাকেই যদি সংসার হইতে না লইতে চাও, তারাকে কেন লইলে না! আমার পাপের ফলভোগ,—সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকাকে কেন করিতে হয়? আমার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কেন চির-জীবন শোকের তুষানলে দগ্ধ করিবে? আমার জামাতাকে না লইয়া, আমার কন্যাকে লইলে, আমার কখনও এত যন্ত্রণা অনুভূত হইত না। পতি-পুত্র গিয়াছে; স্মৃতির অন্তরালে আছে, কিন্তু এ যে চক্ষের সমক্ষে আগুন জ্বলিল,—চক্ষু ঝলসাইতে লাগিল! আর যে সহ্য হয় না ভগবন্!”

একদিকে তারা সুন্দরী গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া মরে; অন্য দিকে ভবানী পাগলিনীর ন্যায় হা-হুতাশ করেন। উভয়েরই আহার-নিদ্রা-পরিত্যাগ—উভয়েই শোকে মুহ্যমানা!

প্রায় প্রতিদিনই, অবসর পাইলে, ভবানীর গুরুদেব তর্কবাগীশ মহাশয় ভবানীকে সান্ত্বনা-দান করিতে লাগিলেন। প্রায় প্রতি-দিনই চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহাকে সান্ত্বনাদানে চেষ্টা পাইলেন। মধ্যে মধ্যে দয়ারাম রায়ও সে পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল; সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইল; ভাবানীর শোকের নিবৃত্তি হইল না। ইতিমধ্যে একদিন কাশীধাম হইতে সংবাদ আসিল,—টাকার জন্য সেখানকার ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে বিলম্ব ঘটিতেছে। ভবানীর শোকনিবৃত্তির পক্ষে সে সংবাদ কিছুই নয়। কিন্তু সেই সংবাদ উপলক্ষ করিয়া, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর এবং তর্কবাগীশ মহাশয় ভবানীকে বুঝাইতে আসিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর কহিলেন,—"কাজ কর্ম্ম সকলই বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন কি করিব, পরামর্শ লইতে আসিয়াছি। ৺কাশীধাম হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহা বলিব কি ?"

ভবানী না-রাম না-গঙ্গা কোনই উত্তর দিলেন না।

তর্কবাগীশ মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি মা !—সর্ব্ব কর্ম্ম পণ্ড হইবে ? তোমার পতি-দেবতা তোমাকে কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ? তোমায় কি পুনঃ পুনঃ তাহা স্মরণ করাইতে হইবে ? মা—সহ—সহ—সহ ! সহ করা ভিন্ন সংসারে আর কি সান্ত্বনা আছে।

সহ—সহ—সহ। ভবানীর মনে পড়িল,—রাজা রামকান্ত রায় স্বর্গ হইতে প্রায়ই তাঁহাকে বলেন,—"সহ—সহ—সহ কর !" গুরুদেব কি সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন ?

এবার ভবানী উত্তর দিলেন,—গুরুদেব ! আরও কি সহ্য হয় ?

তর্কবাগীশ মহাশয়!—"মা ! তুমি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না ভগবান্ একে একে তোমায় পরীক্ষা করিতেছেন ! তুমি পুরাণপাঠ শ্রবণ করিয়াছ, তুমি শাস্ত্র-আলোচনা শুনিয়াছ, তোমায় কি মা, আরও বেশী করিয়া কিছু বুঝাইতে হইবে ? তুমি ধ্রুবচরিত্র শুনিয়াছ; তুমি প্রহলাদের পরীক্ষা দেখিয়াছ। দাতাকর্ণ পদ্মাবতী—পিতা-মাতা কোন্ প্রাণে কেমন করিয়া পুত্র বৃষকেতুর মস্তকচ্ছেদ করিয়াছিল;

আমার, মা হইয়া, কেমন করিয়া পদ্মাবতী অতিথি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জন্ম পুত্রের মাংস রন্ধন করিয়া দিয়াছিল;—সে সকল কিছুই তো তোমার অবিদিত নাই। তবে তুমি, কেন মা, এই পরীক্ষার নিষ্পেষণে এত কাতর হইয়া পড়িয়াছ?"

ভবানী ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"আমি সব জানি, সব বুঝি; কিন্তু আমার পরীক্ষার কি শেষ নাই? আমার অন্ধের যষ্টি—শেষ অবলম্বন যেটুকু ছিল, সেটুকুও কেন ভগবান কাড়িয়া লইলেন?"

তর্কবাগীশ মহাশয় বুঝাইতে গেলেন,—"মা, ভগবান মঙ্গলময়। তোমাকে বরাবরই বলিয়া আসিতেছি,—তিনি যাহা কিছু করিতেছেন সকলই মঙ্গলের জন্ম!"

ভবানী চমকিয়া কহিলেন,—"পতি-পুত্র-হারা হইলাম, কন্যা তারাসুন্দরী বিধবা হইল; ইহাতেও কি মঙ্গলময় মঙ্গল করিলেন?"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"হাঁ মা, মঙ্গল ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? দেশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, প্রজাগণ 'হা অন্ন যো অন্ন' করিয়া আকুল, অনাথ-আতুরের আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ, তীর্থক্ষেত্র কলুষিত হইতে বসিয়াছে,—এ অবস্থায় তোমার দৃষ্টি সেই সকল দিকে আকর্ষণ করায় মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই প্রকাশ পাইতেছে না কি?"

ভবানী।—"আমি বুঝি না, কিসে কি হয়।"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"আমার মনে হয়, তোমার দ্বারা সেই সকল মঙ্গলময় অনুষ্ঠান করাইবার জন্যই মঙ্গলময় এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। মা, যদি তোমার পুত্র বা জামাতা জীবিত থাকিত, তাহা হইলে পরহিতৈষণাব্রতে তুমি কখনও কি এতদূর আত্মসমর্পণ করিতে পারিতে? এই যে তীর্থক্ষেত্রসমূহ রক্ষার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ, এই যে লক্ষ লক্ষ অনাথ আতুর

তোমার অন্নে প্রতিপালিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে; যদি মা তোমার অন্য বন্ধন কিছু থাকিত, তাহা হইলে তুমি কখনও এতটা করিতে পারিতে কি? নিশ্চয়ই তখন, পুত্রের মুখ চাহিয়া জামাতার মুখ চাহিয়া, তোমায় দানব্রতে কার্পণ্য করিতে হইত। কিন্তু মা! ভগবানের তাহা ইচ্ছা নয়। তোমার এক পুত্র বা এক জামাতার সুখের জন্য, তোমার লক্ষ লক্ষ অনাথ পুত্র অনশন ক্লেশ সহ্য করিবে। সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবান্ কি কখনও তাহা ব্যবস্থা করিতে পারেন? মা! তুমি নিশ্চয় জেন, ভগবান্ তোমার চিরমঙ্গলের জন্য তোমারই এই অমঙ্গলের সংঘটন করাইয়াছেন। মা! সহ্য—সহ্য—সহ্য কর।"

তর্কবাগীশ মহাশয়ের এবংবিধ উপদেশ-বাক্যে ভবানী যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন; কহিলেন,—"ভাল, আপনি যখন আদেশ করিতেছেন, আমি সহ্যই করিব। অনেক সময় মনে করি—সহ্য করি; কিন্তু পারিয়া উঠি না। গুরুদেব! কিসে সহ্য করিতে পারি, আমায় শিখাইয়া দিবেন কি?"

তর্কবাগীশ মহাশয়।—"মা! বলিয়াছি তো, তিনি সর্ব্বমঙ্গলময়। সে কথা কখনও বিস্মৃত হইও না; তাহা হইলে সকল বিপদ্-আপদ্ দূরে যাইবে, মনে চির-শান্তি পাইবে। স্বর্ণকার যদ্রূপ অনলে দগ্ধীভূত করিয়া স্বর্ণের মলিনতা দূর করে, সেইরূপ পরীক্ষার অনলে দগ্ধীভূত করিয়া ভগবান্ মানুষের মলিনতা দূর করেন। ভক্তের উপরই তো ভগবানের পরীক্ষা! তুমি ভগবদ্ভক্ত; তাই মা, তুমি পরীক্ষার অনলে এমন দগ্ধীভূত হইতেছ।

ভবানী।—"এ পরীক্ষা আর কতকাল চলিবে!"

তর্কবাগীশ মহাশয়;—"বুঝি, এই পরীক্ষাই তোমার শেষ পরীক্ষা। এখন মা, তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর। তুমি যে সকল শুভ-

অনুষ্ঠানের কামনা করিয়াছ, সেগুলি যাহাতে সম্পন্ন হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহারই চেষ্টা কর।

ভবানী ক্রমেই সান্ত্বনা-লাভ করিলেন। নানাবিধ দেশ-হিতকর ধর্ম্ম কার্য্যে তাঁহার মন ন্যস্ত হওয়ায় তিনি একে একে সকল শোক বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অভিলষিত কার্য্য-সমূহ শনৈঃ শনৈঃ সম্পন্ন হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দত্তক-গ্রহণ।

কিছুদিন পরেই পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। ভবানীও মনে মনে সে প্রসঙ্গের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলেন। সে সম্পর্কে রাজা রামকান্ত রায়ের অন্তিম উপদেশও তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

ভবানী ভাবিয়া দেখিলেন,—"পোষ্যপুত্র লওয়াই কর্ত্তব্য। পতির আদেশ পালন এবং বংশপর্য্যায়-রক্ষা—উভয় উদ্দেশ্যই তাহাতে সুসিদ্ধ হইতে পারে।" সুতরাং দয়ারাম রায়, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতি পোষ্যপুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে যখন তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলেন, তখন ভবানী সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

চারিদিকেই পোষ্যপুত্রের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। রাজ-সংসার হইতে ঘোষণা-প্রচার হইল,—যিনি স্বেচ্ছায় পোষ্যপুত্র প্রদান করিবেন এবং যাঁহার পুত্র মনোনীত হইবে, তিনি আশাতীত লাভবান্ হইবেন।

পুত্র নাটোর রাজ্যের অধীশ্বর হইবে, আপনিও আশাতীত লাভ-বান্ হইব,—এই মনে করিয়া অনেকেই পোষ্যপুত্রপ্রদানের জন্ম আগ্রহান্বিত হইলেন। সুতরাং পোষ্যপুত্রনির্ব্বাচনের জন্ম একটী দিন স্থির হইল। যাঁহারা পোষ্যপুত্র প্রদানে ইচ্ছুক, সেই দিনে তাঁহাদের সকলেই পুত্রসহ রাজবাটীতে উপস্থিত হইবার জন্ম আম-ন্ত্রিত হইলেন। দয়ারাম রায় প্রভৃতি থাকিয়া সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র পছন্দ করিয়া লইবেন,—স্থির হইয়া গেল।

নির্ব্বাচনের দিন অনেকেই পুত্রসহ নাটোর রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজকর্ম্মচারিগণ কাহারও সংবর্দ্ধনায় ত্রুটি করিলেন না। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কেহই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন না করেন,—ভবানী পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকলেই জানিয়াছিলেন —যাঁহার পোষ্যপুত্র মনোনীত না হইবেন, তাঁহাকেও যথাযোগ্য বিদায় দেওয়া হইবে। পুত্র না দিয়াও সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে; অপিচ, পুত্র মনোনীত হইলে আশাতীত লাভের সম্ভাবনা—কালে সে পুত্র রাজ্যেশ্বর হইবে; সুতরাং পুত্র সহ রাজবাটীতে আসিতে কেহই কোন রূপ সঙ্কোচ ভাব মনে করেন নাই।

পোষ্যপুত্র-নির্ব্বাচনের দিন নাটোর রাজধানীতে এক অভিনব সমারোহ-ব্যাপার উপস্থিত হইল। কাহারও বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি না হয়, দয়ারাম রায় স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বহির্ব্বাটীর প্রশস্ত আঙ্গিনায় ফরাসের বিছানায় আমন্ত্রিত ব্যক্তি-গণের বসিবার আসন হইয়াছিল। তাঁহাদের সকলের মধ্যস্থলে, বিস্তৃত একখানি গালিচার উপর, বালকদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। দয়ারাম রায় এক একটী বালককে সঙ্গে করিয়া আনিয়া সেই আসনে উপবেশন করাইতেছিলেন। ভবানী চিকের মধ্যে অন্তরালে বসিয়া সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন; কোন বালকটীকে

পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন, মনে মনে তাহাও সিদ্ধান্ত করিয়া লইতেছিলেন।

অনেক বালক আসিল ও উপবেশন করিল। কিন্তু একটী বালক আসনের নিকট উপস্থিত হইয়া বিরক্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দয়ারাম রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি দাঁড়াইয়া রহিলে যে! ঐ গালিচায় গিয়া উপবেশন কর।"

বালক তেজোগর্ব্বের সহিত উত্তর দিল,—"আমার জুতা খুলিয়া দাও ; তবেত আমি গালিচায় গিয়া বসিব।"

দয়ারাম রায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তখন তিনি আপনিই সেই বালকের পা হইতে জুতা খুলিয়া দিলেন।

তাহার পর আর আর যে বালক আসিল, কেহই কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য করিল না; সকলেই ফরাসে গিয়া ধীরে ধীরে উপবেশন করিল। অবশেষে ভবানীর প্রতিনিধি-রূপে চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের যথাযোগ্য বিদায়-বৃত্তি প্রদান করিলেন।

পোষ্যপুত্র নির্ব্বাচনের সভা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও কোন বালক মনোনীত হইল, কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। দয়ারাম রায় সকলকে বলিয়া দিলেন—"আমরা পরামর্শ করিয়া যে বালককে পছন্দ করিব, আপনারা কিছুদিন পরে তাহা জানিতে পারিবেন।

* * * *

আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বিদায় গ্রহণ করিলে, ভবানী পোষ্যপুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে দয়ারাম রায়ের মত জানিতে চাহিলেন।

দয়ারাম রায় উত্তর দিলেন,—"মা! সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? যে বালক আমায় দিয়া পায়ের জুতা খুলাইয়া লইয়াছে, সেই আমার প্রভু হইবার যোগ্য পাত্র। সে ভিন্ন অন্ত আর কা'র— আমার প্রভু হইবার সম্ভাবনা আছে?"

এই বলিয়া দয়ারাম রায় ভবানীর অভিমত জানিবার প্রতীক্ষায় ছিলেন।

ভবানীরও সেই উত্তর। সেই বালকই—নাটোরের সিংহাসনে আরোহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র।

বালকের নাম,—রামকৃষ্ণ রায়। রাজসাহী জেলার আমরুল-পরগণার আটগ্রামের রায়বংশে তাহার জন্ম। সেই রায়বংশ আবার নাটোর-রাজবংশের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। যে জীবন্ন ওঝা (মৈত্র) হইতে উৎপন্ন কামদেবের বংশ নাটোর-রাজ্যের আদিভূত, সেই কামদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভিরামের বংশেই এই রামকৃষ্ণ জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিদেব রায়। হরিদেব রায়—অভিরাম রায়ের পৌত্র। সে হিসাবে রামকৃষ্ণ উভয় বংশেরই এক পর্য্যায়ে অবস্থিত। *

এই পোষ্যপুত্র গ্রহণ উপলক্ষে মহারাণী ভবানী আট গ্রামের রায়বংশকে আট গ্রাম তালুক পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। সেই হইতেই রায় মহাশয়দিগের গ্রাম "আট গ্রাম" নামে প্রসিদ্ধ হয়।

মহা-সমারোহে পোষ্যপুত্র গ্রহণ উৎসব সম্পন্ন হয়। এই পোষ্য-পুত্র গ্রহণের পর হইতে মহারাণী ভবানী সম্পূর্ণরূপে গঙ্গাতীরবাসিনী হন। তাঁহার অধিকাংশ সময়ই বড়নগরে অতিবাহিত হইত; সময়ে সময়ে তিনি ৺কাশীধামেও অবস্থিতি করিতেন।

---

* পরিশিষ্টে বংশলতায় সে পরিচয় দ্রষ্টব্য

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নবাবী।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের (১১৬৩ সালের) ৯ই এপ্রিল নবাব আলিবর্দ্দী ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আলিবর্দ্দী আপন প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে নিকটে ডাকিয়া রাজকার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। বুঝাইলেন,—কে শত্রু, কে মিত্র। জানাইলেন,—তাঁহার বিরুদ্ধে কোথায় কিরূপভাবে ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। শেষ বলিলেন,—"আমি আজীবন ক্লেশ স্বীকার করিয়া তোমার জন্য এই রাজ্য রাখিয়া গেলাম। কিন্তু মৃত্যুকালেও আমার মন চঞ্চল রহিল; যেহেতু, এখনও তোমার পথের কণ্টক সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যাইতে পারিলাম না। যা হউক, বিদেশীয় বণিক্‌গণের প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। আর ন্যায়নীতির অনুসরণে শাসন-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবে।"

আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই সিরাজের বিরুদ্ধে চারিদিকে চক্রান্ত চলিতেছিল। একদিকে ঘেসেটী বেগম, অন্যদিকে শওকৎ জঙ্গ। দুইজনে দুই দিক্ হইতেই সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন। ঘেসেটী-বেগম, রাজ্যলাভের আশায় সিরাজউদ্দৌলার কনিষ্ঠ সহোদর এক্রামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। এক্রাম-উদ্দৌলার মৃত্যুর পর, তাহার অপগণ্ড শিশুর নামে রাজ্য চালাইবেন ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন; আর ঢাকার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ রায় সেই চক্রান্তে তাঁহার সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদে ঘেসেটী বেগমের প্রমোদভবন 'মতিঝিলে' তাহারই ষড়যন্ত্র চলিতে-

ছিল। শওকৎজঙ্গ—আলিবর্দ্দীর দ্বিতীয় জামাতা সৈয়দ আহম্মদের পুত্র। তিনি পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সিরাজ-উদ্দৌলাকে বঞ্চিত করিয়া, তিনও নবাবী লাভের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। দুই দিকেই মন্ত্রণা-কৌশলের—অনুষ্ঠান আয়োজনের অবধি ছিল না; দু পক্ষই সিরাজের সংহার-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। একদিকে ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি বণিক্‌গণও দিন দিনই আপনাদের প্রসার-বৃদ্ধির জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। অন্যদিকে জগৎ-শেঠপ্রমুখ নবাবের দক্ষিণহস্ত-স্থানীয় পার্ষদগণ গোপনে গোপনে বিপক্ষ-পক্ষে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এমনই সঙ্কট সমস্যার দিনে, আলিবর্দ্দী সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইয়া গেলেন।

এই অবসরে, রাজা রাজবল্লভ রায় এক নূতন খেলা খেলিয়া বসিলেন। নবাব আলিবর্দ্দীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া তিনি ঢাকার ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করাইলেন। তার পর সেই ধনরত্ন লইয়া তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় গিয়া ইংরেজদিগের নিকট আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন; সে ধনরত্নের উত্তরাধিকারী—নবাব সিরাজউদ্দৌলা। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলাকে বঞ্চিত করিবার জন্য পুত্রের সহায়তায়, রাজা রাজবল্লভ রায় এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়া বসিলেন। কৃষ্ণবল্লভ, ঢাকার সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া, তীর্থযাত্রার ছলনায় কলিকাতায় গিয়া ইংরেজের সহিত মিলিত হইলেন; ফলে নবাবের ও ইংরেজের মধ্যে অসদ্ভাবের এক নূতন বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর, সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সিরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতার ইংরেজ-রেসিডেণ্টের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ইংরেজ-রেসিডেণ্ট সমস্ত ধনসম্পত্তি সহ যেন অবিলম্বে কৃষ্ণ-

বল্লভকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন,—সিরাজের এইরূপ আদেশ লইয়াই দূত কলিকাতায় রওনা হইল।

সিরাজ বুদ্ধিমান্ ছিলেন বটে; কিন্তু অপরিণতবয়স্ক যুবক বৈ তো নয়? বিশেষতঃ উপযুক্ত পরামর্শদাতারও অভাব ঘটিয়াছিল; সুতরাং রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াও তাঁহার যৌবনোচিত চাঞ্চল্য দূর হইল না। বুঝি বা তাঁহার সেই চাঞ্চল্যই তাঁহার পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া আনিল। সিংহাসনের সুখৈশ্বর্য্য-শতদল বেষ্টন করিয়া স্বার্থান্বেষী বিষধরগণ স্বভাবতঃই সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া আছে; বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞগণই তাহা বুঝিতে পারেন না; চঞ্চলচিত্ত যুবক তাহার কি বুঝিবে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ফোয়ারা।

নবাবীর আনন্দে সিরাজের প্রমোদ-উদ্যানে আমোদের ফোয়ারা ছুটিয়াছে।

আজ প্রমোদ-উদ্যানের কি শোভা! উদ্যান আলোক-মালায় সজ্জীকৃত। নৈশ-অন্ধকারেও প্রমোদ-ভবন দীপালোকে দিবাভাগের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়াছে।

কক্ষে কক্ষে আনন্দের তর তর তরঙ্গ ছুটিয়াছে। কক্ষে কক্ষে আমোদের কলকল্লোল উঠিয়াছে। কক্ষে কক্ষে হাস্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে।

সাঙ্গোপাঙ্গে সিরাজ আজ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছেন। নর্ত্তকীগণ একটীর পর একটী করিয়া গান গাহিতেছে; আর তালে তালে নৃত্য করিতেছে। মদ্যপাত্র মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গায়িকারা গাহিল,—

পিও পিও বঁধু রূপ-মধু
বিভোর হইয়া।
লহ লহ বঁধু প্রেম-ডালি
দিলাম সঁপিয়া॥
পর পর গলে সোহাগের মালা
যতন করিয়া।
ধর ধর হৃদে কুসুম-সুবাস
জুড়াইবে হিয়া॥
যদি চাহ বঁধু ভালবাসা
পরাণ ভরিয়া।
দেও দেও বঁধু ভালবাসা
পরাণ খুলিয়া॥

নর্ত্তকীগণ যতই ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য করিতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া গান গাহিতেছে; সিরাজ ও তাঁহার পারিষদগণ ততই আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছে, মুহুর্মুহু বাহবা-ধ্বনিতে কক্ষ প্রকম্পিত হইতেছে।

তুফান খাঁ তুফানে পড়িয়া এক একবার নৃত্য করিতে যাইতেছেন। মহব্বত জঙ্গ তাঁহাকে টানিয়া বসাইতেছেন। মহরুদ্দীন এক একবার এক একজন নর্ত্তকীর হাত চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সিরাজের তীব্র কটাক্ষে পর মুহূর্ত্তেই পিছাইয়া আসিতেছে।

কখনও নর্ত্তকীগণের কাহারও রূপের প্রশংসা চলিয়াছে; কখনও কাহারও ভ্রূভঙ্গীর নিন্দা হইতেছে। কখনও কেহ বা সুকণ্ঠী বলিয়া বাহাদুরি পাইতেছে; কখনও কেহ বা রাসভ-কণ্ঠী বলিয়া বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ হইতেছে।

আনুষঙ্গিক কত কথাই উঠিতেছে। রূপের সমালোচনায়, কত সময় কত পুরস্ত্রীর রূপের বিষয় আলোচিত হইতেছে। কথায় কথায় কত পরিবারের কত কুৎসার কথা রটিতেছে।

সেই অবসরে, তুফান খাঁ ফাঁদিয়া বসিল,—"যতই যা" রূপের কথা বল, সেদিন বজরায় বসিয়া নবাব সাহেবকে যে রূপের ডালি দেখাইয়াছি, তেমনটী আর কোথাও নাই।"

মহব্বদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল,—"কবে, কোথায় আবার তেমন রূপ দেখিয়া আসিলি? আমাদের বেগম-মহলে যে সকল রূপসী আছে, তার কাছে কি আর কোন রূপ দাঁড়াইতে পারে?

'হা-হা' করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া তুফান খাঁ উত্তর দিল,—"তুই কি কখনও রূপ দেখেছিস্? তুই বুঝবি কি? নবাব সাহেবের সেদিন মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কেমন নবাব সাহেব, মনে পড়ে কি? সে রকম একটা চাঁদ এসে যদি আমাদের বেগম মহল আলো করে, কেমন, মন মজগুল হয় না কি?"

সিরাজের প্রাণে কি যেন এক বিষাদের বৃশ্চিক-দংশন আরম্ভ হইল; নর্ত্তকীদিগের নৃত্য-গীত সিরাজের আর ভাল লাগিল না। তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, সিরাজ বিমর্ষভাবে উত্তর দিলেন,—"আর কেন ভাই, সে কথা কও? সে যে আসমানের চাঁদ। বামন হইয়া কেমন করিয়া সে চাঁদের আশা করিতে পারি? শুধু শুধু আমায় মনঃকষ্ট দেওয়াই কি তোমার ইচ্ছা?

তুফান খাঁ।—"না, জাঁহাপনা! আপনাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা

আমার একটুও নহে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, সে আসমানের চাঁদ তো দূরের কথা, আমি স্বর্গ থেকে অপ্সরী এনে দিতে পারি। আপনি বাঙ্গালার নবাব, আপনার হুকুমে কি না হতে পারে।

সিরাজ।—"কেন আর আমার ক্ষোভ বাড়াও! সে আশা—দুরাশা! বরং আকাশের চাঁদ হাতে এনে দিতে পার; কিন্তু হিন্দুর ঘরের কুলবধূকে কোনক্রমেই ভুলাইয়া আনা সম্ভবপর নহে। যদি বল—জোর করিয়া আনিব; সে আশাও দুরাশা মাত্র। জীবন্তে তাহাকে কখনই এখানে আনিতে পারিবে না।

তুফান।—"আপনি বলিতেছেন বটে! কিন্তু একবার হুকুম দিয়া দেখুন দেখি? আপনার এই নফরই সেই আসমানের চাঁদ আপনার হাতে এনে দিতে পারে।"

মহরুদ্দীন, মহব্বত জঙ্গ প্রভৃতি পারিষদগণ ক্রমশঃ অধিকতর কৌতুহলাক্রান্ত হইল। তাহারা সকলেই একবাক্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"কি, ব্যাপারখানা কি? কোন্ আসমানের চাঁদ আবার নবাব সাহেবের মনোহরণ করিল?"

তুফান খাঁ বলিতে আরম্ভ করিল,—"সত্যই সে আসমানের চাঁদ। একবার চকিতের ন্যায় প্রকাশ পাইয়াই মেঘের কোলে লুক্কায়িত হইল।"

মহরু বাধা দিয়া কহিল,—"আর ভণিতায় কাজ নাই দাদা! আসল কথাটাই কি খুলে বল না।"

তুফান খাঁ আবার কহিতে আরম্ভ করিল,—"সে যে কি, তার আর কি বলিব। দেখিলে, চক্ষু সার্থক হয়!"

সিরাজ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

মহরু অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া কহিল,—"কি ব্যাপারটাই শুনি।

যদি উপায় কিছু নাই হয়, শেষে সকলে মিলেই না হয় হা হুতাশ করা যাবে।”

তুফান খাঁ পুনরপি বলিতে লাগিল,—“আহা হা। তেমন রূপ কি মানুষের হয়? সে মানুষ নয়, সে সত্যি সত্যিই পরী!”

প্রকৃত ঘটনা কোনক্রমেই প্রকাশ হয় না দেখিয়া, মহব্বতজঙ্গ সুর ধরিল,—“আহা-হা! সে মানুষ নয়; সে সত্যিই পরী!”

মহরু ক্রমেই চটিয়া উঠিল। সেও বিদ্রূপ করিয়া কহিল—“আহা-হা।—সে মানুষ নয়। সত্যিই সে পরী।”

এই বলিয়া সে আবারও কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল,—“তা, সে পরীকে কি প্রকারে নবাব সাহেবের ক্রোড়ে এনে দেওয়া যেতে পারে তাই?

তুফান খাঁ বলিল,—“তবে শোন।”

মহরুদ্দীন তুফানের মুখের কাছে কাণ পাতিয়া শুনিতে গেল। তুফান খাঁ, বিদ্রূপ বুঝিয়া, তাহাকে সরাইয়া দিয়া, এইবার একে একে আসল কথা কহিতে লাগিল।

সে বলিল,—“সে দিন আমরা বজরায় চড়িয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বড়নগরের ঘাট বাহিয়া বজরা মুর্শিদাবাদের দিকে আসিতেছিল। সেই সময়ে বড়নগরের রাজবাড়ীর ছাদের উপর আমিই প্রথমে সেই সুন্দরীকে দেখিতে পাই। সুন্দরী তখন ছাদের উপর দাঁড়াইয়া চুল শুকাইতেছিল। আমি তখন নবাব সাহেবকে তাহা দেখাইলাম।”

তুফানের কথা শেষ হইতে না হইতেই সিরাজ কহিলেন,—“মরি, মরি! কি ভ্রমরকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশদাম!”

তুফান কহিল,—“মুখখানি! ভ্রূযুগল!”

সিরাজ কহিলেন,—“তুফান!...আর বলিস্‌নে। বৃথা কেন সে স্বপ্ন-স্মৃতি মনে আনিয়া মনকে ব্যথিত করিস্‌।’

কিন্তু মহরু তখনও প্রশ্ন করিতে বিরত হইল না। সে আবারও জিজ্ঞাসা করিল,—"তার পর! তুফান, তার পর কি হইল?"

তুফান।—"তার পর! বিজলী মেঘের কোলে লুকাইল! আমরা বজরা নজর করিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম; আর আমাদের প্রতি নজর পড়ায়, সুন্দরী ছাদ হইতে সরিয়া গেল।"

মহরু।—"তার পর, তোরা কি করিলি?"

তুফান।—"হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আমরা রাজধানীর দিকে ফিরিয়া আসিলাম!

মহরু।—"কোনরূপে সুন্দরীকে হস্তগত করিতে পারিলি না?"

তুফান।—"সে বড় বিষম ঠাঁই! মহারাণী ভবানীর নাম শুনেছিস্? যার নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, সুন্দরী সেই মহারাণী ভবানীর কন্যা!"

মহরু।—"সে বৎসর যে কন্যা বিধবা হয়েছে; এই কি সেই কন্যা? সে যে শুনেছি, পরমা সুন্দরী।"

তুফান।—"সেই রে—সেই—সেই বুঝেছিস্।"

মহরু।—"বুঝেছি! কিন্তু সেখানে জারিজুরি বড় খাটবে না! তারা নবাব ব'লেও মান্‌বে না।"

তুফান।—"তুই তো সব বুঝিস্। দেন দেখি হুকুম! আমি কালই তাকে এনে দিতে পারি কি না বুঝে নিস্। নবাবের হুকুমে কি না সম্ভবপর?"

সিরাজ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—"তুফান! তুমি সত্য বল্‌ছ? হুকুম পেলে তুমি এ কাজ কর্‌তে পার?"

তুফান দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল,—"হাঁ খোদাবন্দ! আমি সত্যই বল্‌ছি। আপনার হুকুম পেলে, আমি নিশ্চয়ই তাকে এনে দিতে পারি।"

সিরাজ কহিলেন,—"এজন্য তোমার যে কোনও সাহায্য প্রয়োজন হয়, নবাব-সরকার হইতে প্রাপ্ত হইবে। ফৌজ চাও, ফৌজ পাইবে; সিপাহী চাও, সিপাহী পাইবে।"

তুফান।—"বেশী সাজ সরঞ্জামের প্রয়োজন নাই! আপনার নাম শুনিবামাত্রই সে সুন্দরী আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাহাকে পছন্দ করিয়াছেন, ইহার অপেক্ষা তাহার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? সে বিধবা, আজীবন বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিবে,—সেই তাহার শ্রেয়ঃ,—না নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধানা বেগম মধ্যে গণ্য হইবে, সেই তাহার শ্রেয়ঃ? নবাব সাহেব! আমায় বেশী কিছু বলিতে হইবে না। এখন আমায় কি পুরস্কার দিবেন, বলুন?"

সিরাজ উদ্দৌলা।—"তুফান! তুমি যত সহজ বলিয়া মনে করিতেছ, কাজ তত সহজ নয়। নিরস্ত্র ব্যক্তির পক্ষে বাঘিনীর ক্রোড় হইতেও হয় তো শাবক ছিনাইয়া আনা সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু মহারাণী ভবানীর ক্রোড় হইতে তাঁহার কন্যাকে অপহরণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, তুমি যখন সাহস করিতেছ, কাল তুমি শতাধিক ফৌজ লইয়া সুন্দরীকে আনিতে যাইও। প্রথমে অনুরোধ জানাইবে; যদি সম্মত হয় ভালই; নচেৎ, বলপ্রকাশে ত্রুটি করিবে না। যদি অধিক ফৌজের প্রয়োজন হয়, আমায় জানাইবা মাত্র তাহাও প্রেরিত হইবে।"

সেই বন্দোবস্তই স্থির হইল। পরদিন প্রভাতেই নবাবের স্বাক্ষরিত পরোয়ানা-সহ তুফান খাঁ সসৈন্যে বড়নগরে যাত্রা করিলেন। যেরূপে হউক, তারাসুন্দরীকে হস্তগত করিতে হইবে, সিরাজের ইহাই সঙ্কল্প হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

তারাসুন্দরী।

যেমন মা, তেমনই মেয়ে। যেমন ভবানী, তেমনই তারাসুন্দরী; এক ছাঁচে ঢালা।

পতির লোকান্তরের পর, মহারাণী ভবানী যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, স্বামীর মৃত্যুর দিন হইতে তারাসুন্দরীও সেই কঠোর ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন।

ভবানী শয্যা-ত্যাগ করিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন; কন্যা তারাসুন্দরীও জননীর পার্শ্বে সেই ভূমিশয্যা অবলম্বন করিয়াছেন। ভবানী তৃতীয় প্রহরে অলবণ অতৈল সিদ্ধ-পক্ব ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন; কন্যা তারাসুন্দরীও সেই তৃতীয় প্রহরে সেই ভাবে ভক্ষ্য ভোজ্য গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। ভবানী ভোজ্যপাত্র পরিত্যাগ করিয়া মাটির উপর হবিষ্যান্ন ঢালিয়া আহার করিতেন; কন্যা তারাসুন্দরীও হবিষ্যান্ন গ্রহণ, জননীর আদর্শেই করিয়াছিলেন। ভবানী স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্র গায়েই শুকাইয়া থাকেন, কন্যা তারাসুন্দরীও স্নান করিয়া আর্দ্র-বস্ত্রে নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ ভবানী যখন যে কঠোর ব্রতই পালন করুন না কেন, কন্যা তারাসুন্দরী কায়মনে তাহারই অনুসরণ করিতেন।

ভবানী কতই নিষেধ করিতেন; পুনঃপুন কহিতেন,—"মা! তোমার এই অল্প বয়স; এ বয়সে, এ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য তোমার সহ্য হইবে কেন? হঠাৎ ব্যারাম হইতে পারে!"

কিন্তু কন্যা তারাসুন্দরী তাহা শুনিতেন না। মা নিষেধ করিলে তিনি কাঁদিয়া বলিতেন,—"মা! আমার কোন কষ্ট হয় না তো?

তবে তুমি আমার কর্ত্তব্য-পালনে কেন বাধা দাও? আমার অসুখ কর্‌বে না মা!"

এক বার দুই বার তিন বার বলিয়া পুনঃপুন যখন একই উত্তর পাইতেন; অপিচ, তারার নয়নে যখন জলধারা বিনির্গত হইত; ভবানী আর বারণ করিতেন না। মনে মনে ভাবিতেন,—"ইহ-জন্মে এই ফল! মা'র আমার পরকালের কার্য্যে কেন আর বিঘ্ন ঘটাই! যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই ঘটিবে; কর্ত্তব্যপালনে অন্ত-রায় হইয়া বৃথা কেন মনঃকষ্টের কারণ হই। সোণার পিঞ্জরে অতি যত্নে নখিন্দরকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াও চাঁদ-সদাগর তাঁহাকে বাঁচাইতে পারেন নাই; শেষ, সর্পদষ্ট মৃতপতি ক্রোড়ে লইয়া বেহুলাকে মন্দাসে ভাসিতে হইয়াছিল। মানুষের সাবধানতা—মনের ব্যাকু-লতা মাত্র!"

শেষ কথা মনে পড়িতে পড়িতেই, ভবানীর মনে আত্মস্মৃতি জাগিয়া উঠিত। তিনি আপনা-আপনিই বলিতেন,—"আমার স্বামি-পুত্রের কি অসাবধানতা ছিল? রাজার সংসার, রাজভৃত্যগণের পরিচর্য্যা; রাজবৈদ্যগণ নিয়ত মুখপানে চাহিয়া ছিল; কিন্তু তাঁহা-দিগকেও তো কৈ ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। তবে আর কেন? ভগবানের যাহা মনে আছে, তাহাই হইবে। তারার কর্ত্তব্য কার্য্যে মা আমি আর কদাচ বাধা দিব না।"

এই মনে করিয়া, মনকে সংযমরশ্মিতে বাঁধিয়া, শেষে তিনি তারার সকল ধর্ম্ম্য কার্য্যেই সহায়তা করিতেন।

ভবানী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া নিত্য প্রাতঃস্নান করিতেন; প্রাতঃ-স্নানের পর, সন্ধ্যাহ্নিক দেবপূজায় ব্রতী হইতেন,—পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতেন। তিনি মধ্যাহ্ন কালে পুনরায় গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন; গঙ্গাস্নানের পর, দেবসেবা-অতিথিসেবার ব্যবস্থা করিয়া তৃতীয় প্রহরে

হবিষ্যান্ন সিদ্ধ করিয়া লইতেন। অপরাহ্নে অল্পক্ষণমাত্র রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। তার পর, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোনদিন বা কথকতা শ্রবণ করিতেন; কোনদিন বা গুরুদেবের নিকট শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত হইতেন। পরিশেষে পুনরায় গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবন্দনায় মন দিতেন।

সকল কার্য্যেই তারাসুন্দরী জননীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন। জননী যেমন ভাবে থাকিতেন, যেরূপ ভাবে জীবন-যাপন করিতেন, তারা-সুন্দরীর সর্ব্বদা তৎপ্রতি লক্ষ্য ছিল। তারা-সুন্দরী সকল বিষয়েই প্রাণপণে জননীর অনুসরণ করিতেন।

ভবানীর মস্তকে আপাদ-লম্বিত কৃষ্ণ কাদম্বিনীতুল্য কেশগুচ্ছ ছিল; পতির মৃত্যুর পর ভবানী মস্তক মুণ্ডন করিয়া সে সৌন্দর্য্যের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। তারা-সুন্দরী অনেক দিন হইতে আপন কেশগুচ্ছ কাটিয়া দিবার জন্য জননীকে অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু মার প্রাণ!—তাই "আজ নয় কাল" বলিয়া ভবানী কালক্ষয় করিয়া আসিতেছিলেন।

ভবানী কখনও ভ্রমেও ভাবেন নাই,—সেই কাল-কেশ কাল-সর্পে পরিণত হইবে।

কয় দিন তারাসুন্দরীর সর্দ্দির ভাব হইয়াছিল; তাই মা বলিয়াছিলেন,—"রোজ রোজ ভিজে কাপড়ে থেকে সর্দ্দি হয়েছে, আজ তুমি মা! কাপড় ছাড়!"

কিন্তু তারাসুন্দরী সম্মত হন নাই। মা তাই উপদেশ দিয়াছিলেন,—"যদি কাপড়ই না ছাড়, তবে ছাদের উপর গিয়া চুল শুকাইয়া আইস।"

কন্যা তাহাতেও ইতঃস্তত করিলে, মা পুনরায় বলিয়াছিলেন,— "আমার একটা কথা শোন; ছাদে গিয়া রৌদ্রে চুল শুকাইয়া আইস।

তারাসুন্দরী আর দ্বিরুক্তি করেন নাই। জননীর আদেশে সেদিন ছাদের উপর চুল শুকাইতে গিয়াছিলেন।

সেই চুল-শুকানই তাঁহার কাল হইয়া দাঁড়াইল। তিনি যখন ছাদের উপর চুল শুকাইতেছিলেন, সেই সময় সিরাজের বজরা উজান হইতে ভাটির পথে বাহিত হইয়াছিল; সেই সময়েই সিরাজের পার্শ্বচরগণ ছাদের উপর তারাসুন্দরীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রতি সিরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আর তাহারই ফলে, পারিষদগণের উৎসাহে, তারাহরণে সিরাজের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

তারাহরণে।

প্রমোদ-উদ্যানের পরামর্শের পরদিনই সিরাজের পক্ষ হইতে তারা-হরণের আয়োজন হয়। রাত্রিতে পরামর্শ হইয়াছিল; প্রভাতেই সিরাজের ফৌজ তারা-হরণে রওনা হইল।

তখন গঙ্গার পূর্ব্ব-পশ্চিম উভয় তীরে মুর্শিদাবাদ সহর প্রতিষ্ঠিত ছিল; দুই দিক্ হইতেই সৈন্য দল আসিয়া পশ্চিম-তীরে সমবেত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—গঙ্গার পশ্চিমকূলে বড়নগরের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পশ্চিম পার দিয়াই সৈন্যদল উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যে গ্রাম দিয়া যে পথ অতিক্রম করিয়া, সৈন্যদল অগ্রসর হইতে লাগিল; সেই গ্রামের, সেই পথের অধিবাসীরা সকলেই চমকিয়া উঠিল! উত্তরের দিকে প্রভাতে হঠাৎ নবাবের ফৌজ কোথায় যায়—

জানিবার জন্যও অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হইল। কিন্তু কে বলিবে—তাহারা কোথায় যাইতেছে! বলিবার কথা নহে তো? সুতরাং জিজ্ঞাসা করিয়াও কেহই উপযুক্ত উত্তর প্রাপ্ত হইল না।

বেলা প্রহরাতীত। বৈশাখের সূর্য্য দীপ্তরাগে কিরণজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রৌদ্র চন্‌-চন্‌ করিতেছে। সহসা বড়নগরের প্রাসাদ-সন্নিকটে সিরাজের ফৌজ আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রাসাদের দ্বারদেশে আট জন মাত্র দ্বারবান্ ছিল। মহারাণী ভবানী মথুরা হইতে সেই আট জন পালোয়ানকে মনোনীত করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু নবাবের শতাধিক সশস্ত্র ফৌজের নিকট সে আট জন পালোয়ান কি করিতে পারে? তবে সেনাপতি প্রথমে কোনরূপ উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করিলেন না। তিনি সৈন্যদলকে একটু অন্তরালে রাখিয়া, প্রথমে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা পাইলেন। তুফান খাঁ তাঁহাকে উত্তেজিত করিলেও, তিনি তাহা শুনিলেন না। তিনি আপনিই দ্বারবান্‌দিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে কহিলেন,—"একবার দেওয়ান্‌জীকে ডাকিয়া দাও; অথবা, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, দ্বার ছাড়িয়া দাও!"

দ্বারবানগণ সেনাপতিকে কিছুক্ষণ বহিঃপ্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতে বলিল; কহিল—"এখনই সংবাদ দিতেছি; অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন।"

দ্বারবান্ বীর সিং চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরকে সংবাদ দিতে গেল।

অবিলম্বেই চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর বহিঃপ্রাঙ্গণে আগমন করিলেন। সেনাপতিকে মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়ন করিয়া, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন।

দুই এক কথার পরই সেনাপতি নবাবের পরোয়ানাখানি চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের হস্তে প্রদান করিলেন।

কি সর্ব্বনাশ! পাপিষ্ঠ বলে কি? বজ্র!—এ পাপ প্রস্তাব যাহার মুখ হইতে বিনির্গত হইল; তুমি এখনও তাহার মস্তকে পতিত হইলে না? বসুন্ধরা!—এ পাপ প্রস্তাব যেখান হইতে উত্থিত হইল, তুমি দ্বিধা হইয়া সেখানে এখন দ' পড়াইয়া দিতে পারিলে না?

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর পরোয়ানা দেখিয়া অনেকক্ষণ গম্ হইয়া রহিলেন। তাঁহার একবার মনে হইল,—"পরোয়ানা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া পদতলে পেষণ করি!" আবার মনে হইল,—"যাহারা এ প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের মুখে পদাঘাত করি।" এক একবার তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া আসিল। এক একবার তাঁহার দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য্যশীল; সুতরাং আপনিই ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল,—"এ রোগের এ ঔষধ নহে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আপনারা আর একটু অপেক্ষা করুন! আমি মহারাণীকে এ বিষয় জানাইয়া আসি।"

তুফান খাঁ বলিল,—"ইহার ভিতর আর জানাইবার কথা কি আছে? পাল্কী প্রস্তুত। সুন্দরীকে পাঠাইয়া দেন।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর পাপিষ্ঠের মুখে পদাঘাত করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তিনি কোনরূপ উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই সেনাপতি, তুফান খাঁকে গালি দিয়া কহিলেন,—"চোপ-রহ হারামজাদ!"

তুফান খাঁ অন্তরে রুষ্ট হইলেও উত্তর দিতে সাহস করিল না,— মনে মনে কহিল,—"আগে নবাবের কাছে যাই; তারপর দেখা যাবে—তুমি কেমন সেনাপতি।"

যাহা হউক, সকল ক্রোধ সম্বরণ করিয়া, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ঘটনাচক্রে দয়ারাম সেদিন বড়নগরের রাজবাটীতে উপস্থিত ছিলেন। জগৎশেঠের ভবনে এক পরামর্শ-সভা বসিবে; তাই তিনি দীঘাপতিয়া হইতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। আসিয়া, মহারাণী ভবানীর অনুরোধে, কয়েকদিন বড়নগরের প্রাসাদেই অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সুতরাং চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরেরও সুবিধা হইল। দুই জনে পরামর্শ করিয়া, তিনি কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে সমর্থ হইলেন।

পরামর্শে স্থির হইল,—প্রথমে সেনাপতিকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। তাহাতে যদি কোনও ফল না হয়; তখন অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে;—তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য বল-প্রয়োগেও ক্ষান্ত হইবেন না। তবে তাঁহাদের সে পরামর্শের বিষয় তাঁহারা প্রথমে মহারাণীকে পর্য্যন্ত জানাইতে ইচ্ছা করিলেন না। মনে করিলেন,—"যদি অল্পে অল্পে মিটিয়া যায়; এ পাপ-কথা ভবানীর কাণে আর উঠিতেই দিবেন না।"

কিন্তু তাঁহাদের সে পরামর্শের কোনই ফল ফলিল না; সেনাপতি মনে মনে তাঁহাদের অনুরোধের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলেন বটে; কিন্তু নবাবের কঠোর আদেশ,—প্রতিপালন না করিয়াই বা তাঁহার উপায়ান্তর কি আছে? সুতরাং তাঁহাকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি স্পষ্টত উত্তর দিলেন,—"ন্যায়-অন্যায় আমাকে বুঝাইয়া কোনই ফল নাই। আমি বিচারক নহি; আমি হুকুম তামিল করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া সেনাপতি ভয় দেখাইলেন,—তিনি সশস্ত্র সৈন্যদল সহ উপস্থিত হইয়াছেন; সহজে কার্য্যোদ্ধার না হইলে, তিনি বলপ্রকাশে বাধ্য হইবেন।

এই সময় তুফান খাঁ পুনরায় বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল;—"সেই দেওয়া দিতেই হবে। বৃথা কেন আর গণ্ডগোল বাধাইতেছ।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর আর উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না! তিনি বলিলেন,—"আপনারা নবাবের প্রতিনিধি বলিয়া এখনও পর্য্যন্ত আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। নচেৎ এরূপ পাপ-প্রস্তাব যাহারা মুখে আনিতে পারে, তাহাদের মুখদর্শন করিলেও হিন্দুর পাপ হয়।"

বলিতে বলিতে চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর যেন কাঁপিয়া উঠিলেন। দয়ারাম রায় তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন; ইতিমধ্যেই চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর বলিয়া ফেলিলেন,—"যা!—তোদের যা সাধ্য থাকে, কর্‌তে পারিস্।"

এই বলিয়াই তিনি বীর সিং দ্বারবান্‌কে আদেশ করিলেন,—"বীর সিং! হুঁসিয়ার রহো! ফটকমে কৈকো মাৎ ঘুস্‌নে দে না।"

বীর সিং উত্তর দিল,—"যো হুকুম।"

রাগে গরগর করিতে করিতে সেনাপতি ও তুফান খাঁ আঙ্গিনার বাহির হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সৈন্যদলে সাড়া পড়িয়া গেল। তুফান খাঁ তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল!

এখন, মহারাণী ভবানীর নিকটও নবাবের পাপ-প্রস্তাব অবিদিত রহিল না। ভবানী সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপন অনুচরবর্গের প্রতি আদেশ দিলেন,—"প্রাসাদ তোপে উড়িয়া যায়—যাউক; বড়-নগরের নাম লোপ পায়—পাউক;—সেও বরং শ্রেয়ঃ; কিন্তু তবু যেন পাপিষ্ঠদিগের পদার্পণে এই পুণ্য-ভবন কলুষিত না হয়।" এই বলিয়া মহারাণী সকলকেই হুঁসিয়ার থাকিতে বলিলেন। ভৃত্যবর্গও আপন আপন প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়া রাজভবন রক্ষা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

কিন্তু তুলনায় তাহারা কয় জন। একটু পরেই যখন সিরাজের

সৈন্যদল আসিয়া প্রাসাদ আক্রমণ করিবে, তাহারা কয়টী প্রাণী ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে না কি? ভগবন্! তোমার মনে কি আছে, তুমিই বলিতে পার! সিরাজউদ্দৌলা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দণ্ড-মণ্ডের কর্ত্তা। তাঁহার সৈন্যবলের অবধি নাই। তাঁহার কামান-বন্দুকের তুলনায় ভবানীর বড়নগরের রাজভবনের প্রহরি-ব্যবস্থা সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? নাটোর রাজধানীতে এই ঘটনা সংঘটিত হইলে, কিছুক্ষণ আত্মরক্ষার সম্ভাবনা ছিল বটে; কিন্তু এখানে তো সে আশা কিছুই নাই! এখানে সামান্য কয়েকজন প্রহরী সৈন্য, তাহারা কেমন করিয়া রাজভবন রক্ষা করিবে?

তবে কি সতীর সতীত্ব রক্ষা হইবে না? তবে কি সতীশিরোমণি দাক্ষায়ণীর পবিত্র নাম বৃথা হইবে?

ধর্ম্ম যাহার অবলম্বন, ভগবান্ তাহার সহায়। ভবানী ধর্ম্মবলে বলবতী হইয়া সিরাজের আক্রমণ অবহেলা করিলেন,—ভগবানে নির্ভরপরায়ণ হইলেন। সুতরাং সতীর ধর্ম্মরক্ষার উপায় না করিয়া ভগবান্ কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন?

সেনাপতি যখন সসৈন্যে নগরাভিমুখে অগ্রসর হন; তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে একব্যক্তি ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বেশভূষা বিমলিন। সুতরাং ভিখারী মনে করিয়া কেহই তাহার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। ঐ ব্যক্তি কিন্তু সেনাপতির সহিত তুফান খাঁর রসালাপ সমস্তই শুনিতে পাইয়াছিল। শুনিয়া অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া, সে গঙ্গার দিকে চলিয়া যায়। এদিকে সেনাপতি ও তুফান খাঁ ক্রমশঃ বড়নগরের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হন।

ভিখারীর ন্যায় মলিনবেশে যে ব্যক্তি গঙ্গার দিকে চলিয়া যায়, কে সে ব্যক্তি? বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মহারাণী ভবানীর

কন্যা তারাসুন্দরীকে অপহরণ করিবার জন্য ফৌজ প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে ভিখারীর চিন্তার কারণ কি?

কারণ কি, ভিখারীই বলিতে পারে। কিন্তু যখন সিরাজের সৈন্যদল আসিয়া রাজপুরী আক্রমণ করিল; তাহাদের অস্ত্র-সঞ্চালনে ভবানীর প্রহরী সৈন্য দুই একজন হতাহত হইল, তাহারা প্রাসাদের সিংহদ্বার ভঙ্গ করিয়া বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; সেই সময়—একি?—সেই ভিখারীর এ মূর্ত্তি কেন? ভিখারী, রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, শত শত ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী সঙ্গে লইয়া গঙ্গার দিক্ হইতে "হর-হর বম্-বম্" শব্দে প্রাসাদপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। প্রাসাদের পূর্ব্বপ্রান্তে ভাগীরথীতীরে অবতরণের জন্য একটী ফটক ছিল; সন্ন্যাসীর দল সেই ফটক উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রাঙ্গণে উপনীত হইল।

সন্ন্যাসীর দল সহসা যখন নবাব-সৈন্যদলের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল; সকলেরই বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সকলেই মনে করিল,—সতীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য যেন সদল-বলে সতী-পতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এই সময় ভবানীর ভৃত্যগণও দ্বিগুণ উৎসাহে যুঝিতে লাগিল। সন্ন্যাসিদলেও অস্ত্র অস্ত্রের অভাব ছিল না। তাঁহারাও কেহ ত্রিশূল, কেহ তরবারি, কেহ বন্দুক চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অভাবনীয়।

সিরাজের ফৌজ যখন রাণী ভবানীর দুয়ারে,—যখন সন্ন্যাসীদিগের সহিত সিরাজী সৈন্যদিগের সংঘর্ষ চলিতেছে, তখন জগন্মোহিনী তারা কোথায়? তারা তখন অন্তঃপুরের একটী ঘরে একখানি শাণিত ছুরিকা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের নিকট রাখিয়া, যুক্তকরে জগদীশ্বরকে ডাকিতেছেন। সম্মুখে একখানি কৃষ্ণমূর্ত্তি ছিল। মাঝে মাঝে, সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া তারা কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছেন,—"ঠাকুর! তুমি দ্রৌপদীর মান রাখিয়াছিলে, আজ এই দুঃখিনী তারাকে তোমারই রক্ষা করিতে হইবে।" ভবানী তখন, প্রকৃতই গলিতকুন্তলা উন্মাদিনী ভবানী! তাঁহার নয়নে অশ্রু, অথচ হৃদয়ে দৈত্যদলনীর প্রতাপ-প্রভাব। প্রথমে তিনি তাঁহার সৈনিকদিগের এবং শেষে সেই সন্ন্যাসীদিগের খবর লইতেছিলেন। আর, মাঝে মাঝে তারার ঘরে উঁকি মারিয়া তারার মুখচ্ছবিতে সতীর সেই লোকাতীত শক্তি-প্রভা এবং সেই এক প্রকার দেবোন্মাদের লক্ষণ দর্শন করিয়া, প্রাণে সাহস পাইতেছিলেন। ধন্য ভবানীর প্রাণ! ভবানীর তখন এই কামনা, জগদীশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, তারা তাহার বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরির আঘাত করিয়া, স্বর্গে চলিয়া যাউক; এবং তারার বক্ষঃস্রুত পবিত্র শোণিতে বঙ্গের শত সতী, বালিকা ও যুবতী আপনার প্রাণ লইয়া রক্ষা পাউক। মায়ের প্রাণ এরূপ না হইলে, তাহার উদরে তারার মত মেয়ে জন্মিবে কেন?

অনেকক্ষণ জয়-পরাজয় বুঝিতে পারা গেল না।

ইতিমধ্যে সন্ন্যাসিদলভুক্ত একজন অশীতিপর বৃদ্ধ, সিংহ-বিক্রমে নবাব-সৈন্সের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তুফান খাঁকে আক্রমণ করিল। তুফান খাঁ বাধা দিতে গিয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইলেন। তারপর তিনি অকথ্য ভাষায় বৃদ্ধের প্রতি গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ তাঁহার মুখের উপর পদাঘাত করিল। বৃদ্ধের উদ্দীপনায় সন্ন্যাসি-দলের সকলের হৃদয়ে কি যেন এক নবীন উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। তখন, সকলেই স্ব স্ব প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নবাবসৈন্সের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

সেই সময় নবাব-সৈন্সের নিক্ষিপ্ত একটী গুলি আসিয়া হঠাৎ বৃদ্ধের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল। বৃদ্ধ অমনি সে প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিল। "জয় মা গঙ্গা"—বলিয়া ছুটিয়া গিয়া, সে অমনি গঙ্গার গর্ভে ঝাঁপ দিল। তারপর ভাগীরথীর ক্রোড়েই বৃদ্ধের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

মহারাণী ভবানী দ্বিতলের ছাদে দাঁড়াইয়া সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। বৃদ্ধের প্রতি যতই তাঁহার দৃষ্টি পড়িতেছিল, ততই তিনি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিতেছিলেন। তিনি এক একবার ভাবিতে-ছিলেন,—'কে এ বৃদ্ধ?' এক একবার তাঁহার মনে হইতেছিল—'বৃদ্ধ তাঁহার পরিচিত!' তখন, যেন স্বপ্নের ন্যায় কি এক পুরাতন স্মৃতি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার অন্য কথা স্মরণ হওয়ায়, আপনার দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়াছে বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছিলেন। আরও তখন এতই বিশৃঙ্খলা, এতই কোলাহল যে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিবার অবসরই বা ঘটিল কৈ? সুতরাং কে সে বৃদ্ধ? তখন আর তাহার সন্ধানই হইল না!

যাহা হউক, নবাব-সৈন্য যাহা ভ্রমেও কখনও কল্পনাও করে নাই, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। সৈন্যদল বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত ও

হতাহত হইয়া, অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। এদিকে এই ব্যাপার, অন্যদিকে সন্ন্যাসিদলের কতকগুলি লোক, সৈন্যদিগের পলায়নের পথ রোধ করিয়া রহিল। সত্বর সিরাজউদ্দৌলার নিকট কোনও সংবাদ পৌঁছিতে না পারে, সে বন্দোবস্ত তাহারা পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং—সৈন্যদল যাহারা পলাইল, তাহাদের অধিকাংশকেই সেদিন উত্তরের দিকে পলাইতে হইল।

যিনি সেনাধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে এবং তুফান খাঁকে সন্ন্যাসীরা বন্দী করিয়া রাখিল।

পাঠক! বুঝিতে পারিলেন কি?—কে সেই ভিখারী, আর কে এই সন্ন্যাসিদলের নেতা?

ভিখারী—সদানন্দ স্বামী। সন্ন্যাসিদলের নেতৃরূপে সমরাঙ্গনে আবির্ভূত হইয়া তিনিই আজ এইরূপে সতীর ধর্ম্মরক্ষা করিলেন। এই ঘটনার পরবর্ত্তী কালে ইতিহাসে তিনিই "মস্তরাম বাবাজী" নামে অভিহিত হইয়া আছেন।

এইবার আপনারা হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—হঠাৎ এই গঙ্গার ধারে, এই সশস্ত্র সন্ন্যাসীর দল কি প্রকারে সদানন্দ স্বামী সংগ্রহ করিলেন?

অন্নপূর্ণারূপিণী ভবানীর অন্নসত্রে গঙ্গার তীরে নিত্য নিত্য অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী অন্ন প্রাপ্ত হইত। পরসেবা-ব্রতধারী সন্ন্যাসীর দল, সদানন্দ স্বামীর ইঙ্গিত-ক্রমে, অনেকদিন হইতেই সেই অন্ন-সত্রে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবে বলিয়াই যে, তিনি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা নহে; তবে দেশে অরাজকতা-হেতু কোন্ দিন কোথায় কোন্ বিপত্তি উপস্থিত হয়; আর সেই বিপত্তি দূরীকরণে তাঁহাদের সহায়তার প্রয়োজন

হয়, তাই তাঁহারা সহর-সান্নিধ্যে, আশানুরূপ আশ্রয় পাইয়া, গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তারা-রক্ষা।

সিরাজের সৈন্যদল পলায়ন করিল বটে, সেনাপতি ও তুফান খাঁ সন্ন্যাসীদিগের নিকট বন্দী হইলেন বটে, আপাততঃ মানসম্ভ্রম রক্ষা হইল বটে ; কিন্তু শেষরক্ষার উপায় কি ?

নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন এই সংবাদ শ্রবণ করিবেন, তিনি যখন শুনিবেন, তাঁহার সৈন্যদল বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত ও অপমানিত হইয়াছে, তিনি কি তখন স্থির থাকিতে পারিবেন ? রোষে, ক্ষোভে বিচলিত হইয়া নিশ্চয়ই তিনি অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন। তিনি যদি অপমানের প্রতিশোধ প্রদানে উত্তেজিত হন, কে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিবে ? তাঁহার বিরাট বাহিনী আসিয়া পুরী আক্রমণ করিয়া যখন কামানের গোলা বর্ষণ করিবে, তখন রাজপুরী কে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ?

দয়ারাম রায়, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর,—সকলেই এইবার সেই চিন্তায় আকুল হইলেন। সদানন্দ স্বামীও সেই সময় তাঁহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন, দয়ারাম রায় ও চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর উভয়েই সদানন্দ-স্বামীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। এখন তিনি সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার সেই অসাধারণ কার্য্য কলাপ উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সদানন্দ স্বামী তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন,—"সে সব কথা আর কেন? এখন শেষ রক্ষার চিন্তাই বিষম চিন্তা। পাপিষ্ঠ সিরাজ নিশ্চয়ই এ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যগ্র হইবে। আপনারা তাহার উপায় কিছু চিন্তা করিয়াছেন কি?"

দয়ারাম রায় উত্তর দিলেন,—"তাহাই তো আমরা ভাবিতেছি। উদ্ধত যুবক সিরাজ-উদ্দৌলার রোষাবেগ নিবৃত্তি করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কি করিব বলিতে পারেন কি?"

সদানন্দ স্বামী।—"আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন; যদি যুক্তিযুক্ত হয়, সে উপায় গ্রহণ করিতে পারেন।"

দয়ারাম।—"আপনি কি উপায় স্থির করিয়াছেন? আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। এ যাত্রা নাটোর-রাজ্য রক্ষার যদি কোন উপায় নির্দ্ধারিত করিতে পারেন, নাটোর-রাজ্য আপনার কেনা হইয়া থাকিবে।"

সদানন্দ স্বামী।—"আমি মনে করি, তারাসুন্দরীকে লইয়া এখন এখান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। যতক্ষণ তারাসুন্দরী জীবিত থাকিবে, সিরাজের পাপ পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্তি পাইবে না।"

দয়ারাম। পলাইলেই বা নিষ্কৃতি কোথায়? সিরাজ, নাটোর ধ্বংস করিবে, দেশে দেশে খুঁজিয়া বেড়াইবে। সে কি সহজে প্রতি-নিবৃত্ত হইবার পাত্র?"

সদানন্দ স্বামী।—"সে বিষয়েও আমি চিন্তা করিয়াছি। তারা-সুন্দরীকে এখান হইতে রওনা করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনা-দের স্নান-ঘাটে আমরা এক চিতানল প্রজ্বালিত করিব। চিতানল প্রজ্বালিত করিয়া, সহরের চারিদিকে রাষ্ট করিয়া দিব, তারাসুন্দরীর মৃত্যু হইয়াছে; চিতানলে তাহারই দাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।"

দয়ারাম।—"পাপিষ্ঠ বিশ্বাস করিবে কি ?"

সদানন্দ।—"সে ভার আপনার উপর। আপনি চেষ্টা করিলেই সে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে।"

দয়ারাম।—"কি করিলে তাহার প্রতীতি জন্মিতে পারে ?"

সদানন্দ স্বামী।—"আপনাকে সিরাজের নিকট গিয়া বলিতে হইবে, তারাসুন্দরী কঠিন পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন,—তাই সেদিন আপনার পরোয়ানা পাইয়াও তাহাকে পাঠাইতে পারি নাই; সে সারিয়া উঠিলে, আপনার নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিতাম।"

সদানন্দ স্বামীর কথা শেষ হইতে না হইতে, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর রোষাভাবে উত্তর দিলেন,—"এর চেয়ে কামানের গোলাতে আমাদের সপুরী ধ্বংস হওয়াই শ্রেয়ঃ নহে কি ?"

সদানন্দ স্বামী কহিলেন,—"উতলা হইবেন না, আমি যাহা বলিতেছি, আগে মন দিয়া শুনুন, তার পর কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"ভাল আপনি কি বলিবেন, বলুন।"

সদানন্দ স্বামী।—"পাঠাইয়া দিতাম বলিয়াই দুঃখ প্রকাশ করিয়া আপনি হা-হুতাশ করিবেন। বলিবেন, সেই দিনই আপনার সৈন্য-দলের সমক্ষেই তারাসুন্দরীর মৃত্যু হইয়াছে।"

দয়ারাম।—"সৈন্যদল যদি অস্বীকার করে ?"

সদানন্দ স্বামী।—"সেই জন্যই ত, সেনাপতিকে ও তুফান খাঁকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। তাহাদের দ্বারাও নবাবকে এই কথাই বলাইতে হইবে।"

দয়ারাম।—"তাহারা বলিতে স্বীকার পাইবে কি ?"

সদানন্দ স্বামী।—"প্রাণের দায়ে বলিতে হইবে। আমি এখনই তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইব।"

দয়ারাম।—"যদি তাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে?"

সদানন্দ স্বামী।—"আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে, এতটা মনের বল তাহাদের কখনই নাই। সে বল যদি থাকিত, তাহারা কখনই সিরাজের এই পাপ-কার্য্যের সহায়তা করিতে আসিত না।"

দয়ারাম ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—"সিরাজের নিকট কথাটা উত্থাপনের ভার আমাকেই লইতে হইবে? অন্য লোকের উপর সে ভার অর্পণ করিলে চলিত না কি?"

সদানন্দ স্বামী।—"মিথ্যা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। সতীর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, শত শত নর-নারীর জীবনরক্ষার জন্য মিথ্যা বলিতে দোষ আছে কি?"

দয়ারাম।—"না—না, আমি তা বলিতেছি না। যদি অন্যের দ্বারা সিরাজের বিশ্বাস জন্মাইতে পারি, তাহাতে কোনও আপত্তি আছে কি?"

সদানন্দ স্বামী।—"আপত্তি আবার কি? যে প্রকারে হউক, কর্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। এই যে গঙ্গার ধারে চিতানলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি তারাসুন্দরীর সৎকার-কথা প্রকাশ করিব, আমার মনে তো কৈ সে বিষয়ে কোনই দ্বিধা হইতেছে না!"

দয়ারাম।—"আপনি মহাপুরুষ, আমরা সংসারের কীট; আপনার সঙ্গে আমাদের কেন তুলনা করেন? যাহা হউক, আপনি যেমন উপদেশ প্রদান করিবেন, আমরা সেই মত কার্য্য করিতেই সম্মত হইলাম।"

অতঃপর, কি ভাবে, কোথায় কাহার সঙ্গে তারাসুন্দরীকে পাঠান হইবে, তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল।

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর কহিলেন—"এ বিষয়ে এক যুক্তি আমার মনে

খণ। তারাসুন্দরীকে লইয়া যদি কেহ এখন মথুরার শেঠদিগের ভবনে আশ্রয় লইতে পারেন, আমি ভরসা করি, আত্মরক্ষার সম্ভাবনা আছে।"

দয়ারাম জিজ্ঞাসিলেন,—"কাশীধামে পাঠাইলে হানি ছিল কি?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"সিরাজ জানে, কাশীতে আমাদের আশ্রয় আছে; সুতরাং তাহার অনুচরবর্গ নিশ্চয়ই কাশীতে সন্ধান লইবে। পাটনা আর কাশী, অতি নিকটবর্ত্তী স্থান। পাটনা সিরাজেরই রাজ্যভুক্ত।"

সেই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইল। চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র রুদ্রনারায়ণ সে ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহারই পরিচর্য্যাধীনে, ভবানীর গুরুদেব রঘুনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়, তারা-সুন্দরীকে লইয়া সেই দণ্ডেই মথুরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজবাড়ীর বজরা সর্ব্বদাই বড়নগরের ঘাটে প্রস্তুত থাকিত। আদেশ-মাত্র বজরা ছাড়িয়া দিল।

কিন্তু মহারাণী ভবানী কোথায় যাইবেন? সেও এক সমস্যার কথা নহে কি? ভবানী আপনি তাহার উত্তর দিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন,—"তারাকে নিরাপদ্ স্থানে রাখিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। আমার জন্য কোনই আশঙ্কা নাই। ভগবান্ না করুন, যদি সত্য সত্যই দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, মা-জাহ্নবী আমার জন্য ক্রোড় পাতিয়া আছেন, কেহ আমার কেশাগ্র স্পর্শ করিবা পূর্ব্বেই আমি মার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিব। এই গঙ্গাতীর, এই পীঠস্থান পরিত্যাগ করিয়া আমি অন্য কোথায়ও যাইতে চাহি না। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, কাহারও সাধ্য নাই আমার উপর অত্যাচার করিতে পারে।"

সেই সিদ্ধান্তই স্থির হইল। একদিকে তারাসুন্দরীকে লইয়া

মথুরার অভিমুখে বজরা রওনা হইল, এক দিকে চিতানল ধূ ধূ জ্বলিতে লাগিল, এক দিকে ভবানী দৃঢ়তায় বুক বাঁধিয়া প্রাসাদ আগুলিয়া রহিলেন।

অতঃপর সেনাপতি এবং তুফান খাঁর নিকট গমন করিয়া, সদানন্দ স্বামী তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলেন। বুঝাইলেন,—মিথ্যা কথা নহে! দেখাইলেন,—চিতানল ধূ ধূ জ্বলিতেছে! শাসাইয়া কহিলেন,—'যদি কখনও প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ কর, যমের হাতে নিষ্কৃতি পাইবে, কিন্তু আমার হাতে নিষ্কৃতি নাই।' তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণভয়ে সেই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল।

সহরময় রাষ্ট হইয়া পড়িল,—মহারাণীর কন্যা-বিয়োগ হইয়াছে। সহরের সকলেই বুঝিল,—তারাসুন্দরীর চিতানল জ্বলিতেছে। দয়ারাম রায়ও সিরাজকে সে কথা বুঝাইবার জন্য যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কে সে বৃদ্ধ ?

সকল সংশয় বিদূরিত হইল; কিন্তু একটী সংশয় মিটিল না তো?

কে সে বৃদ্ধ—অসীম সাহসে নবাব-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রলয়ের গতি ফিরাইয়া দিল?

বিদ্যুৎ-চমকের প্রায়, এক একবার সেই স্মৃতি, মহারাণীর হৃদাকাশে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। মহারাণী একবার ভাবিলেন,—"সেই

বটে! সেই সৌম্য সরল দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব! সেই বটে!" কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে পড়িল,—"সে তো অনেক দিন হইল মারা পড়িয়াছে—সে তো পদ্মার জলে হাঙ্গরের মুখে প্রাণ দিয়াছে!" তিনি আপনা-আপনিই কহিলেন,—"সে আবার কেমন করিয়া আসিবে? যে মরিয়াছে, সে কি কখনও ফিরিয়া আসে? না—না, সে কখনই নয়; আমি ভুল দেখিয়াছি।"

"ভুল দেখিয়াছি" ভাবিয়াও মহারাণী কিন্তু মনকে প্রবোধ দিতে পারিলেন না। পুনঃপুন মনে হইল,—"দৃষ্টিশক্তি কি এতই বিভ্রান্ত হইল? স্পষ্ট দেখিলাম—সেই—সে আমার 'বাসি-কাকা' ভিন্ন অন্য কেহ নয়! তবে কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? মহারাণী বিস্ময়ে আবেগে কহিলেন,—"বাসি-কাকা মরিয়াছে! তবে কি তাহার প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া আমাদের চোখে ধাঁধা দিয়া গেল?'

সংশয় দূর হইল না। মহারাণী, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের নিকট বৃদ্ধের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সদানন্দ স্বামীকেও ডাকাইয়া আনা হইল।

তখন আর, কোন কথাই জানিতে বাকী রহিল না। সদানন্দ স্বামী একে একে সকল কাহিনী বিবৃত করিলেন। কিরূপে কি ভাবে পদ্মার ধারে বদর গঞ্জের পর-পারে সেই বৃদ্ধকে তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিরূপে কেমন-ভাবে সেবা-পরিচর্য্যার ফলে সংজ্ঞাহীন বৃদ্ধের মৃতকল্প-দেহে জীবন-সঞ্চার হইয়াছিল; তার পর কিরূপে কেমন-ভাবে সন্ন্যাসীর দলে মিশিয়া বৃদ্ধ পর-সেবাব্রতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল;—জলন্ত জীবন্ত ভাষায় সদানন্দ স্বামীর মুখে তাহা ব্যক্ত হইল। সে ঘটনা—যিনিই শুনিলেন, তিনিই বিস্মিত হইলেন,—যিনিই অনুধাবন করিলেন,—তিনিই চমকিয়া উঠিলেন।

শুনিতে শুনিতে, মহারাণীর নয়নদ্বয় জলধারায় ভাসিয়া গেল। শুনিতে শুনিতে, শৈশবের সেই পুণ্যস্মৃতি তাঁহার মানস-দর্পণে পূর্ণ প্রতিভাত হইল।

কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল! সেই 'বাসি-কাকা'—শৈশবের সেই 'বাসি-কাকা'—মনে পড়িতেই আনন্দে প্রাণ উছলিয়া উঠিল। 'বাসি-কাকার' প্রাণভরা 'স্নেহ-ভালবাসা'—'বাসি-কাকার' হৃদয়-ভরা আদর-যত্ন-মমতা—একে একে সকল কথা মনে পড়িল। 'বাসিকাকা' রোগগ্রস্ত হওয়ায়, অকর্ম্মণ্য জরাজীর্ণ মনে করিয়া, তাহাকে বিদায় দেওয়ার স্মৃতি,—বৃশ্চিকদংশনবৎ মহারাণীর হৃদয়ে বিদ্ধ হইল! উমার করুণ ক্রন্দনে পিতার দয়ার সঞ্চার—কৃত্তিবাসের বৃত্তির ব্যবস্থা—মহারাণীর স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! কৃত্তিবাসের প্রভুপরায়ণতার অনন্ত প্রস্রবণ—প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য পদ্মার জলে হাঙ্গরের মুখে কৃত্তিবাসের আত্মবিসর্জ্জন,—যতই মনে পড়িতে লাগিল, মহারাণী বিস্ময়ে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। শেষে যখন বুঝিলেন,—কৃত্তিবাস পদ্মার গর্ভে হাঙ্গরের গ্রাস হইতে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া তাঁহার মান, সম্ভ্রম ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণদান করিল, তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আমায় অপরিশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ করিবার জন্যই বুঝি কৃত্তিবাস পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল।"

এই বলিয়াই মহারাণী চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৃত্তিবাসের বংশে এখন কে আছে, আপনি জানেন কি?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"না, আমি তো এ বিষয় কিছুই জানি না। ভাল, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তিনি বোধ হয় সমস্তই অবগত আছেন।"

সদানন্দ স্বামী অদূরেই বসিয়াছিলেন। চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একে একে সকল কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি

বলিলেন,—"কৃত্তিবাসের একটী পুত্র, পুত্রবধূ ও স্ত্রীমাত্র এখন তাহার সংসারে বিদ্যমান আছে।"

পুত্র ও পুত্রবধূ শুনিয়া, একটু বিস্মিত হইয়া, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—কৃত্তিবাসের পুত্রের বয়ঃক্রম কত?—সে কি করে?"

সদানন্দ স্বামী।—"তাহার বয়ঃক্রম সতের আঠার বৎসর। গত বৎসর তাহার বিবাহ হইয়াছে। বিষয়-কর্ম্ম সে এখন তেমন কিছুই করে না। শুনিতেছি, মৌলবীর নিকট একটু একটু পারসী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"তবে তাহাদের সংসার-যাত্রা কি প্রকারে নির্ব্বাহিত হয়?"

সদানন্দ স্বামী।—"আজ্ঞে, মহারাণীর পিতৃদেব যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই কায়ক্লেশে এখনও তাহাদের সংসার চলিয়া থাকে। এখন, হরিদাসের যদি কোথাও কাজকর্ম্ম জোটে, তাহাদের দুঃখ ঘুচিতে পারে।"

বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাসের পুত্রের নাম হরিদাস।

মহারাণী শুনিয়া, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরকে কহিলেন,—"কৃত্তিবাসের পুত্র হরিদাসকে রাজসংসারে আনিয়া কাজকর্ম্ম শিখানর ব্যবস্থা করিয়া দেন, আর কৃত্তিবাসের পরিবারবর্গের কখনও কোনরূপ কষ্ট না হয়, তাহারও উপায় বিধান করুন।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"ভাল, সন্ন্যাসী ঠাকুরের দ্বারা আমি শীঘ্রই তাহাদিগের তত্ত্ব লইতেছি। আপনার যাহা ইচ্ছা, তদনুসারেই কাজ হইবে।"

মহারাণীর অভিপ্রায় শুনিয়া, সদানন্দ স্বামীরও আর আহ্লাদের অবধি রহিল না। যে কৃত্তিবাস পরার্থে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, তাহার

পুত্র-পরিজনের প্রতি ভগবান্ আপনিই যে সদয় হইবেন—তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি ?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নূতন বিপত্তি।

তারাসুন্দরীর মৃত্যুসংবাদ, বিবিধ প্রকারে পল্লবিত হইয়া, সিরাজের নিকট উপস্থিত হইল।

সিরাজ প্রথমেই শুনিলেন,—"তারাসুন্দরীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সেনাপতি প্রভৃতি স্বচক্ষে সে মৃত্যু দেখিয়া আসিয়াছেন।"

কয়েক দিন পরেই আবার সংবাদ পাইলেন,—"তারাসুন্দরীর মৃত্যুসংবাদ কল্পনামাত্র। তাঁহাকে অপহরণ করিতে গিয়া, সৈন্যদল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।"

কিন্তু কোন্‌টী সত্য—কোন্‌টী মিথ্যা—তদন্ত করিবার আর অবসর হইল না। চঞ্চল মনোবৃত্তি এক পথে বাধা পাইয়া অন্যপথে প্রধাবিত হইয়াছিল;—তদন্তের পক্ষে তাহাও এক বিঘ্ন বলা যাইতে পারে বিশেষতঃ এই সময়ে অল্পদিনের মধ্যেই নানাদিকে সিরাজ বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

কলিকাতা হইতে দূত ফিরিয়া আসিল। ইংরেজ গবর্ণর ড্রেক, সিরাজের হস্তে কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন,—আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর বাঙ্গালার সুবে-দারী লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত; খুব সম্ভব, ঘেসেটী বেগমের পালিত-পুত্রই সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। ঘেসেটী বেগমের দক্ষিণ

হন্ত, কৃষ্ণদাসের পিতা, রাজা রাজবল্লভ রায় সেইরূপ সংবাদই তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস যেদিন কলিকাতায় উপনীত হন, গবরণর ড্রেক, সেদিন কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার তাৎকালিক শান্তিরক্ষক পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হলওয়েল সাহেব, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় প্রদান করেন। কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, হলওয়েলের সহিত পরামর্শ করিয়াই, সিরাজের দূতকে ড্রেক ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

বিফল-মনোরথ হইয়া দূত প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সিরাজ ক্রমশঃ জানিতে পারিলেন, ইংরাজেরা কলিকাতায় নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করি-তেছে। সিরাজ, ইংরেজদিগকে দুর্গনির্ম্মাণে পুনরায় নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন; কলিকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলে, নবাবের নিকট ইংরেজ-দিগের কোনরূপ আনুকূল্য প্রাপ্তির আশা থাকিবে না,—সেই সূত্রে নবাব তাহাও তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন।

কিন্তু ইংরেজ-গবরণর সে ক্ষেত্রেও চাতুরী খেলিলেন। তিনি উত্তর দিলেন,—"নূতন খাদ বা নূতন কেল্লা প্রস্তুত করিতেছি না, পুরাতনেরই সংস্কার করিতেছি। ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা; তাই সাবধানতা অবলম্বিত হইতেছে।" এই উত্তরে সিরাজ অধিকতর বিরক্ত হইলেন। সামান্য বণিকদল পুনঃপুন তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিতেছে; সুতরাং সিরাজ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সওকৎজঙ্গকে দমন করিবার জন্য সৈন্য-পরিচালনা করিয়াছিলেন। রাজমহল হইতে সেই সৈন্য রাজধানীর দিকে ফিরাইয়া আনিলেন।

ইংরেজের কাশীমবাজারের কুঠী অবরুদ্ধ হইল। তিন সহস্র অশ্বারোহী, দুইটী হস্তী ও বহুতর পদাতিক সৈন্য সহ ওমরবেগ জমা-দার কাশীমবাজার অবরোধ করিয়া বসিলেন। কোম্পানীর অধ্যক্ষ

ওয়াট্‌স সাহেব সামান্ত কয়েকজন সৈন্ত লইয়া কাশীমবাজারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নিরুপায় হইয়া, তিনি নবাবের শরণাপন্ন হইলেন। সিরাজ তাঁহাকে কতকগুলি সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া লইলেন। ওয়াট্‌স কয়েক বর্ষের বাণিজ্য-করের হিসাব প্রদানে এবং তৎসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণে বাধ্য হইলেন। কলিকাতার বাগ্‌বাজার-পল্লীতে কর্ণেল পেরিং পেরিংপীয়েণ্ট নামক দুর্গপ্রাকার নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন; ওয়াট্‌স সেই দুর্গপ্রাকার ভগ্ন করিতে এবং কলিকাতায় হলওয়েলের ক্ষমতা সংযত করিতে স্বীকার পাইলেন। এইরূপে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন কাশীমবাজারের কুঠী আত্মসমর্পণ করিল; কুঠীর কামান এবং গোলাগুলি নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। কুঠীর কেহ বন্দী হইলেন; কেহ বা পলায়নের অনুমতি পাইলেন।

কিন্তু ইহাতেও সিরাজের রোষানল নিবৃত্তি পাইল না। তিনি কলিকাতা আক্রমণ করিতে উদ্‌যোগী হইলেন। বহু সহস্র সৈন্ত কলিকাতা আক্রমণে প্রস্তুত হইল। গবরণর ড্রেক, নিরুপায় হইয়া, চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি চন্দননগরে ফরাসীদিগের নিকটও সাহায্যের প্রার্থনা জানাইলেন। ওলন্দাজরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল না। ফরাসীরাও বলিয়া পাঠাইল,—"কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যদি চন্দননগরে আসিয়া আমাদের আশ্রয় গ্রহণ কর, আমরা তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারি।"

কলিকাতাই যদি ছাড়িতে হইল, তবে আর বাকী রহিল কি? কলিকাতাই যদি পরিত্যাগ করিতে হইল, তাহা হইলে নবাবের সহিত বিবাদ করিয়াই বা ফললাভ হইল কি? গবরণর ড্রেক, নানাস্থানের ইংরেজ-কুঠীতে সংবাদ পাঠাইয়া কলিকাতা-রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন নবাবের সৈন্য কলিকাতা আক্রমণ করেন। কলিকাতার কুঠী বা ইংরেজদিগের দুর্গ গঙ্গার তীরেই অবস্থিত ছিল। তাহার দৈর্ঘ্য, পূর্ব্ব-পশ্চিমে দুই শত দশ গজ; বিস্তার, দক্ষিণে একশত ত্রিশ গজ এবং উত্তরে একশত গজ মাত্র। দুর্গের চারিদিকে কামান পাতিবার চারিটা আড্ডা ছিল; এক এক আড্ডায় দশ দশটা করিয়া তোপ সজ্জিত থাকিত। কিন্তু নবাবের বিপুলবাহিনীর নিকট সে দুর্গ কতক্ষণ টিকিতে পারে? বিশেষতঃ কলিকাতার পূর্ব্বদিক্ দিয়া, মহারাষ্ট্র-খাত উত্তীর্ণ হইয়া নবাবসৈন্য যখন দুর্গ আক্রমণে প্রধাবিত হয়, তখন দুর্গের বাহিরে যেখানে যে রক্ষিসৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল, সকলেই পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

দুর্গ আক্রমণের অব্যবহিত পরেই, কি জানি কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হয় মনে করিয়া, দুর্গাভ্যন্তরস্থ বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইয়া, একখানি নৌকায় চড়িয়া গবরণর ড্রেক পলায়ন করিলেন। তখন হলওয়েলের উপর দুর্গরক্ষার ভার পড়িল। হলওয়েল প্রথমে দুর্গরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু পরিশেষে বাধ্য হইয়া নবাবের নিকট তিনি সন্ধির প্রার্থনা জানাইলেন। ইংরেজশিবিরে শ্বেত পতাকা উড্ডীন হইল। ২০শে জুন সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজের কলিকাতার দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। সেনাপতি মীরজাফরের সহিত নবাব সিরাজউদ্দৌলা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলে, সকলেই নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণদাস প্রভৃতিও নবাবের হস্তে বন্দী হইলেন। দুর্গ অধিকার করিয়া, সিরাজউদ্দৌলা যেরূপ অর্থসম্পত্তি লাভ করিবেন, মনে করিয়াছিলেন; কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া, সিরাজ কেবলমাত্র পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। বন্দিগণের মধ্যে কৃষ্ণদাস প্রভৃতি কয়েকজনকে নবাব সেইদিনই মুক্তি দিলেন।

অপরাপর যাহারা বন্দী রহিল, আপনার কয়েকজন কর্ম্মচারীর উপর তাহাদিগের পরিচর্য্যার ভার প্রদান করিয়া, নবাব দুর্গজয়ের আনন্দ-উৎসবে মত্ত হইলেন। দুর্গজয়ের নিদর্শনস্বরূপ কলিকাতা 'আলিনগর' বা ভগবানের মন্দির নামে অভিহিত হইল। সেই আলিনগর হইতেই পরবর্ত্তি-কালে 'আলিপুর' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

দুর্গজয়ের পর যাহারা সিরাজ-হস্তে বন্দী হইল, তাহাদিগকে যে গৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহারই নাম—'ব্লাকহোল' বা 'অন্ধকূপ'। সেই অন্ধকূপ—ক্ষুদ্র কুটীর; দৈর্ঘ্য-প্রস্থ পরিমাণ-ফল—মাত্র আঠার বর্গ-ফিট্; বায়ু-সমাগম-শূন্য গভীর অন্ধকারময়। দ্বার রুদ্ধ করিলে দুইটী মাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া অল্পমাত্র বায়ু চলাচলের সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র গৃহে একশত ছচল্লিশ জন বন্দীকে সারারাত্রি আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল।

একে গ্রীষ্মকাল, তাহাতে গৃহ বায়ুসমাগম-শূন্য, অধিকন্তু এতাধিক লোকের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে পরিপূর্ণ; সে অবস্থায় মানুষের প্রাণ কতক্ষণ বাঁচিতে পারে? বন্দিগণ সারারাত্রি পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিল; শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া তাহাদের গাত্র দিয়া অবিরাম ঘর্ম্মনিঃসরণ হইতে লাগিল। কেহ বা "জল জল" বলিয়া চীৎকার করিল, কেহ বা "মরিলাম মরিলাম" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া বাহির হইয়া—জমাদার জল দিতে গেল, কিন্তু গবাক্ষের নিকট সকলেই "জল জল" করিয়া অগ্রসর হওয়ায়, প্রবলের পদতলে দুর্ব্বল পিষ্ট হইল, কেহ বা মাথার টুপি বাড়াইয়া দিয়া জল লইবার বৃথাই চেষ্টা পাইল।

এইরূপে সারারাত্রি অতিবাহিত হইলে, প্রভাতে কারাদ্বার উন্মুক্ত হইল। রক্ষিগণ দেখিতে পাইল,—বন্দীদিগের মধ্যে একশত তেইশ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অবশিষ্ট কয়েকজন মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে!

দুর্গাধ্যক্ষ হলওয়েল এবং একটী স্ত্রীলোক সেই জীবিতগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হলওয়েলের বর্ণনাতেই অন্ধকূপহত্যার এই লোমহর্ষণ বিবরণ ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। এখন যদিও কেহ কেহ এ ঘটনার প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দিহান হইতেছেন; কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে একেবারে ইহা মুছিয়া ফেলিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

কলিকাতার দুর্গ অধিকার করিয়া সিরাজউদ্দৌলা জয়োল্লাসে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হুগলীর ফৌজদার মাণিকচাঁদ তিন সহস্র সৈন্য সহ কলিকাতা অধিকার করিয়া রহিলেন। মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই সিরাজ আদেশ দিলেন,—"তাঁহার অধিকার মধ্যে ইংরেজদিগের যে সকল ধনসম্পত্তি আছে, সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা হউক।" তবে মাতামহীর অনুরোধে হলওয়েল-প্রমুখ ইংরেজ বন্দিগণকে তিনি মুক্তিদান করিলেন।

ইংরেজের এই দুর্ঘটনার সংবাদ অল্পদিনের মধ্যে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। গবরণর ড্রেক সাহেব পলাইয়া গিয়া প্রথমে গোবিন্দপুরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতার দুর্গ নবাবের অধিকারভুক্ত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি ভাটার পথে পল্‌তার দিকে চলিয়া গেলেন। সেখানে অন্যান্য স্থান হইতে ইংরেজের রণতরীসমূহ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারে—এই আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে মাদ্রাজে ও বোম্বাই সহরেও এই সংবাদ উপস্থিত হইলে, তত্রত্য কর্তৃপক্ষগণও বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তখন কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য জলপথে ও স্থলপথে নানাদিক্ দিয়া ইংরেজের সৈন্যগণ কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই সময় ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন হুগলী নদীর মোহানা দিয়া অগ্রসর হইয়া বজবজ হইতে স্থলপথে কলিকাতা আক্রমণের বন্দোবস্ত করিলেন। ডিসেম্বর মাসে ইংরেজসৈন্য সহসা নবাবসৈন্যগণকে

আক্রমণ করিল। মাণিকচাঁদের উপর নগর-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া সিরাজউদ্দৌলা নিশ্চিন্ত ছিলেন; মাণিকচাঁদের সৈন্যবল ইংরেজের সৈন্য অপেক্ষা অধিক হইলেও, তিনি কিন্তু নবাবের মর্য্যাদা-রক্ষায় সমর্থ হইলেন না; তাঁহাকে হটাইয়া দিয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী দুই সহস্রাধিক সৈন্য সহ, ক্লাইব কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। ঘোর যুদ্ধ চলিল। ইংরেজ সৈন্য সর্ব্বদা নবাব-সৈন্যের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইল বটে; কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ণয় হইল না। এদিকে সন্ধির প্রস্তাব চলিতে লাগিল। অগত্যা নবাবও সন্ধি-সর্ত্তে সম্মত হইলেন। সেই সন্ধির ফলে, ইংরেজেরা কলিকাতার দুর্গের দৃঢ়তা-সম্পাদনে অনুমতি পাইলেন, তাঁহাদের ব্যবসায-বাণিজ্য অপ্রতিহত-গতিতে চলিতে লাগিল। ইংরেজের যুদ্ধ-জাহাজ-সমূহ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার মধ্যে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে সিরাজউদ্দৌলা নানা অন্তর্বিপ্লবে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা শওকৎজঙ্গ—তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহিলেন না। শওকৎজঙ্গ নবাবী লাভের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সহজে সিরাজকে প্রধান বলিয়া মানিতে চাহিলেন না। ফলে, শওকৎজঙ্গের সহিত সিরাজের তুমুল সমর আরম্ভ হইল। যুদ্ধে প্রথমে শওকৎজঙ্গ জয়লাভ করিলেন। সিরাজের সৈন্য পশ্চাতে হটিয়া আসিল। শওকৎজঙ্গ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত শ্রবণমানসে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় সহসা সিরাজের সৈন্য তাঁহার শিবির আক্রমণ করিতে গেল। কিন্তু তখন তিনি অহিফেন-সেবনে আত্মজ্ঞানশূন্য; কি করিয়া যুদ্ধ করিবেন? তাঁহার সেনাপতি তাঁহাকে সেই অবস্থাতেই হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। একজন

ভৃত্য হস্তীর উপর শওকৎজঙ্গকে ধরিয়া রহিল! শওকৎজঙ্গ পুত্তলিকাবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সহসা এক বন্দুকের গুলিতে হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়াই শওকৎ জঙ্গের ইহলীলা সাঙ্গ হইল। রাজা মোহনলালকে সঙ্গে লইয়া, সিরাজউদ্দৌলা পূর্ণিয়ায় প্রবেশ করিলেন। শওকৎজঙ্গের সমস্ত ধন রত্ন লুণ্ঠিত হইল। তাঁহার পুত্রপরিজনগণ বন্দিভাবে মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। শওকৎজঙ্গের শব-কঙ্কাল কয়েক দিন নগরতোরণে বিলম্বিত রহিল।

সিরাজের সিংহাসনের এক প্রতিদ্বন্দ্বী শওকৎজঙ্গের জারিজুরী ফুরাইল। তখন তাহার অপর প্রতিদ্বন্দ্বী ঘেসেটী বেগমের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য সিরাজ বদ্ধপরিকর হইলেন। ঘেসেটী বেগমের মতিঝিল মহল সিরাজউদ্দৌলা লুঠিয়া লইলেন। ঘেসেটী বেগম প্রকারান্তরে সিরাজের হস্তে বন্দী রহিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এ সকল ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল।

কিন্তু ইহাতেও সিরাজ নিষ্কৃতি পাইলেন কি? পথের কণ্টক দূর করিয়া, তিনি একটু হাঁপ ছাড়িবেন বলিয়া, মনে করিতেছেন; ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল,—ইংরেজেরা সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া, চন্দননগর আক্রমণ করিয়াছেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইউরোপে ইংরেজে ও ফরাসীতে বিষম সমর উপস্থিত হয়। সেই সমর-সংবাদ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবামাত্র, ক্লাইব চন্দননগর আক্রমণ করিলেন; —নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন চন্দননগরের ফরাসীকুঠী লক্ষ্য করিয়া তোপ দাগিতে লাগিলেন।

ফরাসীরা প্রথমে অতুল উৎসাহে ইংরেজদিগের গতিরোধ করিল। কিন্তু পরিশেষে তাহারা আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইল। তখন চন্দননগর ইংরেজদিগের অধিকৃত এবং তত্রত্য ফরাসী অধিবাসিগণ অনেকেই বন্দী হইল।

এই যুদ্ধে ফরাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত নবাব হুগলির ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমারকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। অধিকন্তু সেনাপতি দুর্লভরামকেও সসৈন্তে হুগলিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের প্রলোভনে পড়িয়া নন্দকুমার আপনি তো ফরাসী-দিগকে সাহায্য করেনই নাই, অপিচ, দুর্লভরামকেও পথ হইতে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

ফরাসীরা সন্ধিসূত্রে সিরাজের মিত্র মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সিরাজের বিনানুমতিতে ইংরেজ কেন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করি-লেন?—ইহাতে সিরাজ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন; তাঁহার হৃদয়ে আবার রোষানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি উদ্বেগের পর নূতন উদ্বেগে ভাসমান হইলেন।

তারাসুন্দরীর মৃত্যু হইল, কি তিনি বাঁচিয়া রহিলেন,—সে সংবাদ সিরাজ, আর কখন লইবেন? সে অবসর তাঁহার আর ঘটিয়া উঠিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

সেই বাড়ী! সেই প্রকোষ্ঠ! সেইরূপ লোক-সমাগম! সেইরূপ পরামর্শ-সভা।

কেন?—আবার জগৎশেঠের বাড়ী কিসের পরামর্শ?

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়াছেন! মহারাজ মোহনলাল আসিয়া-ছেন! রাজা নন্দকুমার আসিয়াছেন! রাজা রাজবল্লভ আসিয়া-

ছেন! সেনাপতি দুর্লভরাম আসিয়াছেন! সেনাপতি মীরজাফর আসিয়াছেন! সেনাপতি লতিফ খাঁ আসিয়াছেন। এদিকে আবার চিকের অন্তরালে মহারাণী ভবানী পর্য্যন্ত উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার প্রতিনিধিরূপে চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন।

নাটোর-রাজপরিবারের সহিত জগৎশেঠের পরিবারবর্গের পূর্ব্ব-হইতেই প্রীতিসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল; সুতরাং মহারাণী ভবানীও জগৎশেঠের বাড়ীতে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

আজ জগৎশেঠ স্বয়ং পরামর্শসভার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। আজ তিনি প্রথমে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইবার চেষ্টা পাইলেন। প্রথমেই তিনি কহিলেন, —"আজ আমরা বড়ই গুরুতর বিষয়ের পরামর্শের জন্য সমবেত হইয়াছি। সে পরামর্শের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে একটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইবে! সে প্রতিজ্ঞা,—বিশেষ কিছু নহে; প্রতিজ্ঞা—এই পরামর্শসভায় যে সকল কথা-বার্ত্তা হইবে, যে বিষয়ের আলোচনা চলিবে,—তাহা অপর কাহারও নিকট আমরা কদাচ প্রকাশ করিব না। পরামর্শ-সম্বন্ধে যদি কাহারও মতানৈক্য হয়, তিনি অনায়াসে যথেচ্ছভাবে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন; কিন্তু সভার আলোচ্য বিষয় তিনি কখনও প্রকাশ করিতে পারিবেন না। যদি এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে কাহারও আপত্তি থাকে, এই পরামর্শসভায় যোগদান করা,—তাঁহার কখনই কর্ত্তব্য নহে। কার্য্যতঃ সভার পরামর্শে কেহ যোগদান করুন বা না করুন, কিন্তু সকলকেই এই পরামর্শের বিষয় গোপন রাখিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন,—ইহাই আমি বুঝিয়া লইতেছি। এ প্রতিজ্ঞায় যদি

কাহারও আপত্তি থাকে, তিনি সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।"

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কেহই এই প্রতিজ্ঞায় আপত্তি করিলেন না; বিশেষ কেহ কোনরূপ উত্তরও দিলেন না। যে পরামর্শই হউক না কেন, তাহাতে যোগদান করেন বা না করেন,—তাহা অপরের নিকট কেহই প্রকাশ করিবেন না,—এইরূপ প্রতিজ্ঞায় বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইল না। তখন, 'মৌনং সম্মতিলক্ষণং' মনে করিয়া জগৎশেঠ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"অদ্যকার পরামর্শ— নবাব সিরাজউদ্দৌলার নবাবীর বিষয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার অত্যাচারে দেশমধ্যে যেরূপ আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে, সত্বর তাহার নিবৃত্তি করা প্রয়োজন। যে অপরাধের জন্য আমরা সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছিলাম, সিরাজ তদপেক্ষা অধিক অপরাধী। সিরাজ ঘোর উচ্ছৃঙ্খল—ঘোর অত্যাচারী। সিরাজ নৃশংস—সিরাজ নর-হত্যাকারী! তাঁহার দ্বারা বঙ্গসিংহাসন কলুষিত হইতে বসিয়াছে; সুতরাং অবিলম্বে তাঁহাকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করা আবশ্যক! আমি ভরসা করি, আপনারা সকলেই সে বিষয়ে একমত হইবেন।"

জগৎশেঠ নানা কারণে সিরাজের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ। নবাবী-প্রাপ্তির কয়েক দিন পরেই সিরাজউদ্দৌলা তাঁহাকে অপমান করিয়া-ছিলেন। জগৎশেঠ যথাসময়ে সিরাজের পক্ষ হইতে বাদশাহের রাজস্ব প্রদান করিয়া সনন্দ আনাইয়া দিতে পারেন নাই; পরন্তু সিরাজের প্রতিপক্ষ শওকৎজঙ্গ বাদশাহী সনন্দলাভের ষড়যন্ত্র করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—তাহাতে জগৎশেঠের প্রতি সিরাজের দারুণ ক্রোধের সঞ্চার হয়। তার পর ঘেসেটি বেগমের পোষ্যপুত্রের

সিংহাসন প্রাপ্তির পক্ষে জগৎশেঠ গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন ;—কাণাঘুষায় সে সংবাদ শুনিয়াও সিরাজের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ; সুতরাং নবাবী-প্রাপ্তির কয়েক দিন পরেই সিরাজ জগৎশেঠকে বন্দী করেন। কথাটা সর্ব্বত্র প্রচারিত না হইলেও জগৎশেঠ সে অপমান মর্ম্মে মর্ম্মে পোষণ করিয়া আসিতে-ছিলেন। আজ তাঁহার সেই প্রতিশোধ-গ্রহণের সুযোগ উপস্থিত। সুতরাং তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করিয়া সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। মীরজাফর দুর্লভরাম লতিফর্খা প্রমুখ সিরাজের প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ আজ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক।

জগৎশেঠের উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অনেকেই সিরা-জের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কহি-লেন,—"সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার সময় আমি একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। কিন্তু নবাব সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচার এতই অসহনীয় যে, শেঠজীর প্রস্তাবে আমার আদৌ অসম্মতি নাই। যেরূপে হউক, সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেনাপতিগণ প্রায় সকলেই এখানে উপস্থিত আছেন। আমি ভরসা করি, তাঁহারা সকলেই এ বিষয়ে একমত হইয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিবেন।"

প্রায় সকলেরই মুখ উৎসাহপূর্ণ, কেবল মোহনলাল ম্রিয়মাণ। তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, জগৎশেঠ কহিলেন,—"মহারাজ মোহনলাল! আপনার এ বিষয়ে মত কি?"

মোহনলাল, সিরাজের বাল্য-সহচর। সিরাজের সিংহাসন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি সিরাজের 'দেওয়ান' বা গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। সিংহাসন-প্রাপ্তির পরই সিরাজ তাঁহাকে মহামন্ত্রিপদ

প্রদান করেন। মোহনলাল—'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত হইয়া পাঁচ সহস্রাধিক অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক-পদ প্রাপ্ত হন। ইতিহাসে প্রকাশ,—মোহনলাল, আপন ভগিনীকে সিরাজের করে অর্পণ করিয়া, মোগল সম্রাট্ আকবরের দরবারে মানসিংহের ন্যায় সিরাজের দরবারে প্রাধান্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, জগৎশেঠের প্রশ্নে মোহনলাল উত্তর দিলেন,— আপনারা বড়ই ভ্রমে পড়িয়াছেন। কোনও বিষয়ে তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে, তাঁহাকে সাবধান করা কর্ত্তব্য। তিনি সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তাঁহার উচ্ছেদ-সাধনের পরামর্শ কোন ক্রমেই সমীচীন নহে। আমরা সকলেই তাঁহার আশ্রয়-লাভে সংবর্দ্ধিত। আশ্রয়-তরুর মূলোচ্ছেদন, উচ্ছেদকারীরই সর্ব্বনাশ-সাধক। আমার প্রার্থনা—আপনারা এ ষড়যন্ত্রে প্রতিনিবৃত্ত হউন। নবাবের কোনও দোষ-সংশোধনের জন্য তাঁহাকে যদি কিছু জানাইবার প্রয়োজন হয়, আমি তাহার ভার লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনারা কখনই এরূপ ঘৃণিত পরামর্শে মন কলুষিত করিবেন না।"

মোহনলাল যখন প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে-ছিলেন, মীরজাফরের মুখমণ্ডলে তখন গভীর চিন্তার ও হতাশের চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছিল!

মীরজাফর ভাবিতেছিলেন,—"এই জন্যই আমি মোহনলালকে এ সভায় আহ্বান করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। মোহনলাল যে এ বিষয়ে প্রতিবাদী হইবে, আমি পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিয়া-ছিলাম। যদি মোহনলালের মতেই সকলের মত হয়, তাহা হইলে আমার আশা-ভরসা সকলই বিলুপ্ত হইতে চলিল। তবে কি আমার সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হইবে? ইংরেজ আমাকে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া

দিয়াছে,—নবাবী আমার। কোনও প্রকারে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিলে, ইংরেজ এ মসনদে আমাকেই বসাইবে—প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। আমিও তাই ইংরেজকে সাহস দিয়াছি,—আমি সসৈন্যে ইংরেজের সহিত নবাবের বিরুদ্ধে যোগ দিব। যদি অদ্যকার ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হয়; যদি এই ষড়যন্ত্রের বিষয় নবাবের কর্ণগোচর হয়;—তাহা হইলে তো বিপত্তির অবধি থাকিবে না! তবে কি হইবে? কি করিব? উপায় কি? সত্যসত্যই কি খোদা বাঙ্গালার নবাবী আমার ভাগ্যে লিখেন নাই?"

মীরজাফর এইরূপ চিন্তাকুলিতচিত্ত; মোহনলাল তেজোগর্বের সহিত কহিতেছেন,—"এই ঘৃণিত পরামর্শে কেহই যোগ দিবেন না; এই ঘৃণিত পরামর্শে সকলেরই বিরত হওয়া কর্ত্তব্য।"

জগৎশেঠ সেই সময় বজ্র-গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"ঘৃণিত পরামর্শ! যে পিশাচ, মূর্ত্তিমান পাপ-অবতার; যাহার নিকট কোনও পাপকর্ম্ম হেয় বলিয়া উপেক্ষিত হয় না, তাহাকেই আমরা আবার সিংহাসনে রাখিতে চাহিতেছি?—ধন্য—আমাদের শ-বৃত্তি।"

মোহনলালের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া আসিল। মোহনলাল উত্তর দিলেন,—"যাহারা অন্নদাতা প্রভুর বিরুদ্ধে এরূপ ষড়যন্ত্র করিতে পারে, তাহাদের ন্যায় কৃতঘ্ন আর দ্বিতীয় নাই। আপনাদের যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারেন; আমি কোন মতেই আপনাদের পরামর্শে যোগ দিতে পারিব না; এ বিষয়ে আপনাদের সহিত আমার অণুমাত্র সহানুভূতি নাই। এ সকল কথার আলোচনাও আমি পাপ বলিয়া মনে করি।"

এই বলিয়া, মোহনলাল সভাস্থল পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক সান্ত্বনা-চ্ছলে কহিলেন,—"আপনি রাগ করিতেছেন কেন? চিরদিনই কি পদা-

ঘাত সহ্য করা যায়? সামান্যরূপ প্রতিবিধানের চেষ্টা করাও কি কর্ত্তব্য নহে?"

মোহনলাল গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—"আমি স্বীকার করি—অত্যাচারের প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সে কি এইরূপে সম্ভবপর? নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনাদের কি ফল লাভ হইবে? আপনারা চিরদাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া আছেন। এক সিরাজ যাইলে অপর সিরাজ আসিয়া আপনাদের উপর প্রভুত্ববিস্তার করিবে। আপনাদের সেই প্রভুই যে আবার এতদপেক্ষা অত্যাচারী না হইবেন, তাহাই বা কে বলিল? হাঁ, বুঝিতাম—যদি আপনাদের তেমন সামর্থ্য থাকিত; বুঝিতাম—যদি আপনারা আত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া, নবাবের রাজ্য অধিকার করিয়া লইতে পারিতেন; আমার কোনই আপত্তি ছিল না। কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় ষড়যন্ত্রে আমি কখনও যোগ দিতে পারি না।"

মোহনলাল অনুরোধ শুনিলেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে উপেক্ষা করিয়া, হাত ছিনাইয়া, তিনি পরামর্শ-সভার সংস্রব ত্যাগ করিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার সময় সেনাপতি লতিফ খাঁ অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—"কিন্তু দেখিবেন, যেন প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিবেন না।" মোহনলালের কর্ণে সে শব্দ বজ্রবৎ ধ্বনিত হইল। মোহনলাল সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন,—"হিন্দু কখনও প্রতিজ্ঞা করিয়া ভঙ্গ করে না। সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষায় হিন্দু কখনও পরাঙ্মুখ নহে।"

মোহনলাল চলিয়া গেলেন। নিষ্কণ্টকে পরামর্শ চলিতে লাগিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন,—"সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে না পারিলে, আমাদিগের আর গত্যন্তর নাই। তাহার অত্যাচার অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবারে যে সুযোগ উপস্থিত, কোনক্রমেই তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে!"

মহারাজ নন্দকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইরেজ-বণিকৃদিগের কথা বলিতেছেন তো? তাহাতে আমাদের সুবিধা হওয়ার কি সম্ভাবনা?"

জগৎশেঠ নিজেই উত্তর দিলেন,—"আমাদের সুবিধা ষোল আনা। বণিক্ ইংরেজগণ নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমাদেরই মনোনীত ব্যক্তিকে নবাবী প্রদান করিবেন বলিয়াছেন! তাঁহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছেন; বাণিজ্য করিয়াই চলিয়া যাইবেন। বণিক্জাতি রাজ্য লইয়া কি করিবেন? তাঁহারা রাজ্য চাহেন না; কেবলমাত্র আমাদের উপকারার্থ, অনুগ্রহ করিয়া, আমাদিগকে সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছেন।"

মীরজাফর কহিলেন,—"শেঠজি সত্যই বলিয়াছেন। বণিক্ ইংরেজদিগের সহিত এ সম্বন্ধে আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা স্পষ্টতই আমার নিকট সেই অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইংরেজ-সেনাপতি ক্লাইব অতি সজ্জন লোক। আপনারা যেরূপ বলিবেন, তিনি তাহাই করিতে সম্মত আছেন। বণিক্প্রবর উমিচাঁদ সাক্ষাৎভাবে অনেক দিন ইংরেজের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আমি তাঁহাকেও এই পরামর্শ-সভায় আনিয়াছি। ক্লাইবের মহত্ত্বের কথা তিনি বিশেষরূপেই বলিতে পারিবেন।"

উমিচাঁদ আপনা-আপনিই বলিলেন,—"ক্লাইব দেবতা! ইংরেজের মহত্ত্বের অবধি নাই। আমি আজ দশ বৎসর কাল ইংরেজের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, ইংরেজ আদৌ জানেন না।"

উমিচাঁদ কলিকাতার একজন মহাজন। নবাব আলিবর্দ্দীর অনুগ্রহে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া উমিচাঁদ কলিকাতায় ব্যবসায় করিতে

গিয়াছিলেন। ব্যবসায়-সূত্রে তিনি সময় সময় ইংরেজদিগকে ঋণদান করিতেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা যেদিন কলিকাতা লুণ্ঠন করেন; উমিচাঁদের বাণিজ্য-কুঠীও সেদিন লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরেজগণ নবাবের বিরুদ্ধে কিরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছেন, আর সেই ষড়যন্ত্রে কে কে লিপ্ত আছেন; উমিচাঁদ সমস্তই অবগত ছিলেন। উমিচাঁদ পাছে সেই ষড়যন্ত্রের বিষয় সিরাজউদ্দৌলার নিকট প্রকাশ করেন, সেই আশঙ্কায় উমিচাঁদকে হস্তগত করিবার জন্য, ক্লাইব এক কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন! সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক উমিচাঁদের বাণিজ্য-কুঠী লুণ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার যে ক্ষতি হইয়াছিল, ক্লাইব উমিচাঁদের সেই ক্ষতিপূরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। উমিচাঁদের সহিত তাঁহার সর্ত্ত হইয়াছিল,—মুর্শিদাবাদ অধিকৃত হইলেই, তিনি উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন। সেই প্রলোভনেই উমিচাঁদ আজ ক্লাইবকে দেবতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তখনও উমিচাঁদ জানিতে পারেন নাই—ক্লাইব তাঁহার সহিত কি প্রতারণা খেলিয়াছেন।

ইংরেজদিগের সহিত যখন গোপনে গোপনে মীরজাফরের সন্ধি-বন্দোবস্ত ধার্য্য হয়; উমিচাঁদ সেই সময় ক্লাইভকে বলিয়াছিলেন,—"মীরজাফরের সহিত আপনাদের যে সন্ধিপত্র হইবে, তাহাতে আমার ত্রিশ লক্ষ টাকার কথা উল্লেখ থাকা আবশ্যক।" ক্লাইবের কিন্তু বরাবরই উমিচাঁদকে ফাঁকি দেওয়া উদ্দেশ্য; সুতরাং তিনি দুইখানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত করেন। একখানি আসল; একখানি জাল। আসলখানি সাদা কাগজে এবং জালখানি লাল কাগজে লিখিত হয়। আসলখানিতে উমিচাঁদের নাম-গন্ধ ছিল না; কিন্তু জালখানিতে উমিচাঁদকে টাকা দিবার কথা উল্লেখ ছিল। উমিচাঁদ ক্লাইবের সে

চাতুরী বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার না বুঝিবার পক্ষেও ক্লাইব ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার ক'রিয়াছিলেন।

যেমন উমিচাঁদ, তেমনই মীরজাফর, আবার তেমনই লতিফ খাঁ, তিনজনই ক্লাইবের নিকট প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন; ক্লাইব লতিফ খাঁকেও নবাবী পদ প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন; আবার মীরজাফরকেও বঙ্গ-সিংহাসনে বসাইবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; উমিচাঁদকে টাকা দিবার প্রলোভন—সে তো ছিলই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই তিন জন কেহই আপন কথা অপরের নিকট ব্যক্ত করেন নাই।

যাহারা প্রবঞ্চক, তাহারা আপনার দলস্থ লোককেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

যাহা হউক, মীরজাফরের এবং উমিচাঁদের মুখে ইংরেজের গুণ-গাথা শ্রবণ করিয়া, সকলেই যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন; সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল,—সেনাপতি-গণ ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিবেন। স্থির হইল,—জগৎশেঠ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অর্থ সরবরাহ করিবেন।

এই সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন,—"আমরা সকলেই তো একমত হইলাম; কিন্তু মহারাণী ভবানীর তো কোনই মত লওয়া হইল না? তিনি যখন উপস্থিত আছেন, তাঁহাকেও একবার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য নহে কি?"

জগৎশেঠ কহিলেন,—"আপনি বলিতেছেন, ভাল জিজ্ঞাসা করাইতেছি! কিন্তু তাঁহাকে কি আর মতামত জিজ্ঞাসা করিতে হয়? পাপিষ্ঠ নবাব তাঁহার পবিত্র কুলে কলঙ্ক লেপন করিতে গিয়াছিল; তাহার প্রতিশোধ-গ্রহণে তিনি কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না।"

এই বলিয়া, জগৎশেঠ চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"কেমন ঠাকুর মহাশয়! এই কথাই ঠিক কি না?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিলেন,—"মহারাণীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কোন উত্তর দিতে পারিতেছি না।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন,—"হাঁ হাঁ,—ঠিক কথাই বলিয়াছেন। ভাল, আপনি জানিয়া আসুন। আমাদের মতেই যে তাঁহার মত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। তথাপি তিনি যখন উপস্থিত আছেন, তাঁহার সম্মানের জন্যও তাঁহার অভিমত গ্রহণ আবশ্যক।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর মহারাণীর নিকট গমন করিলেন। এদিকে একে একে সকলে সিরাজের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে লাগিলেন।

মহারাণীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সকলে যাহা মনে করিয়াছিলেন, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর তাহার বিপরীত উত্তর লইয়া আসিলেন। চন্দ্র-নারায়ণ ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"মহারাণী বলিলেন,—আপনাদের পরামর্শের অনেক অংশ—যুক্তিযুক্ত, সন্দেহ নাই। নবাব অত্যাচারী হইয়াছেন; তিনি যাহাতে সংযত হন, তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া আমা-দের অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু সে পক্ষে যে উপায় পরামর্শসভায় পরি-গৃহীত হইতেছে, তাহা সমীচীন নহে। প্রথমতঃ যাঁহাদের সাহায্যে নবাবকে দমন করিবার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি, তাঁহারা কখনই নিঃস্বার্থ নহেন। আমরাও যে অনেক স্বার্থান্ধ হইয়া নবাবের মূলোচ্ছেদে যত্নবান্, তাহাতেও সংশয় নাই। রাজ্যের উপকার অপেক্ষা পরস্পরের স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষাই যেখানে বলবতী সেখানে শ্রেয়োলাভের আশা কোথায়?"

মীরজাফর বাধা দিয়া কহিলেন,—'আমরা পরস্পর স্বার্থপর হইতে পারি; কিন্তু ইংরেজ কখনই স্বার্থপর নহেন। নবাবকে

সিংহাসনচ্যুত করিয়া বাঙ্গালার নবাবী তাঁহারা আমাদিগেরই হস্তে প্রদান করিবেন—প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর উত্তর দিলেন,—মহারাণী এ কথারও উত্তর দিয়াছেন। এই যড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে ইংরেজের ঐ প্রতিজ্ঞাই প্রধান অন্তরায়। দেশের পক্ষে এ প্রতিজ্ঞা কোন ক্রমেই মঙ্গলজনক নহে।

"কেন,—কেন?"—বলিয়া বিস্ময়ে সকলেই চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর কহিলেন,—"আপনারা আগে আমার সকল কথাগুলি বলিতে দেন। তার পর, আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। ইংরেজ নবাবী গ্রহণ করিতে চাহেন না, রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক,—ইহাতে মহারাণী কেন ভয় পাইলেন—শুনিবেন? মহারাণী বলেন,—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বণিকের দল। তাহারা লাভের আকাঙ্ক্ষায় বিদেশে আসিয়াছে; কিন্তু রাজকার্য্য সকল সময়ে লাভজনক নহে। প্রজারক্ষা না হইলে, রাজস্ব আদায় হয় না। আবার রাজস্ব আদায় না হইলে, রাজার লাভ হয় না। কিন্তু যাহারা বণিক্, তাহারা উপর উপর লাভ করিতে চান। প্রজার অবস্থা যাহাই হউক, তাঁহাদের গণ্ডা তাঁহাদের পাওয়াই চাই—ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে পরাঙ্মুখ, অথচ রাজস্বের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি—বড়ই ভয়ানক কথা নহে কি?"

জগৎশেঠ কহিলেন,—"যদি তাঁহারা রাজ্যভারই গ্রহণ করেন?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"মহারাণী সে কথারও উত্তর দিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বণিক্ সম্প্রদায়; প্রজার মমতা তাঁহারা কি বুঝিবেন? যদি ইংলণ্ডের অধীশ্বর স্বয়ং আসিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিতেন, কোনই আপত্তি ছিল না; কিন্তু রাজ্যের সহিত

বণিক্‌দিগের কি সম্বন্ধ? বণিক্‌সম্প্রদায় বাণিজ্য করিতে আসিয়াছেন; জাহাজ ভরিয়া দেশের পণ্য লইয়া যাইবেন। দেশের প্রতি দৃক্‌পাতও করিবেন না।"

মীরজাফর কহিলেন,—"বণিক্‌দিগকে আমরা রাজ্যশাসনের ক্ষমতা দিব কেন?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর!—"মহারাণী সে উত্তরও দিয়াছেন,—আপনাদের আবার দেওয়া-নেওয়ার ক্ষমতা কি? তাঁহাদের সাহায্য ভিন্ন আপনারা আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন না। আপনারা আবার দেওয়া-নেওয়ার কথা কি বলিতেছেন? একবার সিরাজউদ্দৌলার পতন হইলে হয়! দেখিবেন—তখন সেই বণিক্‌দল আপনাদিগকে ক্রীড়ার পুত্তলীরূপে নাচাইতে আরম্ভ করিবে। মহারাণী বলেন,—আমরা ঘরে ঘরে বিবাদ করিয়া কেন বহিঃশত্রুকে প্রশ্রয় দিই?"

"ইংরেজ শত্রু"—এই কথা শুনিয়া, মহারাজ নন্দকুমার কর্ণে হস্ত প্রদান করিলেন। কহিলেন,—"ইংরেজকে শত্রু বলিবেন না। ইংরেজ আমাদেরই হিতসাধনের জন্য চেষ্টা পাইতেছেন।" সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন,—"সিরাজ অমিতব্যয়ী। সিরাজ অত্যাচারী।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কথায় চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর উত্তর দিলেন,—"মহারাণী তাহা সহস্রবার স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি বলেন,—সিরাজের অমিতব্যয়িতার ফলে, সুদূর ইউরোপখণ্ড লাভবান্ নহে। তাহাতেও দেশের অর্থ—দেশেই থাকিয়া যায়। কিন্তু বণিক্‌গণ যাহা লইয়া যাইবে, তাহাতে দেশের উপকার কি হইবে? আর অত্যাচারের কথা যাহা বলিতেছেন; সে অত্যাচারে, নবাবকে আমরা ধরিয়া পাইতেছি, তাঁহাকে সংযত করিবার চেষ্টাও খুঁজিতেছি।

কিন্তু বণিকের দল কখন কে কিরূপভাবে অত্যাচার করিবে, অত্যাচার করিয়া সহস্র যোজন দূরে চলিয়া যাইবে—কে তাহার সন্ধান লইবে? হাঁ, যদি রাজা স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিতেন; রাজ কর্ম্মচারীদের অত্যাচার-অবিচারের বিষয় অবশ্যই তাঁহাকে জানাইতে পারিতাম! কিন্তু রাজা কোথায়?

মীরজাফর কহিলেন,—"দূর ভবিষ্যতের ভাবনায় মহারাণী ব্যাকুল হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইতে বলুন। আমাদের হস্তে তরবারি থাকিতে, বণিক্‌গণ কখনই মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে না।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"মহারাণী যেটী প্রধান কথা বলিয়াছেন, সেটীও এখনও বলা হয় নাই। সে কথা প্রথমেই আমার বলা উচিত ছিল। মহারাণী প্রথমেই বলিয়াছেন,—রাষ্ট্রবিপ্লবের সহায়তা করা হিন্দুর ধর্ম্ম-বিগর্হিত কর্ম্ম। তিনি তাঁহার গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছেন,—যে জাতি রাষ্ট্রবিপ্লবের সহায়তা করে, তাহাদিগকে চির-পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হয়। মহারাণীর একান্ত ইচ্ছা—আপনারা এ ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যে কদাচ উৎসাহান্বিত হইবেন না। রাষ্ট্রবিপ্লবে ধর্ম্মহানি কর্ম্মহানি হয়; দেশের শিল্প-বাণিজ্য লোপ পায়। বসুন্ধরা শস্যদানে সঙ্কুচিত হন; দেশে দস্যুভীতি দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আসিয়া উপস্থিত হয়।"

কিন্তু সে কথায় কেহই আর কর্ণপাত করিলেন না। জগৎশেঠ কহিলেন,—"মহারাণী স্ত্রীলোক; তাই ভয় পাইতেছেন। কর্ত্তব্যসাধনে আমাদের কখনও নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে।"

জগৎশেঠের উৎসাহে, দুর্লভরাম, লতিফ খাঁ প্রভৃতি সকলেই সেই কথাই কহিলেন। তাঁহাদের উদ্দীপনার উদ্দাম তরঙ্গে মহারাণী ভবানীর পরামর্শ তৃণকণার ন্যায় ভাসিয়া গেল। পরামর্শ-সভায়

পাকাপাকি স্থির হইল,—সেনাপতিত্রয় সিরাজের সর্ব্বনাশ-সাধনে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পলাশী।

সিরাজ পূর্ব্ব হইতেই ষড়যন্ত্রের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সিরাজ পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট শুভফল প্রদান করিল না।

চন্দননগর ইংরেজদিগের অধিকারভুক্ত হইলে, ফরাসী-সেনাপতি মুসেল, নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া, ইংরেজদিগের দুরভিসন্ধির কথা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—নবাবের সেনাপতিগণ অনেকেই বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিবে। তিনি জানাইলেন,—"তাহারা অনেকেই ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে।" তিনি নবাবকে সাবধান করিয়া কহিলেন,—"আপনি এখনও সাবধান হউন। ইংরেজ আমাদের সহিত আপনার বিচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন,—আমরা আপনার সহায় থাকিলে ইংরেজ আপনার নখাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

এই সময়ে ইংরেজের নিকট হইতে নবাব এক পত্র পাইলেন। পত্রের মর্ম্ম,—ফরাসীকে আশ্রয় দিলে ইংরেজের সহিত নবাবের মিত্রতাবন্ধন ছিন্ন হইবে।

ইংরেজ নবাবের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া চন্দননগর অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাবের অদৃষ্ট মন্দ, তাই তিনি তখনও ইংরেজের

াধনে প্রয়াসী হইলেন। তখনকার মত ফরাসী-সেনাপতিকে বিহার-প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ফরাসী-সেনাপতি ল'র সঙ্গে উপযুক্তরূপ যুদ্ধায়োজন ছিল। সিরাজ কহিলেন,—"আপনি কিছুদিন বিহার-প্রদেশে অপেক্ষা করুন। আপনার আবশ্যকানুরূপ রসদ-পত্র নবাব-সংসার হইতেই সরবরাহ করা হইবে। তারপর আবশ্যক-মতে শীঘ্রই আপনাকে রাজধানীতে আনয়ন করিব।"

সেনাপতি ল'র যাইবার ইচ্ছা ছিল না। ইংরেজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই হউক, অথবা আশ্রয়দাতা নবাবের মুখ চাহিয়াই হউক, ল' বলিলেন,—"আমায় পাঠাইতেছেন বটে, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা যেন বলিতেছে—আপনার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

কিন্তু সিরাজ, ইংরেজের মুখ চাহিয়া, পাছে ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায়, সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না,— সেনাপতি ল'কে বিদায় দিলেন।

সিরাজ মুখে ল'কে বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু মনের চাঞ্চল্য দূর হইল না। ক্রমশঃ জানিতে পারিলেন,—সেনাপতি মীরজাফর ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন; আর তাঁহারই ষড়যন্ত্রের ফলে ইংরেজের প্রতিনিধি ওয়াট্স সাহেব মুর্শিদাবাদ হইতে পলাইয়া গিয়াছেন। সন্দেহ ঘনীভূত; কিন্তু উপায় কি? নবাব মীরজাফরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মীরজাফর দেখা করিতে আসিলেন না। নবাব মনে করিলেন,—"মীরজাফর বুঝি বা লজ্জায় সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন।" সুতরাং আপনিই শিবিকারোহণে মীরজাফরের ভবনে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মীরজাফর প্রথমে সঙ্কোচের ভাব, পরিশেষে অনুতাপ প্রকাশ করিলেন। তখন কোরাণ-স্পর্শে উভয়ে কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। মীরজাফর এবং সিরাজউদ্দৌলা

উভয়েই ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া কহিলেন,—"আমরা কোরাণ স্পর্শ করিয়া খোদার নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আজ হইতে আমাদের মিত্রতা-বন্ধন আজীবন অবিচ্ছিন্ন রহিল।" মীরজাফর আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"নবাবের সহিত ইংরেজের যে যুদ্ধায়োজন চলিয়াছে, আমি কোন ক্রমেই তাহাতে ইংরেজের সহায়তা করিব না; যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয়, আমি প্রাণপণে নবাবের সহায়তা করিব।" সিরাজ তাহাতেই বিশ্বাস করিলেন। কোরাণ-স্পর্শে প্রতিজ্ঞা করিয়া মুসলমান-সন্তান যে তাহার অন্যথা করিবে, সিরাজ ভ্রমেও তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি অকপটে মীরজাফরের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিলেন। এদিকে ইংরেজের সহিত বিবাদ যাহাতে পাকিয়া না উঠে, তৎপক্ষেও চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

ইতি মধ্যে ক্লাইব আবার সংবাদ পাঠাইলেন,—"যুদ্ধ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি শীঘ্রই নবাব-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সকল গণ্ডগোল মিটাইয়া লইবেন। নবাব শান্ত হউন। নবাব তাহাতেও আশ্বস্ত হইলেন। ইংরেজদিগের গতিরোধের জন্য মুর্শিদাবাদের প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ দক্ষিণে তিনি সৈন্যদল সমবেত করিতেছিলেন; ক্লাইবের উত্তর পাইয়া, এক্ষণে সেই সৈন্যদল ফিরাইয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু ক্লাইভের সে কেবল চাতুরী মাত্র। অবিলম্বেই তাঁহার সে চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িল। নবাব সংবাদ পাইলেন,—ইংরেজসেনা একে একে পাটলী কাটোয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; সুতরাং নবাবও আর নিরস্ত হইতে পারিলেন না। পলাশী-প্রাঙ্গণে সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ হইল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন। আজ উভয় পক্ষই পলাশীপ্রাঙ্গণে উপনীত। নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং তাঁহার মীরজাফরপ্রমুখ

সেনাপতিগণ পলাশী প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবার প্রায় বারো ঘণ্টা পরে রাত্রিযোগে ইংরেজ-সৈন্যগণ পলাশীর আম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরদিবস ২৩শে জুন, প্রভাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। উভয় পক্ষই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

নবাবের পক্ষে তখন প্রায় পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক, বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী এবং পঞ্চশতাধিক কামান সজ্জিত ছিল। ইংরেজদিগের পক্ষে মাত্র নয় শত ইউরোপীয় সৈন্য, একুশ শত সিপাহী সৈন্য এবং একশত তোপাসী সৈন্য যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। এ যুদ্ধে, কিছু না করিয়া নবাবের সৈন্যদল যদি একযোগে যাইয়া ইংরেজ সৈন্যের উপর পতিত হইত, তাহা হইলেও ইংরেজ-সৈন্য হস্তিপদতলে পতিত মশকের ন্যায় নিশ্চয় পিশিয়া মারা যাইত।

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী প্রতিকূল। দেবতা ও মানব সকলেই সিরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। রাত্রিতে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইল। সেই বৃষ্টিতে নবাবের বারুদগুলি ভিজিয়া গেল। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারিগণ একটা আচ্ছাদন দিয়াও তাহা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল না। পরন্তু প্রভাতে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহারা অনেকেই নবাবের সর্ব্বনাশ সাধনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। নবাবের অধিকাংশ সৈন্য—পঁয়তাল্লিশ সহস্রাধিক সৈন্য—মীরজাফর, দুর্লভরাম এবং লতিফ-খাঁ—এই বিশ্বঘাতক সেনাপতিত্রয়ের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছিল; আর অবশিষ্ট সৈন্য মাত্র লইয়া ফরাসী গোলন্দাজ সিনফ্রে, মীরমদন এবং মোহনলাল উত্তর দিক্ রক্ষা করিতেছিলেন। সহসা ইংরেজ-পক্ষের একটা গোলা আসিয়া মীরমদনকে আহত করিল। সঙ্গে সঙ্গে নবাবের বিশ্বাস-ঘাতক সেনাপতিত্রয় আপনাদের দৃঢ় উদ্দেশ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

মীরমদন নবাবের প্রিয় অনুচর। ফরাসী গোলন্দাজ সিনফ্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি অসীম সাহসে যুদ্ধ করিতেছিলেন। মীরমদন সহসা আহত হওয়ায়, সিরাজউদ্দৌলা শোকাচ্ছন্ন হইলেন। তিনি মীরজাফরকে নিকটে আনাইয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"এখন আপনিই আমার দক্ষিণহস্ত; আপনিই আমার বল-বুদ্ধি ভরসা। যাহাতে মানরক্ষা হয়, তাহার উপায় করুন।"

মীরজাফর ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"আপনার কোনও চিন্তা নাই। আজ যুদ্ধ স্থগিত থাক্। কাল আবার দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিব।"

সিরাজ কহিলেন,—"শত্রুগণ যদি সহসা আসিয়া অক্রমণ করে?"

মীরজাফর উত্তর দিলেন,—"আপনার সে ভাবনা নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সিরাজের মন প্রবোধ মানিল না। সিরাজ পুনঃপুন তাহাকে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু মীরজাফর কিছুতেই সে দিন যুদ্ধ চালাইতে সম্মত হইলেন না। বিশেষতঃ দুর্লভরাম এবং লতিফ-খাঁ আসিয়াও মীরজাফরের পরামর্শেই অনুমোদন করিলেন। দুর্লভ-রাম নবাবকে কহিলেন,—আপনি বরং মুর্শিদাবাদে চলিয়া যাউন; যাহা কিছু করিতে হয়, আমরাই তাহার ভার গ্রহণ করিলাম।"

ইহার পরই মীরজাফর এবং দুর্লভরাম সৈন্যগণকে শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ করিলেন।

সেনাপতি মোহনলাল কিন্তু যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহিলেন না। তিনি নবাবকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আজ যদি পশ্চাৎপদ হই; আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।"

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিত্রয় নবাবকে তখন মোহ-মায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল; সুতরাং মোহনলালের উত্তর শুনিয়া

নবাবের চৈতন্যোদয় হইল না। নবাব মোহনলালকে প্রত্যাবৃত্ত হইতেই আদেশ দিলেন।

বার বার তিনবার নবাব মোহনলালকে বারণ করিয়া পাঠাইলেন। সুতরাং মোহনলাল আর সে আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

মোহনলাল বুঝিলেন; সকলেই বুঝিল; কিন্তু সিরাজ বুঝিলেন না—তাঁহার কি সর্ব্বনাশ সাধিত হইল! মোহনলালের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবাব-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

হতাশে, বিষাদে, অনিচ্ছায় সেই যে তিনি রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তাহার পরই তিনি মুখ লুকাইলেন। রণক্ষেত্র হইতে তিনি যে কোথায় চলিয়া যান, সেই দিন হইতে তাঁহার আর কোনই সমাচার পাওয়া যায় না।

নবাব দুই সহস্র সৈন্যসহ উষ্ট্রারোহণে মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেলেন। মীরজাফর শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই ক্লাইবকে সকল অবস্থা বলিয়া পাঠাইলেন।

যুদ্ধ করিতে হইল না; একরূপ বিনা যুদ্ধেই পঞ্চাশটা মাত্র সৈন্য হতাহত হইবার পরই ক্লাইব পলাশী-যুদ্ধবিজয়ী বীর বলিয়া বিখ্যাতি লাভ করিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় ইংরেজ-সৈন্য নবাবের শিবির অধিকার করিয়া বসিল।

এইরূপে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুন, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে, সিরাজের গৌরবরবি পলাশীপ্রাঙ্গণে অস্তমিত হইল! ইতিহাসে ইহাই পলাশী-যুদ্ধ। ইংরাজের ভারতসাম্রাজ্যের ইহাতেই ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা।

পরদিন প্রভাতে সিরাজউদ্দৌলা রাজধানীতে উপনীত হইলেন, কিন্তু রাজধানী তখন আর তাঁহার পক্ষে নিরাপদ্ স্থান বলিয়া মনে হইল না। তিনি বুঝিলেন—চারিদিকেই ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁহাকে

ঘেরিয়া আছে। একে একে তাঁহার সৈন্যদলও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তখন যথাসম্ভব অর্থসম্পদ্ গ্রহণ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে সিরাজউদ্দৌলা 'মুনসুরগঞ্জ' প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন। লুৎফ-উন্নেসা বেগম তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না। সুতরাং দুই একটী পরিচারিকাকে এবং লুৎফ-উন্নেসাকে সঙ্গে লইয়া, হস্তীতে চড়িয়া সিরাজ উত্তর দিকে রওনা হইলেন। আশা করিলেন, পথে ফরাসী-সেনাপতি ল'সাহেবের সহিত মিলিত হইবেন, এবং তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া পুর্ণিয়ায় গিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইবেন।

কিন্তু পথে রাজমহলের পরপারে তাঁহার শেষ আশাটুকুও নির্ম্মূল হইল। ভগবানগোলা পর্য্যন্ত হস্তীতে যাইয়া তিনি নৌকা-যোগে গন্তব্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, মনে করিয়াছিলেন। রাজমহলের পরপারে নৌকা উপস্থিত হইলে, সিরাজ এবং তাঁহার সঙ্গীগণও ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন। নিকটেই দানা-সা নামক জনৈক মুসলমান দরবেশের আশ্রম ছিল। দরবেশের নিকট তিনি আপনাদের ক্ষুৎপিপাসার কথা জানাইলেন। দরবেশ পূর্ব্ব হইতেই সিরাজকে চিনিত; তাঁহার ছদ্মবেশ দেখিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিল। দরবেশ আদর সহকারে তাহাদিগকে আশ্রয় দিল! তাঁহাদের জন্য খিচুরীর বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

দরবেশ বিষকুম্ভ-পয়োমুখ। একদিকে সে অতিথিদিগকে আশ্রয় দিয়া অতিথিসেবার আয়োজন করিতে লাগিল; অন্যদিকে গোপনে গোপনে মীরকাশিমের নিকট পরপারে রাজমহলে সংবাদ পাঠাইয়া দিল। ক্ষুন্নিবৃত্তি আর হইল না; দরবেশের চক্রান্তে সস্ত্রীক সিরাজ-উদ্দৌলা শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন।

প্রথমে রাজমহলে পরিশেষে তাহাদিগকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন

করা হইল। যেদিন সিরাজউদ্দৌলাকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করা হয়, সেদিন মীরজাফর সহরে অনুপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পুত্র মীরণের হস্তে সিরাজের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল। নৃশংস মীরণ, পিতার আগমনের প্রতীক্ষা করিল না! সে মনে করিল,—"শিকার হস্তগত হইয়াছে; আর কালবিলম্ব করিব কেন?" এই মনে করিয়া, সে মহম্মদী বেগকে হস্তগত করিল। মহম্মদী বেগ সিরাজের সংহার-সাধনে সম্মত হইল। এই মহম্মদী বেগ সিরাজের মাতামহ আলিবর্দ্দীর অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল। সিরাজের নিকটেও সে অনেক সময়ে অনেক উপকার পাইয়াছিল। কিন্তু মীরণের প্ররোচনায় নরাধম মহম্মদী বেগ সে কথা ভুলিয়া গেল। কৃতঘ্নদিগের প্রকৃতিই এই।

বন্দিভাবে মুর্শিদাবাদে আনীত হইবার সময়, সিরাজউদ্দৌলা রক্ষি-সৈন্যদলের অধিনায়ককে বলিয়াছিলেন,—"আমায় যদি তাহারা জীবন-ভিক্ষা দেয়, আমি সামান্যমাত্র বৃত্তি লইয়াই তাহাদের ইচ্ছানুসারে যে কোন স্থানে বাস করিতে পারি।"

তাই, মহম্মদী বেগ যখন তাঁহাকে হত্যা করিতে তাঁহার কারাগৃহে প্রবেশ করিল, সিরাজ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি আমায় হত্যা করিতে আসিয়াছ? তবে কি তাহারা আমায় নির্জ্জন-বাসেও অনুমতি দিল না?" পরিশেষে সিরাজ আপনা-আপনিই উত্তর দিলেন,—"না—না—তাহারা আমায় বাঁচিতে দিবে কেন? আমি যে তাহাদের বড় আত্মীয় ভাবিয়া বড় বিশ্বাস করিয়াছিলাম।"

সিরাজের কথা শেষ হইতে না-হইতেই মহম্মদী বেগ সিরাজের বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত করিল। সিরাজ চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"আর না—আর না—এখনও কি প্রতিশোধ শেষ হইল না?" এক-বার—দুইবার—তিনবার—মহম্মদী বেগ পুনঃপুন তাঁহার বক্ষস্থল

বিদ্ধ করিল। সিরাজ একবার 'জল-জল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; একবার 'খোদা-খোদা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন। কিন্তু শেষবার আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না।

যৌবনের উন্মেষ-সময়ে, বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, কয়েক মাস মাত্র সিংহাসন লাভ করিয়াই, বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্যে এইরূপ অপঘাত-মৃত্যু বিহিত হইল!

সিরাজের হত্যাকাণ্ডের পর, নৃশংসগণ তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত শব-দেহ হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিল। সিরাজের জননী আমিনা-বেগম, পুত্রের নিধন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে যখন রাজপথে বহির্গত হন; শববাহক হস্তী আপনিই পথিমধ্যে বসিয়া পড়ে। তখন, সেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শবদেহ ক্রোড়ে করিয়া সিরাজের জননী কাঁদিতে কাঁদিতে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

এদিকে ২৯শে জুন প্রভাতে ক্লাইব রাজধানী মুর্শিদাবাদ সহরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সাত শত মাত্র সৈন্য। তাহাদের নগর-প্রবেশ দেখিবার জন্য মুর্শিদাবাদের রাজপথের দুই ধারে কাতারে কাতারে লোক জমিয়া গিয়াছিল; সেদিনও যদি লোকে ক্লাইবকে বাধা দিত! ক্লাইব নিজের মুখেই বলিয়া গিয়াছেন,—'রাজপথে সমবেত জনশ্রেণী যদি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিত, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের রক্ষা ছিল না।' যাহা হউক, সেই দিনই রাজকোষ লুণ্ঠিত হইল; সেই দিনই ক্লাইব মীরজাফরকে মসনদে বসাইলেন; সেই দিনই মীরজাফরের সহিত টাকা লইয়া ক্লাইবের গণ্ডগোল বাধিল! রাজকোষ লুণ্ঠন করিলে ক্লাইব যাহা পাইবেন,—আশা করিয়াছিলেন, অথবা মীরজাফর তাঁহাকে যেরূপ প্রলোভন দেখাইয়া-ছিলেন; কার্য্যকালে ক্লাইব তত টাকা প্রাপ্ত হইলেন না। অবশেষে

অৰ্দ্ধেক টাকা নগদ দেওয়া স্থির হইল; অৰ্দ্ধেক টাকা তিন বৎসর পরিশোধ করার ব্যবস্থা রহিল।

উমিচাঁদ দুর্লভরাম প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারিগণ সকলেই আপন আপন কর্ম্মের ফলভোগ করিলেন। ক্লাইব যে জাল সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়া উমিচাঁদকে প্রতারিত করিয়াছেন;—তাহা জানিতে পারিয়া, উমিচাঁদ পাগল হইয়া গেল! কর্ম্মের ফল যাহার যেমন, কিছুই ঘটিতে বাকী রহিল না। সিরাজের অভিসম্পাতে বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু হইল।

রাণী ভবানী।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কীর্ত্তি-স্মৃতি।

সংসারে এক এক জন এক এক কার্য্যের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। যিনি রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছেন; তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুন। কিন্তু যিনি ইষ্টকার্য্য করিতে আসিয়াছেন; তিনি তাহাই করিয়া যাইবেন।

রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে, সিরাজের সিংহাসন—ক্রমান্বয়ে মীরজাফর ও মীরকাশিম অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাহাতে মহারাণী ভবানীর ধর্ম্ম-কর্ম্মে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিল না। তিনি প্রথম প্রথম আপনার বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি দেখিলেন না। দূর ভবিষ্যতে দুর্দ্দিন যে অপেক্ষা করিয়া আছে, যদিও মানসপটে তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদনে বরং তৎপরতা আনিয়া দিল।

মুর্শিদাবাদের হাঙ্গামা চুকিয়া গেলে, মহারাণী কাশীধামে গমন করিলেন। তখন কন্যা তারাসুন্দরীও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কথায় কথায় একদিন রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলাফলের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল।

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর কহিলেন,—"আমরা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম; সেরূপ বিঘ্ন আপাততঃ কিছুই দেখিতে পাই না; যতটা উতলা হইয়াছিলাম, তাহারও কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।"

মহারাণী ভবানী উত্তর দিলেন,—"বণিক্‌গণ সুকৌশলী। সুতরাং আপাততঃ আমাদের রাজত্বে বিশেষ কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিণাম ফল কোথায় যাইবে? একদিন না এক দিন সে পরিণাম আমাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই হইবে। কাষ্ঠে ঘুণ ধরিলে প্রথমে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু কাষ্ঠ ক্রমশঃ জর্জ্জরিত হইয়া আসিলে, আপনিই দমিয়া পড়ে। তবে সে ভবিষ্য-ভাবনায় আপাততঃ মনকে উদ্বিগ্ন করার কোনই প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া মহারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার সঙ্কল্পসাধনে আর বিলম্ব কি?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"সকলই প্রস্তুত হইয়াছে। কাশীর সীমানায় সীমানায় শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছি। এখন প্রতিষ্ঠা করিলেই হয়।

ভবানী।—"বাড়ীগুলি নির্ম্মাণের আর বাকী কি আছে?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর,—"তিনশত পঁয়ষট্টিখানি বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। দুই একখানির দরজা-জানালা আর বালির কাজ সামান্যমাত্র বাকী আছে।"

মহারাণী কহিলেন,—"আগামী পরশ্ব মাঘী পূর্ণিমা। আমি ইচ্ছা করিয়াছি,—মাঘী-পূর্ণিমার দিন হইতে প্রত্যহ এক একখানি বাড়ী উৎসর্গ করিব; আর সেই এক একখানি বাড়ী এক একজন

ব্রাহ্মণকে দান করিব। সেদিন হইতে উৎসর্গ আরম্ভ হইলে বাড়ীর অভাবে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না তো?”

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—“না, বিঘ্নের কোনই সম্ভাবনা নাই। কোন দিনই উৎসর্গ কামাই যাইবে না, সকল বাড়ীই প্রস্তুতপ্রায়। ভাল, আমি বড় দাদাকেও ডাকিয়া আনিতেছি।”

বড় দাদার নাম—নীলমণি ঠাকুর। তিনি চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের অগ্রজ। চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে বাহিরে গেলেন।

মহারাণীর পার্শ্বে তারাসুন্দরী বসিয়া ছিলেন। তিনশত পঁয়ষট্টিখানি অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে। আর সেই অট্টালিকাগুলি ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হইবে,—সে কথা শুনিয়া তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। আজ কয় দিন হইল, তিনি মথুরা হইতে মায়ের নিকট আসিয়াছেন। তিনি সকল কথা জানিতেন না; সুতরাং আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মা। এখানে এতগুলি বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার বিশেষ কোনও সার্থকতা আছে কি? আমি শুনিয়াছিলাম—গঙ্গাতীরে যে কোনও স্থানে ব্রাহ্মণকে বাড়ী দান করিলে বিশেষ পুণ্য আছে। বঙ্গদেশে গঙ্গাতীরে বহু স্থান জনশূন্য হইয়া আছে; এ সকল বাড়ীর কতকগুলি—সেখানে প্রতিষ্ঠা করিলেও চলিত না কি?”

ভবানী।—“মা! তুমি ভাল কথাই বলিয়াছ। ভগবান্ যদি দিন দেন, সে চেষ্টাও আমি করিব। যদি অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া দিতেও না পারি, ব্রাহ্মণকে ভূসম্পত্তি দান করিয়া বসবাস করাইবার ইচ্ছা আমার মনে অনেক দিন হইতেই জাগিয়া আছে। তবে যে এখানে বিশেষভাবে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ।”

তারাসুন্দরী।—"কি উদ্দেশ্য?"

ভবানী।—"মা! তুমি দেখিতেছ না কি—এই অন্নপূর্ণার লীলা-নিকেতন আজ শ্মশানভূমিতে পরিণত। একবার কালাপাহাড় এই পুণ্যভূমি ধ্বংস করিয়া গিয়াছে; তারপর দ্বিতীয় কালাপাহাড় আওরঙ্গজেব বাদশাহ, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সমস্তই ধূলিসাৎ করিয়াছে। যে পুণ্যভূমি প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণের সামগানে মুখরিত হইত; সেখানে এখন আর একটীও ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শত শত ব্রাহ্মণের কণ্ঠে এখানে "জয় বিশ্বেশ্বর" "জয় অন্নপূর্ণা" ধ্বনি প্রতি-নিয়ত ধ্বনিত হইত; কিন্তু এখন আর মা! ক্বচিৎ তাহা শুনিতে পাই। কাশীধামের ন্যায় পবিত্র তীর্থসমূহ যদি এইরূপে শ্রীভ্রষ্ট হয়, এবম্বিধ তীর্থের মাহাত্ম্যের প্রতি যদি লোকে আকৃষ্ট না হয়, তবে আর জীবের মুক্তির পথ কোথায় রহিল? আমরা তাই আবার কাশীধামকে পূর্ব্ববৎ শ্রীসম্পন্ন দেখিতে চাই। ব্রাহ্মণের বাস ভিন্ন কাশীধামের প্রকৃত শোভা কি বর্দ্ধিত হইতে পারে? ব্রাহ্মণই তীর্থক্ষেত্রের ভূষণ-স্থানীয়। সেই ব্রাহ্মণই যদি না রহিল, তবে পুণ্যক্ষেত্রের অঙ্গহানি হইল না কি?"

তারাসুন্দরী।—"মা! আপনিই তো বলেন,—যাঁহার কার্য্য তিনিই করিবেন। আমরা ভাবিবার কে?"

ভবানী।—"মা! সত্যই বলিয়াছ! যাঁহার কার্য্য তিনিই করিবেন। আমার এই অনুষ্ঠান—এ কি আমি করিয়াছি? যিনি কাশীপতি, যিনি লোকনাথ, যিনি বিশ্বেশ্বর, তিনিই যে আমায় এ কার্য্য করাইতেছেন। মা! তোমায় বলি নাই; কিন্তু তোমায় বলিতেও কোনও বাধা নাই; তুমি আমার অঙ্গীভূত। মা!—বলিব কি? কাশীতে ব্রাহ্মণ নাই—এই ভাবনায় যখন আমি বিভোর; মহাযোগী মহেশ্বর একদিন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমায় বলিলেন,—

'মা! যদি কিছু করিতে চাও, কাশীতে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা কর।' আমি করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বাবা! কি করিয়া ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিব?' তিনি বলিলেন,—'মা! তোমাকে আর আমি কি উপদেশ দিব। ব্রাহ্মণকে বাড়ী দান কর।' তিনি আরও বলিলেন,—'এই হইলেই তোমার স্বর্গগত পতির ইষ্টসাধন হইবে।" এই বলিয়া, আমার স্বপ্নের দেবতা অন্তর্দ্ধান করিলেন। সেই হইতেই আমার মনে এই সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছে। সেই হইতেই আমি ৺কাশীধামে ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছি। ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠার ন্যায় পুণ্যকর্ম্ম অতি অল্পই আছে। গুরুদেবও আমায় পুনঃপুন এই উপদেশ দিয়াছিলেন।"

কন্যা ও জননীতে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে; ইতিমধ্যে নীলমণি ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া নীলমণি ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া ভবানী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দাদা। আর তো দিন নাই। পরশ্ব মাঘী পূর্ণিমা। আমি সেই দিন হইতেই বাড়ী উৎসর্গ করিতে আরম্ভ করিব। আয়োজন সব ঠিক হইয়াছে তো?"

নীলমণি ঠাকুর উত্তর দিলেন,—"সমস্তই ঠিক করিয়াছি বটে; কিন্তু একটী বিষয়ের অভাব অনুভব করিতেছি। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও সে অভাব পূরণ করিতে পারিলাম না।"

ভবানী আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি অভাব দাদা!"

নীমলণি।—"দান গ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণ পাইতেছি না।"

ভবানী সবিস্ময়ে কহিলেন,—"ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইতেছে না? তবে কি কর্ম্ম পণ্ড হইবে? অট্টালিকা দিব, তৈজস-পত্রাদি দিব। যথাসাধ্য ধন-সম্পত্তি দিব; দান-গ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না?"

নীলমণি।—"যদিও এদেশী ব্রাহ্মণ পাইতেছি; কিন্তু বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ কেহই দান গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। সকলেই বলেন,— "ইহজন্মে এই ফল; আবার কাশীধামে দান গ্রহণ করিয়া পরকাল নষ্ট করিব কি?' আমি বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছি।"

ভবানী।—"এখনও যে এমন ব্রাহ্মণ আছেন, ইহাই আমার আহ্লাদের কথা। বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র এ সংবাদ প্রচার করিয়াছিলে কি? বঙ্গদেশ হইতে কেহই কি কাশীবাস করিবার জন্য আসিতে চাহেন না?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"প্রায় বঙ্গদেশের প্রতি ব্রাহ্মণ-পল্লীতে এই সংবাদ প্রচার করিয়াছি। কিন্তু কেহই কাশীধামে আসিয়া দানগ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।"

নীলমণি।—"তবে চেষ্টা করিতেছি,—যদি কেহ কাশীবাসী হইতে ইচ্ছা করেন।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"কিন্তু দান লইয়া বঙ্গদেশীয় কোনও ব্রাহ্মণই কাশীবাসী হইতে ইচ্ছুক নহেন।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের উত্তর শুনিয়া, তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গদেশে এখনও এমন ব্রাহ্মণ আছেন,—এই ভাবিয়া ভবানীর বড়ই আহ্লাদ হইল। কিন্তু পাছে আপন সঙ্কল্প-সাধনে ব্রাহ্মণের অভাব হয়, তজ্জন্যও অবশ্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

ভবানী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপাততঃ কত জন ব্রাহ্মণ সংগ্রহ হইয়াছে?"

নীলমণি।—"তা অনেক ঠিক্ করিয়াছি। আপাততঃ কয়েক মাস নির্ব্বিঘ্নে দান-কার্য্য চলিতে পারিবে। ইতিমধ্যে আরও ব্রাহ্মণের জন্য চেষ্টা পাইব।"

ভবানী।—"ভাল তাহাই হউক। এদিকে ব্রাহ্মণ সংগ্রহের জন্যও

চেষ্টা চলুক। অন্ত দিকে কার্য্য আরম্ভ হউক। আমার ইচ্ছা—প্রত্যেক বাড়ীতে এক এক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করাইব। জানি না—বিশ্বেশ্বর আমার সে আশা পূর্ণ করিবেন কি না?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—"সে জন্ত কোনই চিন্তা নাই। কোন বিষয়ে অঙ্গহানি হইবে না।"

দুই ভ্রাতাই মহারাণীর দানব্রতের উদ্‌যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। যথানির্দ্দিষ্ট দিনে যথারীতি আড়ম্বরের সহিত মহারাণীর দান-কার্য্য আরম্ভ হইল।

মহারাণী কেবলই কি প্রতিদিন এক এক জন ব্রাহ্মণকে এক একটি অট্টালিকা দান করিয়া নিবৃত্ত হইলেন? বৎসরের তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে তিন শত পঁয়ষট্টিখানি বাড়ী উৎসর্গ করিয়া সেই সেই বাড়ীতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া বসবাস করান হইল। তদ্ব্যতীত মহারাণী তিন শতাধিক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দুর্গাবাড়ীতে প্রতিদিন পঁচিশ মণ করিয়া তণ্ডুল বিতরিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন একটি পাথরের চৌবাচ্চায় আট মণ করিয়া ছোলা ভিজানোর ব্যবস্থা হইল। ভিখারীদিগকে প্রতিদিন সেই ছোলা বিতরিত হইত। কাশীধামের দুর্গা-বাড়ীতে মহারাণীর অন্নসত্র আজিও তাঁহার পুণ্য-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

কাশীর সীমানায় সীমানায় তিনি যেমন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; তেমনই প্রতি সীমান্তস্থানে তিনি এক একটী বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পার্শ্বে কূপ খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রতি বৃক্ষের সন্নিকটে তিনি এক একটি স্তম্ভ (ধর্ম্মটোকা) নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মোটবাহী পথশ্রান্ত ব্যক্তি সেই স্তম্ভের উপর মোট রাখিয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম ও কূপের জলপান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিতে পারিবে,—ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্ত ছিল। দেবসেবা ও অতিথিসেবার জন্ত মহারাণী

যেরূপভাবে দান-বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার ভূমিদাণের সংখ্যা করা যায় না।

*　　　*　　　*

কেবল কি ৺কাশীধামে? ৺গয়াধামেও মহারাণীর কীর্ত্তি চির-স্মরণীয় হইয়াছে।

মহারাণী গয়ায় গিয়া দেখিতে পান,—তীর্থযাত্রীদিগের স্নান-তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে গয়ায় এক বিষম অন্তরায় বিদ্যমান। যিনিই তখন গয়ায় স্নান-তর্পণ-শ্রাদ্ধকার্য্য করিতে যাইতেন, গয়াধামে ফল্গুনদীর অন্তঃসলিল-গর্ভে কুণ্ড খনন করিতে না পারিলে, তাঁহার কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইত না। সে কষ্ট বড়ই কষ্ট। সাধারণ লোকের পক্ষে সেরূপভাবে কুণ্ড খনন করিয়া স্নান-তর্পণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করা—অনেক সময় অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইত।

মহারাণীর পক্ষে কুণ্ড-খনন অনায়াসসাধ্য অকিঞ্চিৎকর কার্য্য হইলেও, মহারাণী কিন্তু জনসাধারণের সে কষ্ট প্রাণেপ্রাণে অনুভব করিলেন। পরক্ষণেই চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের সহিত পরামর্শ হইল।

মহারাণী কহিলেন,—"আমাদের প্রধান তীর্থস্থানের এ অসুবিধা দূর করা কর্ত্তব্য নহে কি?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"কর্ত্তব্য যে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে কি? তবে কি উপায়ে এ কষ্ট দূর হয়, তাহাই বিবেচনার বিষয়। আমরা যত টাকা ব্যয় করিয়াই কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া দিই না কেন, ফল্গুনদীর চঞ্চল বালুকারাশিতে এক দিনেই সে কুণ্ড ভরাট হইয়া যাইবে। তাহার উপায় কি?

মহারাণী।—"সে উপায়ও আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমি বিবেচনা করি, কতকগুলি চাকরান্ জমি দান করিব। সেই চাকরান্-

ভোগীরা পুরুষানুক্রমে কুণ্ড কাটিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে।" চাকরাণ দানের এইরূপ সর্ত্ত রাখিব।'

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বটে! তবে গয়াধামে আমাদের জমিদারী তো নাই? সেরূপ চাকরাণ ভোগাভিলাষী লোকই পাইব কি?"

মহারাণী।—"জমিদারী নাই; জমিদারী ক্রয় করিতে কতক্ষণ? আপনি কয়েকখানি গ্রাম কিনিবার চেষ্টা করুন। সেই গ্রাম চাকরাণ-দান করিব। যাহারা সেই চাকরাণ ভোগ করিবে, তাহারা প্রত্যহ আসিয়া কুণ্ড কাটিয়া দিয়া যাইবে। এমনই পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে ব্যবস্থা যেন কখনও লোপ না হয়।"

মহারাণীর অনুজ্ঞায় তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। এখন যে গয়াধামে ফল্গু নদীর অন্তঃসলিল-গর্ভে প্রত্যহ দুইটী করিয়া বৃহৎ কুণ্ড কাটা হয়, তাহা সেই মহারাণী ভবানীরই কীর্ত্তি। মহারাণী ভবানী গয়ার নিকটবর্ত্তী দুইখানি গ্রাম ক্রয় করিয়া ঐ দুই গ্রামের সমস্ত জমি শ্রমজীবী লোকদিগকে চাকরাণ মুজরাই দিয়া গিয়াছেন। ঐ চাকরাণ-ভোগী ব্যক্তিগণ রাত্রিশেষে আসিয়া প্রভাত হইবার পূর্ব্বে, পাশাপাশি দুইটী কুণ্ড খনন করিয়া যায়। ঐ কুণ্ডদ্বয়ে যাত্রিগণ স্নানতর্পণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে। সমস্ত দিন রাত্রিতে ঐ কুণ্ডদ্বয় ভরিয়া যায়। আবার শেষ রাত্রিতে চাকরাণভোগী লোকসকল আসিয়া নূতন কুণ্ড খনন করে। দেড়শত বৎসর হইতে এইরূপ কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। আরও কতকাল যে চলিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আর তাই বলিতেছিলাম, কি কাশী—কি গয়া, মহারাণী ভবানীর কীর্ত্তি-স্মৃতি তীর্থস্থান উজ্জ্বল করিয়া আছে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বাভাস।

মহারাণী সে যাত্রায় প্রায় দুই বৎসর কাশীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কাশী হইতে যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, আবার এক নূতন ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল।

দিল্লীর নামমাত্র সম্রাট্ শাহ আলমের নিকট হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করেন। স্থির হয়,—বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজকর প্রদান করিয়া কোম্পানি দেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিবেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব, বাঙ্গালার গবরণর হইয়া জমিদারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া 'পুণ্যাহ' করেন। সেই হইতে কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর এই কয়েক বৎসরের মধ্যে চারিবার বাঙ্গালার সিংহাসনে নবাবীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হন; মীরকাশিম সিংহাসন লাভ করেন। আবার পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে মীরকাশিম পথের ভিখারী হইয়া দুর্ভাগার ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর পুনরায় মীরজাফর দুই বৎসর নবাবী পাইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। পরিশেষে, কোম্পানি দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিলে, মীরজাফরের পুত্র নামে মাত্র নবাব হইয়াছিলেন।

কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ এ সময়ে অনেকেই যেন বঙ্গদেশকে গ্রাস করিতে আসিয়াছিলেন। যেরূপেই হউক, কিছু টাকা সংগ্রহ

করিতে পারিলেই তাঁহারা আপনাদের জীবন সার্থক বলিয়া মনে করিতেন। উৎকোচ গ্রহণ,—সে তো তাঁহাদের অনেকেরই অঙ্গের ভূষণ ছিল।

উৎকোচ গ্রহণ ভিন্ন, আর আর যেরূপে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ প্রজাসাধারণকে নিগৃহীত করিতেন, দাদন-প্রথা তাহার মধ্যে অন্যতম। সে সময়ে উত্তরবঙ্গে নাটোর-রাজ্যে বহু পরিমাণে কার্পাস ও পট্টবস্ত্র প্রস্তুত হইত। বৈদেশিক বণিকৃগণ সেই সকল বস্ত্র ইউরোপে বিক্রয় করিয়া বিশেষরূপে লাভবান্ হইতেন; নাটোর-রাজ্যের নানাস্থানে সেইরূপ বস্ত্র-বিক্রয়ের অসংখ্য আড়ং ছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের বিবরণেই প্রকাশ,—রাজসাহী-প্রদেশের এক এক আড়ং হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দেড় লক্ষ খণ্ড বস্ত্র ক্রয় করিয়া বণিকৃগণ বিদেশে প্রেরণ করিতেন। নাটোর-রাজ্যে তখন বিংশতি-লক্ষাধিক লোক বসবাস করিত। সেই সকল লোকের বস্ত্র যোগাইয়াও, এ দেশের প্রস্তুত লক্ষ লক্ষ খণ্ড বস্ত্র ইউরোপে প্রেরিত হয়,—বণিকৃগণের তাহা বড়ই চক্ষুঃশূল হইল। তাহারা দাদন দিয়া সেই ব্যবসায়ে একাধিপত্য স্থাপনে চেষ্টা আরম্ভ করিল। তখন প্রজাসাধারণের উপর যে কি অত্যাচার চলিয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। তাহারা দাদনের জন্য অল্পমূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত; কিন্তু দেশবাসী কেহ তাহা ক্রয় করিতে গেলে, তিনি অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেন। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ গোপনে গোপনে এইরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন; অথচ, দেশের লোক খাটিয়া মরিয়া দুইবেলা প্রাণ ভরিয়া খাইতে পাইত না। মহারাণী যখন কাশীধাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন দেশের এই অবস্থা।

একদিন চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া,

দেশের সেই অবস্থার কথাই উল্লেখ করিয়া কহিলেন,—"আপনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বুঝি বা তাহাই সংঘটিত হয়! প্রজারা এখন রাজস্ব-প্রদানে কষ্টবোধ করিতেছে।"

ভবানী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন এমন হইল, বিশেষ সন্ধান পাইয়াছেন কি?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"বিদেশী বণিক্‌গণ এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের মূলোচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এখন এক মাত্র কৃষিকর্ম্মই প্রজার জীবিকা-সংস্থান। হঠাৎ এক বৎসর যদি অজন্মা হয়;—প্রজারা কি খাইবে তাহার সংস্থান নাই।"

ভবানী।—"উত্তরবঙ্গ পট্টবস্ত্র ও কার্পাস ব্যবসায়ের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। যদি পুনঃপুন অজন্মা হয়, তথাপি প্রজাবর্গের অন্নকষ্টের সম্ভাবনা নাই।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"আমি তো তাহাই বলিতেছি। বিদেশী বণিক্‌গণ এদেশের তন্তুশিল্পের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। আবার কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যাদিও বিদেশে রপ্তানি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

তারাসুন্দরী পার্শ্বে বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন। কৌতু-হলাক্রান্ত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শিল্পের ধ্বংসসাধন করিল কি প্রকারে?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"বিদেশী বণিক্‌গণ এদেশের লোককে প্রথমে দাদন দিয়া কাজ করাইতে আরম্ভ করে। তাহাতে তাহারা অল্পদামে শিল্প দ্রব্য ক্রয় করিয়া অধিক দামে বিক্রয় করিবার সুবিধা পায়। এইরূপে একদিকে দেশীয় শিল্পদ্রব্যের দর চড়িয়া যায়, অন্যদিকে তাহারা বিদেশী দ্রব্য আসিয়া সুবিধা দরে বিক্রয় করিবার প্রলোভন দেখায়। ফলে, স্বদেশী শিল্প লোপ পাইয়া আসে;—বিদেশী শিল্প তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসে।"

তারাসুন্দরী।—"প্রজারা দাদন না লইলেই তো প রে?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"তাহারা কি ইচ্ছা করিয়া লয়? কোম্পানির কর্ম্মচারীরা জোর করিয়া তাহাদিগকে দাদন লইতে বাধ্য করে। দাদন না লইলে প্রজার ভিটা-মাটী উৎসন্ন দেয়।"

তারাসুন্দরী।—"কি অত্যাচার! কি অত্যাচার!!"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"দাদনের অত্যাচারে কোনও কোনও শিল্পী আপন হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিয়া অকর্ম্মণ্য সাজিতে বাধ্য হইতেছে।"

তারাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন, উত্তেজিতকণ্ঠে কহিলেন,—"এর কি কোনও প্রতিকার নাই?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"আমরা আর কি প্রতিকার করিব? স্বয়ং নবাব মীরকাশিম প্রতিকার-চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। অনেকে বলেন,—তাঁহার সিংহাসনচ্যুতির নানা কারণের মধ্যে উহাও অন্যতম। মীরকাশিম যখন পারেন নাই, আমরা কি করিতে পারি।"

তারাসুন্দরী।—"বাঙ্গালার জমিদারগণ তাঁহাকে কেহ সাহায্য করিলেন না কেন?"

চন্দ্রনারায়ন ঠাকুর।—"মা! বাঙ্গালার জমিদারগণের কি এখন আর সেদিন আছে? বাঙ্গালার জমিদারদিগের সাহায্যের কথা আর কি বলিব! অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা পর্য্যন্ত তাঁহাকে আশ্রয় দেন নাই। উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি যখন অযোধ্যার নবাবের শরণাপন্ন হন; নবাব তাঁহাকে অযোধ্যা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তার পর, ভগ্নাশা হইয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া কোথাও সাহায্য না পাইয়া, মীরকাশিম মারা পড়িয়াছেন। তিনি মুসলমান হইয়া মুসলমান-নবাবগণের নিকট সাহায্য চাহিয়া, বিফল-

মনোরথ হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বয়ং নবাবই সে অত্যাচারের কোনও প্রতিকার করিতে পারেন নাই। আমরা কি প্রতিকার করিব?"

মহারাণী ভবানী একমনে সকল কথা শুনিতেছিলেন; আর মনে মনে আপশোষ করিতেছিলেন।

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"ভগবানের যাহা মনে আছে, তাহাই ঘটিবে। তবে আমাদের যতটুকু সাধ্য সে পক্ষে যেন চেষ্টার ত্রুটি না হয়। কোন প্রজা কিরূপ কষ্টে দিনপাত করে, সর্ব্বদা আপনারা তাহার সন্ধান লইবেন। সন্ধান লইয়া, যাহাকে যেরূপ সাহায্য করা প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। রাজস্বের জন্য প্রজা যেন কষ্ট না পায়!"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"আমাদের সাধ্যমত আমরা চেষ্টা করিব বটে; কিন্তু কোম্পানির অত্যাচার কিরূপে নিবারণ করিব? ক্লাইব স্থির করিয়াছেন,—বঙ্গদেশ হইতে বার্ষিক আড়াই কোটী টাকা কোম্পানির রাজস্ব আদায় হইবে। সেই টাকা হইতে তিনি দিল্লীর বাদশাহকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন; বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা নবাবকে বৃত্তি দিবেন; ষাট লক্ষ টাকা কোম্পানির কর্ম্মচারী-দিগের বেতনাদিতে ব্যয় হইবে; অবশিষ্ট এক কোটী বাইশ লক্ষ টাকা কোম্পানি বৎসর বৎসর লাভ পাইবেন। কোম্পানিকে এই কথা জানাইয়া, সেই পরিমাণ টাকা আদায়ের জন্য ক্লাইব বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। মহম্মদ রেজা খাঁ এ কার্য্যে তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্থানীয়। সে এখন সরকারী নবাব বলিয়া অভিহিত। রাজস্ব আদায়ে তাহার উৎপীড়ন অসহনীয়। আমরা কোন্ দিক্ দেখিব?"

ভবানী কহিলেন,—"কোম্পানির সহিত কোনরূপ সংঘর্ষ না ঘটে, অথচ জনসাধারণের উপকার হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করিতে হইবে।

খুব সাবধানে কার্য্য করিয়া যাইবেন। কর্ম্মচারিবর্গকেও সাবধানতার সহিত কার্য্য করিতে উপদেশ দিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্বন্তর।

বাড়বানলে জলসেচন করিলে সে অনল নির্ব্বাপিত হয় কি?

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে (১১৭৪ সালে) বঙ্গদেশে আশানুরূপ শস্য উৎপন্ন হয় নাই! পর বৎসরও উত্তরাঞ্চলে অনাবৃষ্টিতে এবং দক্ষিণাঞ্চলে অতিবৃষ্টিতে শস্যহানি ঘটিল! কিন্তু কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ রাজস্ব আদায়ে কোনরূপ বিচার বিবেচনা করিলেন না; বরং রেজা খাঁর অত্যাচার চরমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। রেজা খাঁ এই অবস্থায়ও শতকরা দশটাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিলেন। এদিকে যাহার ঘরে যে শস্য ছিল, কোম্পানির সিপাহীদিগের জন্য অনেক স্থলেই তাহা জোর করিয়া কিনিয়া লওয়া হইল। অধিকন্তু রপ্তানীর গতি রোধ হইল না; সে বৎসর বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর শস্য বিদেশে চলিয়া গেল।

পর বৎসর দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। দেবতা সে বৎসর আবার বারিবর্ষণে কার্পণ্য করিলেন। সরোবর শুষ্ক হইল; মাঠ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বৃক্ষসমূহ পত্রশূন্য হইল; পক্ষিগণ কুলায় পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল।

বৈশাখের শেষে শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি কি ভীষণা মূর্ত্তিই পরিগ্রহ করিলেন। বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত কর!—মনে হইবে—যেন দাবানলে দগ্ধ হইয়া, তাহার কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। আকাশের পানে

চাহিয়া দেখ।—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণে চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে।—যেন আকাশ হইতে আগুনের ঝলক বিনির্গত হইতেছে। স্রোতস্বিনীর প্রতি চাহিয়া দেখ।—স্রোতস্বিনী শুষ্ক হইয়া বালু-কঙ্করে বিলীন হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে চাউলের দর হু হু করিয়া বাড়িয়া গেল। যে চাউল তখন টাকায় পাঁচ ছয় মণ করিয়া বিক্রয় হইত,—মহার্ঘ হইলেও টাকায় দুই তিন মণ করিয়া কিনিতে পাওয়া যাইত, সেই চাউল কোথাও টাকায় ছয় সের, কোথাও টাকায় তিন সের করিয়া বিক্রীত হইতে লাগিল; কোথাও আবার তাহাও মিলিল না।

বাঙ্গালার কৃষিজীবী প্রজা কি খাইয়া বাঁচিবে? কৃষক বীজধান খাইয়া ফেলিল; তাহাতেও তাহার দুঃখের দিন কাটিল না। কৃষক গোরু বাছুর বেচিল। তাহাতেও তাহার কষ্টের লাঘব হইল না। লোকে গাছের পাতা, মাঠের তৃণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহাতেও আর কুলান হইল না। অনেকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ফেলিয়া পলায়ন করিল; তথাপি আপন গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারিল না। শেষে অনশনক্লেশে একে একে সকলেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। গ্রাম-পল্লী জনশূন্য; পথে-ঘাটে-মাঠে মৃতদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। হাট বাজার শূন্য পড়িয়া রহিল; মানুষে মানুষ খাইয়াও জঠরজ্বালার নিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মহারাণী ভবানী বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। কি করিয়া প্রজার জীবন রক্ষা করিবেন;—কি করিয়া কোম্পানির রাজস্ব সঙ্কুলান হইবে; ভবানী ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দিন দিন দেশের অবস্থা যতই শোচনীয় হইতে লাগিল, নিত্য নিত্য নানারূপ দুর্দ্দৈবের সমাচার যতই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে আরম্ভ করিল; ততই তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন।

দেশের এই দুর্দ্দিনে আপনি অন্যত্র অবস্থান করিলে পাছে প্রজার কষ্ট-বিমোচনের কোনরূপ শৈথিল্য হয়,—এই আশঙ্কায়, মহারাণী এখন নাটোর-রাজধানীতে আসিয়া অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। যথাসাধ্য আর্ত্তের দুঃখ-নিবারণের চেষ্টা চলিতেছিল।

রাজধানী আসিয়া, মহারাণী প্রথমেই আপনার কর্ম্মচারিবর্গকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন,—"খাজনার জন্য কাহারও প্রতি যেন পীড়ন করা না হয়। কোন্ গ্রামে কে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে প্রতিদিন তাহার যেন সন্ধান লওয়া হয়। তার পর কোন্ গ্রামে কি ভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সংবাদ নিত্য নিত্য যেন আমাকে জানান হয়।"

বর্ত্তমান কালের ন্যায় তখন এদেশে দাতব্য-চিকিৎসালয় ছিল না। তখনকার দিনে লোকের ব্যারাম পীড়াই কম হইত; ক্বচিৎ কখনও ব্যারাম-পীড়া হইলেও টোটকা-টুটকাতেই তাহা সারিয়া যাইত; সুতরাং তখন দাতব্য-চিকিৎসালয়ের তাদৃশ আবশ্যকতাও উপলব্ধি হয় নাই। তথাপি মহারাণী ভবানী বেতন-দানে অনেকগুলি রাজবৈদ্য নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোনও গ্রামে কাহারও পীড়ার সংবাদ পাইলে, সেই রাজবৈদ্যগণ, সেই গ্রামে গমন করিয়া, পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহাদের সহিত ঔষধ ও পথ্য প্রভৃতি লইয়া রাজভৃত্যগণ সর্ব্বদা উপ-স্থিত থাকিত।

দুর্ভিক্ষের সময় স্থানে স্থানে ব্যারাম-পীড়া হইতেছে সংবাদ পাইয়া, মহারাণী অধিকসংখ্যক বৈদ্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কর্ম্মচারীদিগকেও বলিয়া দিয়াছিলেন,—"যে গ্রামে যখনই কেহ পীড়িত হইবে, যেন চিকিৎসা ও পথ্যের কোনরূপ ত্রুটি না হয়। এখন, প্রত্যেক গ্রামে বা দুই তিনখানি গ্রাম লইয়া, এক একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হউক।

সেই সেই কেন্দ্রে যেমন অনশনক্লিষ্ট লোকের জন্য অন্নদানের ব্যবস্থা করিবে, তেমনি রোগ-ক্লিষ্টের জন্য চিকিৎসার ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত করিও। ফল কথা, কেহ অন্নাভাবে বা বিনাচিকিৎসায় কোথাও মারা গিয়াছে,—এ সংবাদ যেন আমাকে শুনিতে না হয়।”

কিন্তু দেবতা বিরূপ! মানুষের চেষ্টায় কি হইতে পারে? মহারাণীর প্রাণপাত সাহায্য, মরুভূমে বারিবিন্দুর ন্যায়, কোথায় শুকাইয়া গেল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে চারিদিকে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। মহারাণী কোন্ দিক্ রক্ষা করিবেন?

গ্রাম-গ্রামান্তর পরিদর্শন করিয়া, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তপ্তকাঞ্চনপ্রভ উজ্জ্বল দেহ কয়দিনেই বিশীর্ণ বিমলিন হইয়া গিয়াছে। ম্লানমুখে মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি কহিতে লাগিলেন,—“মহারাণী! আর বুঝি রক্ষা করিতে পারিলাম না। ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছে; আর কুলাইতে পারিতেছি না। একজনের আহার পাঁচজনকে বণ্টন করিয়া দিয়াও কুলান হইতেছে না। যে দিকেই চাই, সেই দিকেই হাহাকার—সেই দিকেই নরকঙ্কাল! গাছের পাতা, মাঠের তৃণ শেষ হইয়াছে! কর্দ্দম সেচন করিয়াও আর পানীয় জল পাওয়া যাইতেছে না। পতি স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া, জঠরজ্বালায় পলায়ন করিতেছে! জননী—সন্তানের আহার কাড়িয়া খাইতেছে। এ সকল সমাচার প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সামর্থ্যে কুলাইল না। আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না।”

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

মহারাণীর মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি এক এক বার

ভাবিতে লাগিলেন,—"কি করিয়া এ সঙ্কটে পরিত্রাণ পাই! আমার সমস্ত রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রদান করিলেও কি, আমার প্রজা-পুত্রের জীবন-রক্ষা হইবে না?" আবার ভাবিতে লাগিলেন,—"আমার আর আছেই বা কি? গোলাবাড়ী ছিল, লুটাইয়া দিয়াছি! ধনাগার ছিল, শূন্য করিয়াছি। প্রাণ চলিয়া গিয়াছে, দেহ মাত্র অবশিষ্ট আছে! কিন্তু সে প্রাণহীন দেহে—সারশূন্য শুষ্ক-কাষ্ঠে কি উপকার হইতে পারিবে?"

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। নিদাঘ-তপনের প্রখর কিরণে মধ্যাহ্ন-গগন অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের বাহির হইতে যাই-লেই সে উত্তাপে শরীর যেন ঝলসিয়া যায়। এত বেলা পর্য্যন্ত মহারাণী ভবানী এবং চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর উভয়েই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তখনও তাঁহাদের স্নানাহারের চেষ্টা নাই; স্নানাহার যে করিতে হইবে, সেদিন সে ভাবনাও বুঝি মনে উদয় হইতেছে না।

তারাসুন্দরী গৃহকর্ম্ম পরিদর্শন করিতেছিলেন। এত বেলা পর্য্যন্ত জননী ও মাতুল মহাশয় উভয়েই সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছেন,—উভয়ের কাহারও স্নানাহারের কথা স্মরণ নাই,—ইহাতে তারাসুন্দরী একটু চঞ্চল হইলেন। বিশেষতঃ তাঁহার মাতুল চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর মহাশয় সপ্তাহ পরে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায়, আজ মফস্বল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তারাসুন্দরী শুনিয়াছেন,—কয়দিন কাল তাঁহার কষ্টের অবধি ছিল না। সুতরাং তারাসুন্দরী আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।

জননী ও মাতুল মহাশয়ের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন,—"বেলা আড়াই প্রহর অতীতপ্রায়। স্নানাহার কখন করিবেন?"

ভবানী আনমনে চিন্তা করিতেছিলেন। তারাসুন্দরীর আহ্বানে যেন তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল।

ভবানী উত্তর দিলেন,—"মা! তোমরা সব স্নানাহার করগে—যাও; আমি আজ আর কিছু খাবনা।"

তারাসুন্দরী।—"কেন খাবেন না—ব'লছেন? কাল যে আপনার আধপেটা খাওয়াও হয়-নি? আমি তাই আজ সকাল-সকাল আয়োজন করেছি! কেন আপনি খাবেন না—ব'লছেন?"

ভবানী।—"আমার ক্ষিদে নেই। আমার জন্য যে চাল রান্না হবে, সেই চা'লগুলি তুমি একজন অতিথিকে দাও গিয়ে।"

তারাসুন্দরী।—এখানে কোনও অতিথিই তো বিমুখ হন নাই। আপনার উপদেশ-অনুসারে আমি নিজে তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতেছি। সে পক্ষে কোনও ত্রুটি হয় নাই! আপনি চলুন—আমার কথা শুনুন।"

ভবানী।—"না মা। আমার ক্ষিদে নেই। আমার শরীর আজ কেমন কেমন কর্‌ছে; আমি আজ আর কিছু খাবো না। আমার চা'লগুলিতে হয় তো একটী লোকেরও একদিন প্রাণ রক্ষা হ'তে পারে। মিছামিছি সেগুলি নষ্ট কর্‌বে কেন?"

তারাসুন্দরী বুঝিলেন,—"জননী নিদারুণ মনঃকষ্ট পাইয়াছেন। তিনি কোনও মতেই স্নানাহার করিবেন না! সুতরাং অধিক পীড়াপীড়ি নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া, তিনি কহিলেন,—"মা! আপনার সকলই সহ্য আছে। আপনি অনায়াসে সকলই সহিতে পারিবেন। কিন্তু মামা কি ভাবে আছেন,—জানেন কি? উহাঁর শরীরের অবস্থা দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না? হ'রে চাকর উহাঁর সঙ্গে ছিল, সে বল্লে—'উনি আজ তিন দিন কাল অনাহারে আছেন। পরশু—অন্ন প্রস্তুত ক'রে খেতে বস্‌বেন, পাতের উপর ভাত ঢালা

হয়েছে; এমন সময় তিন চারি জন অস্থি-চর্ম্ম-সার লোক ছুটতে ছুটতে এসে পাতের উপর উপুড় হ'য়ে পড়লো;—নিমেষের মধ্যে ভাত-কটাকে গ্রাস ক'রে ফেললো।' সেদিন আর মামার খাওয়াই হ'ল না।"

ভবানী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন,—"তার পূর্ব্ব দিন অন্ন প্রস্তত করিবার অবসরই পান নাই। অন্নক্লিষ্ট নরনারীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া সেদিন সঙ্গের সমুদায় আহার্য্য দ্রব্যই বিলাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কল্যকার কথা শুনিলাম,—চা'ল ডাল সংগ্রহ করিতেই পারেন নাই। যাহা কিছু খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে ছিল, কয় দিন ধরিয়া বিতরণ করিয়া, নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেখিতেছেন না কি—আজ উনি কিরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া, তাঁহার কষ্টের কথা শুনিয়া মহারাণী বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন; চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরকে স্নানাহারের জন্য গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর উঠিলেন না;—যেন উত্তর দিতেও তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি যে ভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

তারাসুন্দরী কহিলেন,—"মা! আপনি না উঠিলে মামা কখনই উঠিবেন না। যদি মামাকে বাঁচাইতে চান, আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। উঠুন,—দুই জনে চলুন,—স্নানাহার করিবেন।"

উপায়ান্তর নাই! বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবিলেই বা কি হইবে?

মহারাণী না উঠিলেও চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর উঠিবেন না। অগত্যা মহারাণী বলিলেন,—"আচ্ছা। চল—আমরা উঠিতেছি।"

তারাসুন্দরী তাঁহাদের স্নানাহারের বন্দোবস্ত করিতে গেলেন। মহারাণী ভবানী গাত্রোত্থান করিলেন। চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রাণভেদী।

সহসা তাঁহাদের গতিরোধ হইল। একটী দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সদানন্দ স্বামী তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আর স্নানাহারে যাওয়া হইল না। সদানন্দ স্বামী সম্মুখীন হইয়াই কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—"মা—রক্ষা কর।"

অট্টালিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনি উঠিল,—"মা—রক্ষা কর।" দিকে দিকে শব্দ উঠিল,—"মা—রক্ষা কর।" আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, মেদিনী কম্পিত করিয়া, শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"মা—রক্ষা কর।"

ভবানী বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

সদানন্দ স্বামী আবার বলিলেন,—"মা—রক্ষা কর। দেশ যায়; মা—রক্ষা কর। তোমার সহস্র সহস্র সন্তান অনশনে মরিতে বসিয়াছে; তুমি রক্ষা কর।"

সদানন্দ স্বামী অনর্গল বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মা! আমার ক্রোড়ে এই যে শিশুটীকে দেখিতেছেন, আগে ইহারই কথা বলি।

আমি উত্তর হইতে আসিতেছিলাম। দেখিলাম—পথের ধারে একটী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে; আর এই শিশুটী সেই স্ত্রীলোকের বুকের উপর মড়ার মত পড়িয়া আছে। প্রথমে ইহাকেও মৃত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু একটু দৃষ্টি করিয়া দেখিতেই বুঝিতে পারিলাম,—শিশু মরে নাই! নিকটে গিয়া দেখিলাম,—শিশু আপন মৃত-জননীর স্তন্য পান করিতেছে। স্তনে দুগ্ধ নাই; তাই এক একবার মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতেছে। যদি না কাঁদিত, শিশু মৃত কি জীবিত,—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন—"মৃতা জননীর স্তন্য পান করিতেছিল! কোথায় পাইলেন উহাকে?"

সদানন্দ স্বামী।—"আমি মনে করিয়াছিলাম, সে কথা আর বলিব না; শুনিলে আপনাদের প্রাণে বিষম ক্লেশ অনুভূত হইবে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"ক্লেশের কথা আর অধিক কি বলিবেন ঠাকুর! দেখিয়া দেখিয়া, শুনিয়া শুনিয়া, এ হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে।"

সদানন্দ স্বামী।—"যদি পাষাণ হইয়াও থাকে, সে কথা শুনিলে পাষাণ ও বিদীর্ণ হইবে!"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—কি বলিতেছেন আপনি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

সদানন্দ স্বামী।—"বুঝিতে চান? তবে শুনুন। এই শিশু—সেই কৃত্তিবাসের একমাত্র বংশধর!"

মহারাণী ভবানী শিহরিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর বিচলিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরিদাস—হরিদাস কোথায়?"

সদানন্দ স্বামী।—"হরিদাস!—হরিদাস কি আর আছে! আপনারা তাহার বাড়ীর জন্য তাহাকে যে জিনিস-পত্র দিয়া পাঠাইয়া-

ছিলেন, পথে দস্যুহস্তে তৎসমুদায় লুণ্ঠিত হয়। তার পর আহত হইয়া গ্রামে ফিরিয়া সে ইহলীলা সম্বরণ করে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ, সে সংবাদ কিছুই তো অবগত নহি!

সদানন্দ স্বামী।—"সংবাদ দিবে কে? আমরাও অন্তদিকে গিয়া পড়িয়াছিলাম; তাই কোনও সংবাদ পাই নাই।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"আপনি কি এ সত্য বলিতেছেন? এই শিশু কি হরিদাসের পুত্র?"

সদানন্দ স্বামী।—"আমি যাহা জানিয়াছি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। এখন—এই শিশুই কৃত্তিবাসের একমাত্র বংশধর।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"উহার জননী কি তবে উহাকে ক্রোড়ে করিয়াই মারা গিয়াছিল? কি ভয়ানক দৃশ্য!"

সদানন্দ স্বামী কহিতে লাগিলেন,—"ভয়ানক—আরও আছে। সে তুলনায় এ দৃশ্য কিছুই নয়! আমি যেখানে সেই স্ত্রীলোকটী আর এই শিশুটীকে দেখিতে পাই, তাহারই অনতিদূরে একটী পুরুষ মরিয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ সেইদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। আমি চাহিয়া দেখিলাম। মনে হইল,—যেন সেই মৃত পুরুষটীকে লইয়া দুই তিনটী নরকঙ্কালে টানাটানি করিতেছে। তাহাদের কেহ শবদেহের হাত ধরিয়া কামড়াইতেছে, কেহ পা ধরিয়া কামড়াইতেছে, কেহ বা বক্ষঃস্থল কামড়াইয়া পড়িয়া আছে। ঘৃণা নাই, শঙ্কা নাই, সঙ্কোচ নাই, বিতৃষ্ণা নাই। আমার মনে হইল—তবে কি প্রেত!—এই শব-কঙ্কাল ভক্ষণ করিতে আসিয়াছে! কিন্তু চাহিয়া দেখিলাম—না—না;—তাহারা প্রেত নয়;—এই মানুষই অনশনে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া এই প্রেতমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল—

পাছে তাহারা আসিয়া শিশুটীকেও গ্রাস করে। তাই আমি উহাকে ক্রোড়ে লইয়া চলিয়া আসিলাম। উপায়ান্তর ছিল না ; নচেৎ সেই নরকঙ্কাল-কয়টীকেও বাঁচাইবার চেষ্টা করিতাম। শবদেহ ভক্ষণ করিতে করিতে, হয় তো এতক্ষণ তাহারাও ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে।"

ভবানীর বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া দরদরধারে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি আপনা-আপনিই কহিলেন,—"কি ভীষণ!—কি ভয়ঙ্কর!' ভগবান আর যে শুনতে পারি নে ?"

সদানন্দ স্বামী পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—"মা! ইহাই চরম চিত্র মনে করিবেন না। আমি এই শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া চলিয়া আসিতেছি ;—পথে পল্লীতে কি ভীষণ দৃশ্য! শবদেহ নয়,—সেখানে দেখিলাম,—একটা জীবন্ত বালককে ধরিয়া দুই তিন জন লোক কামড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে,—সেই বালকের আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল কাঁপিয়া উঠিয়াছে। এবার আর আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। শিশুকে স্কন্ধে লইয়াই আমি সেই বালককে উদ্ধার করিতে গেলাম। কিন্তু আমাকে দেখিয়াই বালকের আক্রমণকারীরা ছুটিয়া পলাইল। তবে তাহারা পলাইলে কি হইবে? আমিও নিকটে যাইলাম, বালকও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহাকে ডাকিয়া যখন তাহার কোনই সাড়া-সংজ্ঞা পাওয়া গেল না ; অগত্যা তখন আমি চলিয়া আসিলাম। তার পর যতই অগ্রসর হইলাম, ততই বীভৎস হইতে বীভৎসতর দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই ;—সমগ্র দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া ঐ দেখ মা, তোমার শত শত কাঙ্গালী সন্তান, তোমার দুয়ারে দাঁড়াইয়া আজ কিরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছে। আর উপায় নাই। মা—তুমি রক্ষা কর!"

মহারাণী কহিলেন,—“ঠাকুর! আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না। আমার সাধ্যানুসারে আমি চেষ্টার ক্রটি করি নাই! এ সকল দৃশ্য আমার চক্ষের উপর উপস্থিত না করিলেও আমি চেষ্টার ক্রটি করিতাম না।”

সদানন্দ স্বামী।—“আপনি কি মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার অন্নসত্রে দিকে দিকে কিরূপভাবে সহস্র সহস্র আর্ত্তজনের প্রাণরক্ষা হইতেছে,—কিছুই আমার অবিদিত নাই। যেখানে যাহাকে অন্নক্লিষ্ট দেখিতেছি, আপনার অন্নসত্রে আনিয়া দিয়া আমরা তাহার পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছি। সুতরাং আমায় আর আপনার চেষ্টার কথা অধিক করিয়া কি বুঝাইবেন? কিন্তু মা! তবু যে রক্ষা হয় না—দেশ যে যায় মা!”

মহারাণী উদ্বেগ-আবেগে মনে মনে কহিলেন,—“আমার রাজ্য যায়—যাউক! আমার মান যায়—যাউক; আমার প্রাণ যায়—যাউক। আমি এ যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না। আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও প্রজার প্রাণরক্ষা করিতে পারিলাম না?”

মহারাণী চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—“কোম্পানীর রাজস্বের জন্য যে টাকা মজুত হইয়াছে, তাহাও বিলাইয়া দেন। যদি আমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করারও প্রয়োজন হয়, তাহা করিয়াও অনশনক্লিষ্ট জনের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করুন!”

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—“কোম্পানীর রাজস্বের টাকা পুরাপুরি সংগৃহীত হয় নাই। অথচ নিত্য নিত্যই তাগিদ আসিতেছে। সে টাকা ব্যয় করিয়া ফেলিলে তাহারা জমিদারী কাড়িয়া লইবে।”

ভবানী।—“যদি প্রজাই মারা পড়িল, জমিদারী কাহার জন্য? আমার কাজ নাই—বিষয়সম্পত্তিতে; আমার কাজ নাই—আর

রাজ্যৈশ্বর্য্যে। আমার সর্ব্বস্ব-দিয়াও যদি অন্নক্লিষ্ট জনের প্রাণরক্ষা করিতে হয়, আপনি তাহারও ব্যবস্থা করুন।"

এই বলিয়া, আগন্তুক কাঙ্গালিগণের আহারাদির ব্যবস্থার জন্ত মহারাণী চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সদানন্দ স্বামীকে বলিলেন,—"আপনি সহায় হইয়া, যাহাতে লোকের প্রাণরক্ষা হয় তাহার ব্যবস্থা করুন।''

সে দিনকার মত স্নানাহার সেইখানেই শেষ হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যান্ত কাঙ্গালি-ভোজনের আয়োজনে কাটিয়া গেল। রাজধানীতে পূর্ব্বে একটী অন্নসত্র খোলা হইয়াছিল; এই দিন হইতে আর একটী নূতন অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মফল।

এত চেষ্টা করিয়াও কিন্তু মহারাণী বিধাতার লিপি খণ্ডন করিতে পারিলেন না। দিনদিনই অসংখ্য নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল।

১১৭৬ সালে এই দুর্ভিক্ষ চরম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। পরবর্ত্তী দুই বৎসর কাল মহামারীর জের চলিতে থাকে। ১১৭৭ সালের আষাঢ় মাসের হিসাবেই প্রতিপন্ন হয়,—বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ লোক (বঙ্গীয় প্রজার প্রতি ষোল জনের মধ্যে ছয় জন করিয়া) অনাহারে ও তদানুষঙ্গিক মহামারীতে মারা পড়িয়াছে। ইহাই বঙ্গের ইতিহাসে—লোমহর্ষণ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।"

কোম্পানী প্রথমে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে দেশ যখন উৎসন্নপ্রায় হইয়া আসে, তখন এই দুর্ভিক্ষের প্রতিকার-পক্ষে তাঁহারাও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু মূল বিশুষ্ক হইয়া গেলে, পত্র-পল্লবে জলসেচন করিয়া কি ফললাভ সম্ভবপর?

এই মন্বন্তরে কোথায় কিরূপভাবে লোক মারা পড়িয়াছিল, কোম্পানীর রিপোর্টেও তাহার আভাস পাই। সেতাব রায়, কোম্পানীর পক্ষে, পাটনার নায়েব-দেওয়ান ছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারির রিপোর্টে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'পাটনার অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রতিদিন পাটনা-সহরের পথে পঞ্চাশ জন লোকের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়।" তাঁহার এপ্রিলের রিপোর্টে আবার জানা যায়,—"পাটনা-সহরে প্রতিদিন দেড় শত লোক মারা পড়িতেছে।" পূর্ণিয়ার তত্ত্বাবধায়ক, চারিটী পরগণার গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাঁহার রিপোর্টে তাহা বিবৃত আছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"এক হাবেলি পূর্ণিয়ায় হাজার ঘর প্রজার বাস ছিল। কিন্তু এখন একটী মাত্র প্রজাও বিদ্যমান নাই। এ অঞ্চলে দুই লক্ষ প্রজা অন্নকষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" বিহারের তত্ত্বাবধায়ক লিখিয়া গিয়াছেন,—"এখানে প্রতি দিন পঞ্চাশ ষাট জন লোক অনাহারে মারা যাইতেছে।" দিনাজপুরের রিপোর্টে প্রকাশ,—"প্রজা নিঃস্ব। খাজনার দায়ে ঘটী-বাটী গোরু-বাছুর বিক্রয় করিতেছে।" অধিক কি, স্বয়ং রেজা খাঁকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, আমার চেষ্টার কিছুই ত্রুটি হয় নাই। দেবতা প্রতিকূল। তাই দেশ উৎসন্ন-প্রায়। জলাশয় বিশুষ্ক; অহরহঃ অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইতেছে। প্রজা দুর্দ্দশাগ্রস্ত। হাজার হাজার লোক নিত্য নিত্য কাল-কবলে নিপতিত।

একজন সহৃদয় ইংরেজ, স্বচক্ষে এই মন্বন্তর দর্শন করিয়া, তাহার

চল্লিশ বৎসর পরে, ইংরাজিতে একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন; সেই সহৃদয় ইংরেজ আর কেহই নহেন—তিনি স্যর জন শোর; পরবর্ত্তি-কালে কিছুদিনের জন্য তিনি ভারতের গবরণর-জেনারেল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি 'লর্ড টেনমাউথ' নামে পরিচিত। স্যর জন শোর এই মন্বন্তর স্মরণ করিয়া যে কবিতাটী প্রণয়ন করেন, মন্বন্তরের কি সজীব জাজ্বল্যমান চিত্র তাহাতে প্রকটিত!

"Still fresh in my memory's eye the scene I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue;
Still hear the mother's shrieks and infant's moans,
Cries of despair und agonising moans—
In wild confusion dead and dying lie;—
Hark to the jackels yell and vulture's cry.
The dogs fell howl, amidst the lare of day,
The riot unmolested on their prey'
Dire scenes of horror, which no pen trace,
Nor rolling years from memory's page efface.

মন্বন্তরের পর কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি দেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইল। আবার যেন কমলাদেবী ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু যাহারা চলিয়া গেল, তাহারা তো কৈ আর ফিরিয়া আসিল না?

সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর শাসনপ্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতের গবরণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। যৌবনে তিনি কাশীমবাজারের কুঠীতে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কালক্রমে তিনিই এখন বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা নির্ব্বাচিত হইলেন। কোম্পানীর রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য তখন এক নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। হেষ্টিংস 'সার্কিট-কমিটী' সংগঠন করিলেন। কমিটীর সদস্যচতুষ্টয়, প্রদেশে প্রদেশে পরিভ্রমণ

করিয়া, করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সেই কমিটী প্রথমে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজস্বপরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। ক্রমশঃ মহারাণী ভবানীর প্রতিও কমিটির বিষদৃষ্টি নিপতিত হইল।

মহারাণী ভবানী, হেষ্টিংসের তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিলেন না। দুর্ভিক্ষে নাটোরের রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়াছিল। মহারাণী, হেষ্টিংসের তৃপ্তিসাধন কিরূপে করিবেন? দেখিতে দেখিতে একটী প্রধান পরগণা মহারাণীর হস্তচ্যুত হইল। সে পরগণা—বাহিরবন্দর। সে পরগণায় সোণা ফলিত। সে পরগণায় মহারাণীর যথেষ্ট আয় ছিল। মহারাণীর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া, হেষ্টিংস, সেই বাহিরবন্দর পরগণা কাশীমবাজার রাজবংশের আদিভূত 'কান্ত বাবুকে' প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকার-সূত্রে স্বনামধন্য মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এক্ষণে সেই সম্পত্তির অধিকারী। যাহা হউক, একটীর পর একটী করিয়া, এইরূপে আরও অনেকগুলি পরগণা পরিশেষে মহারাণীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

কিন্তু ইহাতেও মহারাণীর ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের বিষয় যদি কখনও মহারাণীর নিকট প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হইত, মহারাণী বলিতেন,—"সকলই কর্ম্মফল।" কোম্পানীর বিচারপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াও যদি কেহ কখনও মহারাণীকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পাইত, মহারাণী তাহারও উত্তর দিতেন,—"কর্ম্মফল!"

মহারাণী প্রায়ই বলিতেন,—"রাষ্ট্র-বিপ্লবের এইরূপ পরিণাম যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম।"

মহারাণী কথায় কথায় উপদেশ দিতেন—"বাঙ্গালী আর যেন

কেহ কখনও রাষ্ট্র-বিপ্লবে যোগদান না করে! রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরিণাম বড়ই বিষময়! সে বিষে পুরুষানুক্রমে জর্জ্জরিত হইতে হয়।"

হেষ্টিংস প্রভৃতির অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করিয়া কখনও কেহ মহারাণীকে রাষ্ট্র-বিপ্লবে উৎসাহ দিলে, মহারাণী গুরূপদিষ্ট একটী শাস্ত্রবাক্য প্রায়ই উল্লেখ করিতেন; বলিতেন,—

"মাতা ন পালয়েদ্ বালং পিতা সাধু ন শিক্ষয়েৎ।
রাজা যদি হরেদ্ বিত্তং কা তত্র পরিদেবনা॥
সুসেবিতাঃ প্রকুপ্যন্তি মিত্রস্বজনপার্থিবাঃ।
গৃহমগ্নাশনিহতং কা তত্র পরিদেবনা॥"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের পর, মহারাণী ভবানী প্রায় তেত্রিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ১২১০ সালের (১৮০৩ খৃষ্টাব্দের) মাঘী পূর্ণিমার দিন সজ্ঞানে তাঁহার গঙ্গালাভ হয়।

সুদীর্ঘ ঊনাশীতি বৎসর—মহারাণীর জীবনকাল। কিন্তু কয় বৎসরের কয়টী ঘটনাই বা বিবৃত করিলাম! সকল ঘটনা সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে গেলে, এরূপ আরও দুই চারি খণ্ড পুস্তিকার প্রয়োজন হয়।

মহারাণী ভবানীর দানধর্ম্মের—বুঝি বা তুলনা নাই। বঙ্গদেশের কত স্থানে তিনি যে কত ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন,

তিনি যে কত স্থানে কত দেবসেবার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন,—কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? তিনি দেবপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশে এক এক সময়ে দুই তিন সহস্র বিঘা জমি দেবোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে আজিও তাহার শত শত নিদর্শন বিদ্যমান আছে। তাঁহার ব্রহ্মোত্তর দান-সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব? উত্তরবঙ্গে বা রাজসাহী প্রদেশে এমন ব্রাহ্মণ অল্পই আছেন,—যাঁহারা রাণী ভবানীর প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগ না করেন। রাজসাহী অঞ্চলে প্রবাদ আছে,—"যে ব্রাহ্মন রাণী ভবানীর প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগ না করে, সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে।" শ্রীশ্রীকাশীধামে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে মহারাণী ভবানী একদিন যে পাঁচ শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করেন, সেই দানপত্রের প্রতিলিপি পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। তীর্থক্ষেত্রে তাঁহার তেমন দানের কি ইয়ত্তা আছে!

গুরুবংশীয়দিগকে বিপুল সম্পত্তি অর্পণ করিয়া মহারাণী ভবানী যে অমানুষিক গুরুভক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, আজিকালি তাহা বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাণী ভবানী তাঁহার নিজ রাজধানী নাটোরের অনুকরণে ইষ্টদেবের বসতি-গ্রামে—বরিয়া-পাকুড়িয়া গ্রামদ্বয়ে—প্রাকার-পরিখা-বেষ্টিত এবং "বঙ্গোজ্জ্বল" নামক তোরণদ্বারসমন্বিত রাজভবন তুল্য দুইটি বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি পরিখা-বেষ্টিত সেই অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ ভূত-গৌরবের ক্ষীণ রেখাস্বরূপে বর্তমান রহিয়াছে। বরিয়ার বাটীতে রাণী ভবানীর দীক্ষাগুরু পাকুড়িয়ার ঠাকুরবংশীয় স্বনামখ্যাত রঘুনাথ তর্কবাগীশ ও পাকুড়িয়ার বাটীতে প্রসিদ্ধ চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর বাস করিতেন। কেবল যে ঐরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াই মহারাণী নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। ঐ রাজভবনতুল্য বাটীতে বাস করিয়া তাহার গৌরবরক্ষার উপযুক্ত ভূ-সম্পত্তিও (চন্দ্রনারায়ন ঠাকুরকে

এক লক্ষ ও গুরুবংশীয় অন্যান্য ঠাকুর মহাশয়গণকে এক লক্ষ এবং দীক্ষাগুরু রঘুনাথ তর্কবাগীশকে এক লক্ষ—সমষ্টিতে তিন লক্ষ টাকা উপস্বত্বের ভূসম্পত্তি) প্রদান করিয়াছিলেন। এক বংশে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা উপস্বত্বের উপযোগী ভূসম্পত্তিদান—শুনিলেও চমকিত হইতে হয় না কি?

এমন একটী নহে,—মহারাণী ভবানীর দান-সম্বন্ধে কত অপূর্ব্ব অনুপম ঘটনাই প্রচারিত আছে! একদা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ মহারাণী ভবানীর নিকট প্রার্থনা করেন,—"মা! আমি অতি দীন ব্রাহ্মণ, আমার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি। আমি কোনক্রমেই তাহাদিগের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারি না; আপনি দয়াময়ী, যদি দীন ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া চলনা গাড়ীটা, (বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ 'চলন বিল') ও কলমা পাড়াটা (বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ 'কলম-গ্রাম') আমাকে দান করেন, তবে ছেলে-পিলেগুলি মাছ মারিয়াও দুবেলা পেট পূরিয়া ভাত খাইতে পারে।" ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় মহারাণী ভবানীর দয়া হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের প্রার্থিত বিষয় দান করিতে অঙ্গীকার করিলেন; এবং তদণ্ডেই দানপত্র লিখিয়া দেওয়ার জন্য প্রধান কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন,—"মা! এই ব্রাহ্মণ যে কপটতা করিয়া আপনার একটি বৃহৎ সম্পত্তি গ্রহণ করিতেছে। এই বলিয়া, কর্ম্মচারী বিষয় দুইটীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দিলেন। পরিচয় শুনিয়াও মহারাণী কিন্তু বিচলিত হইলেন না। মহারাণী অণুমাত্র চিন্তা না করিয়া উত্তর দিলেন,—"আমি যখন ব্রাহ্মণের নিকট দান-স্বীকার করিয়াছি, তখন উহা যত বড় সম্পত্তি হউক না কেন, তাহা দিতেই হইবে।" এই বলিয়া, তন্মুহূর্ত্তেই মহারাণী দানপত্র দ্বারা "চলন বিল" ও "কলম গ্রাম" ঐ ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। এক্ষণে ঐ চলন-বিলের

বহু অংশ ভরাট হইয়া বহু নূতন গ্রাম ও বন্দরের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত গ্রাম ও জলকরের জমা—দুই লক্ষ টাকারও অধিক হইবে; কলম-গ্রামের ন্যায় বৃহৎ গ্রাম বাঙ্গলায় অতি কম। ঐ গ্রামে সাতটি পাড়া; প্রত্যেক পাড়াই এক একটি বৃহৎ গ্রামের তুল্য। অধুনা ঐ কলম গ্রাম নাটোরের রসিদ্ মিঞার জমিদারী-ভুক্ত। উক্ত রসিদ মিঞা ঐ কলম গ্রাম—কলমবাসী রাজসাহীর বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন মৈত্র প্রভৃতিকে বার্ষিক ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা জমায় পত্তনী দিয়াছেন। কলম-গ্রামের আদায়ী জমা ত্রিশ হাজার টাকার কম হইবে না। এরূপ দানের দৃষ্টান্ত—কোনও দেশে কোথাও আছে কি?

সত্যই মহারাণীর দানের পরিসীমা নাই। মহারাণীর দুর্গোৎসব—অভাবনীয় ব্যাপার! তেমন দুর্গোৎসব বঙ্গদেশে আর যে কেহ কখনও দেখিতে পাইবেন,—তেমন আশাও মনে হয় না। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময়, মহারাণী দুই সহস্র সধবাকে পট্টবস্ত্র, শাঁখা ও সোণার নত পরাইয়া দিতেন। দেবীপক্ষের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিনি শতাধিক কুমারীকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া পূজা করিতেন। প্রতি বৎসর পূজার সময় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ মহারাণীর নিকট লক্ষাধিক টাকা বৃত্তি-বিদায় প্রাপ্ত হইতেন। সে কয় দিন, সহস্র সহস্র দীন-দুঃখী চর্ব্ব-চুষ্য বিবিধ আহার প্রাপ্ত হইত! সহস্র সহস্র কাঙ্গালীকে তিনি নূতন বস্ত্র দান করিতেন।

মহারাণী বঙ্গদেশের চতুষ্পাঠীসমূহে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতেন! ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ তাঁহার বৃত্তি দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে মহারাণীর স্বাক্ষরযুক্ত এক দানপত্রের প্রতিলিপি দৃষ্ট হইবে। পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কারকে মহারাণী যে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতেন, সেই দানপত্রে তাহারই পরিচয়।

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ২৪-পরগণার কোন প্রান্তভাগে পুঁড়াগ্রামে বসতি করিতেন। কিন্তু তিনি পণ্ডিত বলিয়া, সেই দূরদেশে থাকিয়াও মহারাণীর বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেকালে উত্তরবঙ্গের নাটোর রাজধানীর সহিত দক্ষিণ-বঙ্গের পুঁড়া-গ্রামের ব্যবধান কত অধিক, পুঁড়া-গ্রাম কত দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হইত। কিন্তু সে দূরদেশের পণ্ডিত-গণও এইরূপে মহারাণীর সাহায্য পাইয়াছিলেন। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতির পণ্ডিতগণও অনেকেই যে মহারাণীর বৃত্তিভোগী ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ফলে, এক কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার নহেন;—বাঙ্গালার শত শত কমলাকান্ত যে মহারাণীর নিকট এইরূপ বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, ঐ প্রতিলিপি তাহার নিদর্শন মাত্র। দানের জন্য মহারাণীর দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। সকল সময় সকল লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে না বলিয়া, মহারাণী আপন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণের উপর সামান্য সামান্য দানের ভার ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দয়ারাম রায়ের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি দানপত্রে একটী ব্রহ্মোত্তর দান হইয়াছিল। রাজত্বের তত্ত্বাবধানকালে তারাসুন্দরী তদ্বিষয়ে দয়ারাম রায়ের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মহারাণী ভবানীর অভিমত-ক্রমেই ঐ ব্রহ্মোত্তর দান করা হইয়াছিল। সুতরাং দয়ারাম রায় রহস্য করিয়া তারাসুন্দরীকে উত্তর দিয়াছিলেন,—"তোমার মাতৃদেবীর বিবাহ-পত্র আমার স্বাক্ষরেই সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আর এই সামান্য ব্রহ্মোত্তর-দান আমার স্বাক্ষরে সিদ্ধ হইবে না?" উত্তরে তারাসুন্দরী দয়ারামকে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কর্ম্মচারীদের দ্বারা মহারাণী যে কত প্রকারের দান-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহারও ইয়ত্তা হয় না।

মহারাণী যখন ৺কাশীধামে গমন করিতেন, সঙ্গে সহস্র সহস্র

নৌকা দানের সামগ্রী বহন করিয়া লইয়া যাইত। মহারাণীর কাশীর অন্নসত্রে প্রতিদিন এক শত আট জন সধবা ও এক শত আট জন কুমারীর ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেককে অন্যূন এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হইত। মহারাণীর কাশীর অন্নসত্রে তাঁহার জীবিতকালে কখনও কোনও কাঙ্গালী আসিয়া অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যায় নাই। সে পক্ষে মহারাণী কর্ম্মচারিবর্গকে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছিলেন।

বিধবাদিগের ভরণ-পোষণের জন্য মহারাণীর দানের অবধি ছিল না। তিনি গঙ্গাতীরে নানাস্থানে এবং কাশীধামে বিধবাদিগের জন্য বহুতর আশ্রয় নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল স্থানে বহুসংখ্যক অনাথা বিধবা গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়া, ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্রতী থাকিতেন।

প্রথমে দয়ারাম রায়, মহারাণীর রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। তৎপরে চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের লোকান্তর ঘটিলে, তাঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ (রুদ্রনাথ) ঠাকুর কিছুকাল নাটোরের কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। মহারাণী যেমন উচ্চমনা ছিলেন, তাঁহার পরামর্শদাতৃগণও সেইরূপ সহৃদয় ও সদাশয় ছিলেন। মহারাণীর যে কীর্ত্তি-স্মৃতি, তাঁহারাও তাঁহার অংশীভাগী—সন্দেহ নাই।

আপন আত্মীয়-স্বজনের নামে মহারাণী ভবানী বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জননী কস্তূরী দেবীর নামে বড়নগরে ভবানী যে শিবস্থাপন করেন, সেই মন্দিরের ভিত্তিতে কস্তূরী দেবীর নাম-সন্নিবেশ ছিল। পাকুড়িয়া গ্রামে হরেশ্বর ঠাকুরের নামেও তিনি শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত মন্দির ভূমিকম্পে ভগ্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষোক্ত মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। কত

বলিব? মহারাণী ভবানীর সে কীর্ত্তির কি শেষ আছে? কালের করালগ্রাসে বহুকীর্ত্তি বিলুপ্ত হইতেছে বটে; তিনি পিতার নামে, পতির নামে, গুরুদেবের নামে, যে সকল মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, —তাহার অনেকগুলিই কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে বটে, এখনও কিন্তু যাহা রহিয়াছে, তাহাতেই তাহার স্মৃতি চির জাগরূক করিয়া রাখিয়াছে।

মহারাজ রামকৃষ্ণের দুইটী পুত্র-সন্তান ছিল। জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ; কনিষ্ঠ শিবনাথ। জ্যেষ্ঠ জমিদারী প্রাপ্ত হন; কনিষ্ঠ দেবোত্তরের তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের সময়ে এবং পরিশেষে বিশ্বনাথের সময়ে, একে একে প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই নীলামে বিক্রীত হইয়া যায়। মহারাজ রামকৃষ্ণ বিষয়ে এতই বীতস্পৃহ ছিলেন যে, এক একটী তালুক নীলামে উঠিত, আর তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতেন,—"ভালই হইতেছে, আমার জীবনের এক একটী বন্ধন ছিন্ন হইতেছে।" যাহা হউক, যখন সকল সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যায়; তখন তারাসুন্দরীর নামে যে সকল তালুক মহারাণী লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বনাথের উপর তাহারই কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত হয়। শিবনাথ দেবোত্তর সম্পত্তি অধিকার করিয়াই পরিতুষ্ট ছিলেন। এই বিশ্বনাথ ও শিবনাথ হইতেই নাটোরের ছোট তরফ ও বড়-তরফের সৃষ্টি। বিশ্বনাথ ও শিবনাথ কাহারও পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহারা উভয়েই দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের পোষ্যপুত্র গোবিন্দচন্দ্র; তিনি আবার গোবিন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। সেই গোবিন্দ-নাথেরও পুত্র-সন্তান ছিল না। নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজ জগদীন্দ্র-নাথ—গোবিন্দনাথের দত্তক পুত্র। ইহাই বড়-তরফ। অন্যপক্ষে ছোট-তরফের শিবনাথ আনন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। আনন্দ-নাথের চারি পুত্র;—(১) চন্দ্রনাথ, (২) মুকুন্দনাথ, (৩) নগেন্দ্রনাথ,

(৪) যোগেন্দ্রনাথ। আনন্দনাথ গবর্ণমেণ্টের নিকট সি-আই-ই ও রাজা উপাধি লাভ করেন; তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা। চারিটী পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান্ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি ইংরেজী, পারস্য, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রাজা চন্দ্রনাথ ইংরেজীতে একজন সুলেখক ছিলেন। পিতা বর্ত্তমানে ইনি অল্প-দিনের জন্য ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; পাণ্ডিত্যগুণে তিনি রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন এবং "করেণ" আফিসে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের "আটানীর" পদ প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্র নাথ বড়ই তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম—জিতেন্দ্রনাথ। জিতেন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই লোকান্তরে গমন করেন। জিতেন্দ্রনাথের পুত্র বীরেন্দ্রনাথ এখন ছোট-তরফের অধিকারী।

প্রথম পরিশিষ্ট।

মহারাজ রামকৃষ্ণ।

মহারাণী ভবানীর পোষ্য-পুত্র—মহারাজ রামকৃষ্ণ। মহারাজ রামকৃষ্ণের ন্যায় সাধক রাজবংশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেন। মহারাণী তাঁহাকে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বলিতেন; কিন্তু মহারাজ রামকৃষ্ণ ভবানীধামে গিয়া সাধনায় নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার সম্বন্ধে উত্তর-বঙ্গে কত কিংবদন্তীই প্রচলিত আছে। ভবানীপুরের পীঠস্থানে একদিন তিনি ভবানীর সাধনায় তন্ময় হইয়াছিলেন। দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন,—"তুমি আমার আরাধন কি করিতেছ। তোমার মাতা ভবানী—আমার অংশরূপিণী। যদি আমার অনুকম্পা পাইতে চাও, জননীর চরণে শরণাপন্ন হও। এই প্রত্যাদেশ শুনিয়াও সাধনা পরিত্যাগ না করায়, মহারাজ রামকৃষ্ণ, ভবানীপুর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কে যেন আসিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া, দক্ষিণের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। পরদিন প্রভাতে পাকুড়িয়ার সেতুর নিকট মূর্চ্ছিতাবস্থায় মহারাজকে দেখিতে পাওয়া যায়। পাকুড়িয়ার ঠাকুর মহাশয়দিগের যত্নে তাঁহার মূর্চ্ছা-ভঙ্গ হইলে, মহারাজ তাঁহাদিগকে বলেন,—"আপনারা আমাকে অবিলম্বে আমার মাতার নিকট পৌছাইয়া দেন।" রঘুমণি ঠাকুর এবং ভোলানাথ ঠাকুর প্রভৃতি মিলিত হইয়া বড়নগরে মহারাণী ভবানীর নিকট তাঁহাকে পৌছাইয়া দেন। সেখানে পৌছিয়া, ত্রিরাত্রি গঙ্গাবাসের পর, গঙ্গাজলে মাতার পাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া মহারাজ রামকৃষ্ণ দিব্যধামে গমন করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত শতমুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

তারাসুন্দরী।

মহারাণী ভবানীর উপযুক্ত কন্যা—তারাসুন্দরী। তাঁহারও জীবন অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ। তিনিও জননীর ন্যায় আদর্শ ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। রাজকার্য্যেও মাতার ন্যায় তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাণী ভবানীর নামের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারিণী তারাসুন্দরীর নাম তাই আজ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত। বাল-বিধবা ব্রহ্মচারিণী তারাসুন্দরী বিদ্যা, বুদ্ধি, দান, ধর্ম্ম, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি অশেষ গুণে বিভূষিতা ছিলেন। রামকৃষ্ণের দেহান্তে মহারাণী ভবানী যখন পুনর্ব্বার প্রজাপুঞ্জের অনুরোধে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন তারাসুন্দরীই রাণী ভবানীর রাজকার্য্যের প্রধান সহায় ছিলেন।

কিংবদন্তীতে প্রকাশ,—রাণী ভবানীর যে বিখ্যাত "জাঙ্গাল" চৌগ্রাম হইতে ভবানীপুরে ভবানী মাতার মন্দির পর্য্যন্ত অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, ঐ সমস্ত পথের স্থানে স্থানে ইষ্টক-নির্ম্মিত সেতু, শিব-মন্দির, পুষ্পোদ্যান, ও সোপানবদ্ধ জলাশয় প্রস্তুত হইয়াছিল। পথিকের সুবিধার জন্য প্রস্তর-নির্ম্মিত থালা-বাটী, বাটনা-বাটার জন্য পাটাশিল পর্য্যন্ত রক্ষিত ছিল। পথের দুই ধারে আম জাম কাঁটাল বেল বকুল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী পথিকের শ্রমাপনোদন ও তৃষ্ণানিবারণ করিত। ঐ "জাঙ্গালের" অর্দ্ধপথে "ভদ্রাবতী" নদী (ভাদাই গঙ্গা) প্রবাহিত আছে। রাণী ভবানী যখন ঐ ভদ্রাবতী নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করেন, তখন তিনি স্বপ্নাবস্থায় শুনিতে পাইলেন,—যেন ভদ্রাবতী

গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন ;—'আমার বক্ষে যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে অবমাননা করিবে,—তাহার বক্ষঃস্থল ব্রণ দ্বারা ছিদ্রময় হইবে, এবং অচিরে তাহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে।' এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া, রাণী ভবানী ভদ্রাবতীর উপর সেতু-নির্ম্মাণের কল্পনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন ; কিন্তু তাহাতে পথিকের নিতান্ত অসুবিধা হইতে থাকে। তদ্দর্শনে তারাসুন্দরী নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"সেতু নির্ম্মাণের তুল্য পুণ্যকার্য্য জগতে অতি বিরল। বিশেষতঃ তীর্থপথের সেতু দ্বারা তীর্থযাত্রীর এবং সাধারণ পথিকের যেরূপ উপকার সাধিত হয়, তাহার তুলনায় ক্ষণভঙ্গুর জীবন অতি তুচ্ছ। অতএব আমি নিজ ব্যয়ে এ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লোকের উপকার করিব। তাহাতে যদি আমার এই বৈধব্যদগ্ধ জীবনের অবসান হয়, তবে তাহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

প্রথমতঃ মহারাণী ভবানী কন্যাস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া তারাসুন্দরীকে ঐ সেতু-নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতে বিরত করার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরিশেষে ঐ সৎকার্য্যে তারাসুন্দরীর যখন একান্ত আগ্রহ প্রকাশ পাইল, মহারাণী ভবানী তখন আর তাহাতে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। তারাসুন্দরীর যত্নে যথাসময়ে ঐ বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইল। ঐ সেতুতে যে তিনটী বৃহৎ খিলান নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার রন্ধ্রপথে মাস্তুলসহ বড় বড় নৌকা অনায়াসে যাতায়াত করিয়া থাকে। সুদীর্ঘকালের ভূকম্পাদি নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও ভদ্রাবতীর ঐ সুদৃঢ় বৃহৎ সেতু অদ্যাপি অক্ষতদেহে বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে ক্ষোভের বিষয়, যেদিন তারাসুন্দরী যথাবিধি মহাসমারোহে সেতুপ্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করিলেন, ঐ দিন রাত্রিতেই তাঁহার বক্ষঃস্থলের মাঝখানে একটি সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র ব্রণ দেখা দিল। কে জানিত—ঐ ক্ষুদ্র ব্রণ পরিশেষে শতচ্ছিদ্রে পরিণত হইয়া

তারাসুন্দরীর পুণ্য-জীবন ইহলোক হইতে অনন্তধামে লইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, সেই ক্ষণেই তারাসুন্দরীর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। তারা-সুন্দরী যেদিন গঙ্গালাভ করেন, তখন অনেকেই মাতৃহীন সন্তানের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

বিবিধ বিষয়।

(ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পত্র লিখিয়া এবং কোথাও বা নিজে গিয়া এই সকল বিষয় সংগৃহীত করা হইয়াছে।)

১। মহারাণী ভবানীর পিত্রালয় ছাতিন-গ্রাম—নাটোরের উত্তরে এখন যেখানে উত্তর-বঙ্গ রেলের সান্তাহার-ষ্টেশন, তাহারই অনতিদূরে অবস্থিত।

২। ভবানীপুরের পীঠস্থান—ভবানীদেবীর মন্দির—করতোয়া-নদীর তীরে বিদ্যমান। এ স্থান এখন বগুড়া-জেলার অন্তর্নিবিষ্ট।

৩। নাটোর রাজবাটী হইতে দিঘাপাতিয়ার রাজবাটী ছয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ভূমিকম্পে ও কালপ্রবাহে অট্টালিকা প্রভৃতি বিধ্বস্ত হইলেও, নাটোরে এখনও ভূত গৌরবের সহস্র চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

৪। পাকুড়িয়ায় মহারাণী ভবানীর মাতুলালয়; এবং পাকুড়িয়ার এক ক্রোশ ব্যবধানে বরিয়ায় তাঁহার ইষ্টদেবের বাড়ী। মহারাণীর সময় হইতে ঐ দুই গ্রাম এক নামে—'বরিয়া-পাকুড়িয়া' নামে—পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

৫। বরিয়া-পাকুড়িয়াতে মহারাণী ভবানীর বহু কীর্ত্তি আছে।

পাকুড়িয়াতে মহারাণী ভবানীর প্রাতিষ্ঠিত নয়টী শিব-মন্দির বহু ভূমিকম্পের অবঘাত সহ্য করিয়া আজিও দণ্ডায়মান আছে। কেবল সর্ব্বপেক্ষা বড় আটচুয়ারী মন্দিরটী বিগত ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে পড়িয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামে মহারাণীর প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীরই সংখ্যা—পাঁচশত।

৬। মহারাণী ভবানীর গুরুদেবের বাড়ী—নাটোর-রাজবাড়ীর অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাণী তাহার চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করাইয়া, নাটোর-রাজবাড়ীর অনুকরণে "বঙ্গোজ্জ্বল" নামক তোরণ দ্বার প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। সেই পরিখা এবং "বঙ্গোজ্জ্বল" তোরণের কতক অংশ এখনও বিদ্যমান আছে।

৭। মহারাজ রামকান্তের রাজ্যোদ্ধারের জন্য ঋণ-গ্রহণ বিষয়ে এবং দেবীকে মহারাণীর মুক্তার মালা প্রদান-সম্বন্ধে কোনও বিশিষ্ট আত্মীয় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এই :—

"আমি আমাদের বংশীয় প্রাচীন ঠাকুর মহাশয়দিগের নিকট শুনিয়াছি,—রাজ্যোদ্ধারের জন্য নবাব-দরবারের প্রধান ব্যক্তিগণকে বাধ্য করার কল্পে মহারাজ রামকান্তের নিকট দয়ারাম রায় এক লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন। ঐ টাকা তিনি সংগ্রহের অন্য উপায় করিতে না পারিয়া হতাশ হইলে, রাণী ভবানী তাঁহার অলঙ্কারগুলি প্রদান করেন। ঐ অলঙ্কারগুলি শেঠ-ভবনে বন্ধক রাখিয়া দয়ারাম রায় এক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং রাজ্যপ্রাপ্তির পর দয়ারাম রায় সর্ব্বাগ্রে ঐ অলঙ্কারগুলি টাকা দ্বারা উদ্ধার করিয়া রাণী ভবানীকে প্রত্যর্পণ করেন। ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে জগৎ শেঠ দুই লক্ষ টাকা দিতেও অসম্মত হইতেন না।

"মহারাজ রামকান্ত রায় রাণী ভবানীর জন্য ৫২,০০০৲ বায়ান্ন হাজার টাকা মূল্যের একছড়া মুক্তার মালা এবং ভবানীর জন্য

৩০,০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের একছড়া মুক্তার মালা আনিয়াছিলেন। ভ্রমক্রমে বায়ান্ন হাজার টাকার মালাছড়াই ভবানীপুরে মা-ভবানীর জন্ত প্রেরিত হয়। তৎপরে রাণী ভবানী তাহা জানিতে পারিয়া রাজা রামকান্তকে বলিলেন,—"আমাকে অধিক মূল্যের মালা দিয়া মা'কে কম মূল্যের মালা দিতে যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা উচিত হইয়াছিল না; সেইজন্তই মা দয়া করিয়া আমাদের ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের মালা ছড়া যখন মা-ভবানীর জন্ত আনা হইয়াছিল, তখন তাহা আমার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব উহা মা'কেই দিতে হইবে। বিশেষতঃ আপনি যেমন মা'কে এক ছড়া মালা অর্পণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আপনার প্রদত্ত মালা আমিও মা'কে দিয়া চরিতার্থতা লাভ করিব।" এই বলিয়া, রামকান্তের অনুমতি গ্রহণে ত্রিশ হাজার টাকার মালাছড়াও রাণী ভবানী মা-ভবানীকে অর্পণ করেন। আমি স্বচক্ষে ঐ দুই ছড়া মালাই মা-ভবানীর গলায় দেখিয়াছি। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মা-ভবানীর বাটীতে যে বৃহৎ চুরি হইয়াছিল, ঐ চুরির সময় অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত ঐ মহামূল্য মালা দুইছড়াও অপহৃত হইয়াছে। ঐ চুরির মোট পরিমাণ তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ছিল।

"মহারাজ রামকান্ত রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধে অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।"

৮। এই গ্রন্থের দুইটী পরিশিষ্টে শেষভাগে মহারাণী ভবানীর স্বাক্ষরযুক্ত দুইখানি দান-পত্র প্রকাশিত হইল। দুইখানি দান-পত্রে মহারাণীর দুই প্রকার স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। যে খানিতে তাঁহার মোহর আছে এবং "রাণী-ভবাণী" এইরূপ স্বাক্ষর আছে,—সেইখানিই তাঁহার প্রকৃত স্বাক্ষরযুক্ত বলিয়া এক্ষণে পরিচয় পাইতেছি। অপর

খানি তাঁহার কোনও প্রতিনিধির স্বাক্ষর হইতে পারে। কেহ কেহ আবার বলেন,—পূর্ব্বে ১১৬১ সালে মহারাণী যেরূপভাবে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তিকালে সে স্বাক্ষর অন্যরূপ হইয়াছিল। ইহাও সম্ভবপর। কলিকাতায় "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী" নামক রাজকীয় পাঠাগারে মহারাণী ভবানীর যে স্বাক্ষর রক্ষিত হইয়াছে, তাহাও শেষোক্তেরই অনুরূপ বটে। তবে প্রথমোক্ত স্বাক্ষরই তাঁহার নিজের বলিয়া বেশী প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার প্রদত্ত বহুতর মূল্যবান কায়েমী দান-পত্রে ঐরূপ স্বাক্ষরই দেখিয়াছি।

চতুর্থ পরিশিষ্ট।

ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর।

(১)

মহারাণী ভবানী যে সকল ব্রহ্মোত্তর-দান করিতেন, তাহার বহু দান-পত্রেই পুরাণের এই বচনপরম্পরা লিখিত থাকিত ;—

"বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্ ॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত্তু বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥"

অর্থাৎ—"সগরাদি রাজন্যবর্গ বহু ভূখণ্ড দান করিয়া গিয়াছেন।

যিনি যে পরিমাণ ভূমি দান করিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণ ফললাভ করিয়াছেন। যিনি ভূমি-দান করেন এবং যিনি সেই দান গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই সেই পুণ্যকর্ম্মের ফলে চিরকাল স্বর্গ-বাসী হন। আপনার প্রদত্ত বা অপরের প্রদত্ত ভূমি যদি কেহ কাহারও নিকট হইতে অপহরণ করে, সেই অপহর্ত্তাকে পিতৃপুরুষ সহ বিষ্ঠার ক্রমি হইয়া পচিতে হয়।"

এই অঙ্গীকার-সহ মহারাণী যে এই বঙ্গদেশে কত ভূমিখণ্ড দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

---

(২)

দেবসেবার জন্য মহারাণী ভবানী যে সহস্র সহস্র বিঘা দেবোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার একখানি দানপত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রকাশিত হইল। সে দানপত্র এই,—

"শ্রীযুতশ্যামসুন্দরদেবচরণসরসীরুহরাজেষু সেবার্থং
দেবোত্তরপত্রমিদং।

নিস্কৃতিবিধাত্রী লিখ্যতে দানপত্রী। শাকে ১৬৮৩ সনে ১১৬৮ বর্ষে লিখনং কার্য্যঞ্চাদৌ পরন্ত মদীয়-রাজ্যৈকদেশে রাজসাহীপরগণাখ্যে গ্রামাণ্যন্তর্গতপরগণে গোহালেতি প্রসিদ্ধ রাজোপদেশে একসহস্র বিঘেতি লৌকিকপ্রসিদ্ধা শস্ত-সম্প্রদানভূমিঃ।"

মুর্শিদাবাদ জেলার শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-কল্পে ১১৬৮ সালে মহারাণী এই দানপত্র লিখিয়া দেন। রাজসাহী পরগণার সহস্র বিঘা উর্ব্বর ভূমি মহারাণী এইরূপে দান করিয়াছিলেন।

(১)

মহারাণীর দেবোত্তর-দানের দানপত্রে প্রায় স্থলেই নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিত হইত :—

"দেবস্বহারিণো যে চ যে চ তদ্বিঘ্নকারকাঃ।
নরকান্নিষ্কৃতিস্তেষাং নাস্তি কল্পশতৈরপি॥"

অর্থাৎ,—"যে ব্যক্তি দেবস্ব হরণ করিবে, অথবা দেবস্ব-বিষয়ে কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, তাহার নরক নিশ্চয়। শত কল্পেও তাহার নিষ্কৃতি নাই।"

---

(২)

মহারাণীর উৎসর্গীকৃত মন্দিরসমূহে প্রায় প্রতি স্থানেই শিলালিপি দৃষ্ট হইত। এখনও পর্য্যন্ত অনেক স্থানে মন্দিরগাত্রে মহারাণীর নামসংলগ্ন শিলালিপি দেখিতে পাই। শ্রীশ্রী৺কাশীধামের খালিসপুরা পল্লীতে একটী মন্দিরগাত্রে এখনও পর্য্যন্ত এই শিলালিপি বিদ্যমান আছে। যথা,—

"ধরামরেন্দ্র-বারেন্দ্র-বঙ্গভূমীন্দ্র-ভামিনী।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বরমন্দিরম্॥"

অর্থাৎ,—"ভূদেব-প্রধান বারেন্দ্র-বঙ্গ-ভূপতির পত্নী (মহারাজ রামকান্তের পত্নী) মহারাণী শ্রীভবানী কর্ত্তৃক এই শ্রীভবানীশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইল।"

সম্পূর্ণ।